পুণ্যাত্মা মা শ্রী সারদা দেবী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বই

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকা

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম-শতবার্ষিকী স্মৃতি-গ্রন্থ

মুখবন্ধ : বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
অবতরণিকা : কেনেথ ওয়াকার
অনুবাদ : মণীন্দ্র রায়

সম্পাদকী উপদেষ্টা :
স্বামী জ্ঞানানন্দ
জন স্টুয়ার্ট ওয়ালেস

পাবলিকেশান ডিভিশান
মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশান অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং
গভর্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, দিল্লি—৩

সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ (আশ্বিন ১৮৮৬)
September 1964 (Asvina 1886)

*Published by arrangement with
the Ramakrishna Vedanta Centre, London*

Price: Rs. 4·50

মূল্য ঃ টা. ৪·৫০ প.
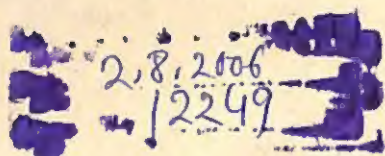
WOMEN SAINTS OF EAST AND WEST

by

SWAMI GHANANANDA AND OTHERS

(Bengali)

ডিরেক্টর, পাবলিকেশানস ডিভিশান ওল্ড সেক্রেটারিয়েট দিল্লি-৩ থেকে প্রকাশিত ও নালন্দা প্রেস ১৫৯-১৬০, বিধান সরণী কলিকাতা ৬ থেকে শ্রীশ্যামলকুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

এই গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর শতবার্ষিকী জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হল। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্মিণী এবং প্রথমা শিষ্যা। ১৮৫৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে রামকৃষ্ণ আশ্রমের যতো কেন্দ্র আছে সমস্ত স্থানেই ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী জন্মোৎসব পালিত হ'য়েছে। এই উপলক্ষে লণ্ডনে অবস্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টার একটি শত-বার্ষিকী সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি জন্মোৎসব পালনের জন্য ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে একটি জনসভার আয়োজন করেন। তাছাড়া ঐ বৎসর জুন মাসে তাঁরা একটি সর্ব-ধর্ম নারী-সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিলেন। বর্তমান সংকলনটির প্রকাশের দ্বারা তাঁরা ঐ উৎসবের কার্যক্রমকেই একটি সুষ্ঠু পরিসমাপ্তিতে নিয়ে যেতে চান।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মে যেসব নারী সাধিকা অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদেরই কাহিনী সংকলিত হ'য়েছে। প্রবন্ধগুলি আমাদের আমন্ত্রণে আগ্রহশীল এবং অনুরাগী লেখক-লেখিকাই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও দূর-প্রাচ্যে চীন ও জাপানের প্রধান ধর্ম-মতগুলির ধর্মপ্রাণা নারীদের বিষয়ে কোনো রচনা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। লেখক-লেখিকাদের আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অনুরোধ করেছিলাম যে, তাঁরা যেন সাধ্বী নারীদের বিষয়ে এমনভাবে লেখেন যাতে তাঁদের সাধনপথের সংগ্রাম ও বাধাবিপত্তি এবং তপস্যা ও সিদ্ধিলাভের বিবরণ সবিস্তারে জানা যায়। আমাদের আশা আছে, এর ফলে পাঠক-পাঠিকারা সাধ্বী নারীদের অধ্যাত্ম আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হবেন, এবং তাঁদের আত্মার কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবিত হবেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল অনুপ্রেরণা হল শ্রীশ্রীমার পবিত্র জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তিনিও এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, সমস্ত ধর্মপথ অনুসরণ করেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। গ্রন্থের যে খণ্ডে হিন্দু ধর্মসাধিকাদের বিষয়ে লিখিত হ'য়েছে সেই খণ্ড শেষ হওয়ার আগের অধ্যায়ে শ্রীশ্রীমার জীবন, কর্ম ও বাণীর কথা লিপিবদ্ধ করা হল।

যাঁদের রচনা এখানে প্রকাশিত হল তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তাঁরা এ গ্রন্থে লেখার ব্যাপারটা নিছক ভালবাসার কাজ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশে অন্যান্য যাঁরা কোনো-না-কোনো ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদেরও আমরা কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। সেবামূলক এই কর্মের উদ্‌যাপন আমাদের সকলেরই অধ্যাত্ম আনন্দের উৎস হ'য়ে থাকবে।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে তাঁর অজস্র সরকারী কর্মব্যস্ততা ও দায়িত্বের মধ্যেও সময় ক'রে একটি 'মুখবন্ধ' লিখে দিয়েছেন সেজন্যে তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্রী। অনুরোধ করা মাত্রই শ্রীযুক্ত কেনেথ ওয়াকার যে তাঁর 'অবতরণিকা' লিখে পাঠিয়েছেন সেজন্যে তিনিও আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আর সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলীকে। তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও উপদেশ পাওয়াতেই এ সংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হল।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টর
লণ্ডন
ডিসেম্বর, ১৯৫৫

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষে অমাবস্যার ঘোর রাত্রে দীপান্বিতার লক্ষ দীপাবলী জ্বলে উঠে অন্ধকার বিদূরিত করে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকাদের জীবনও সেইরকম হতাশা ও সংশয়ে আচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে আশা ও জ্ঞানের আলো জেবলে দেয়। তাঁদের বাণী সারা বিশ্বের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে গেছে। এতে মনে পড়ে, মানুষে মানুষে রয়েছে এক ব্যাপক মিলনের ক্ষেত্র। সেটা হল, ঈশ্বরের প্রতি সকল মানুষের বিশ্বাস এবং তাঁকে আরাধনার জন্যে অন্তরের ব্যাকুলতা।

বর্তমানে শ্রীশ্রীমার জন্মশতবার্ষিকী সমাগত। এই উপলক্ষে কেবল ধর্মসাধিকাদের পবিত্র জীবনীই যে আলোচনার জন্যে নির্বাচন করে নেওয়া হ'য়েছে, সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী তাতে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি দেশের প্রতি যুগের ইতিহাসেই দেখা যায় যে নারীগণই হ'য়েছেন তাঁদের পরিবারের ধর্মগত অভিভাবিকা। আধুনিক কালে আমরা প্রাচীন মূল্যবোধ থেকে যতোই দূরে সরে আসি না কেন, একটি আদর্শ তবু অবিচল রয়ে গেছে। সেটি হল—কোনো এক অখ্যাত নারীর জীবন, যিনি সহস্রের ভিড়ে হারিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বাস করেও যিনি ইহকাল ও পরকালের সম্পর্কগুলিকে একসূত্রে গেঁথে নিতে পারেন। এই ধরনের নারী, নিজের ধর্মবিশ্বাসকে সেইরকম সারল্য এবং অনাড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেন, যেভাবে তাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের স্বামী ও সন্তানসন্ততিকে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষ এবং শিশুদের ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস বেশীর ভাগ সময়েই পরিচালিত হয় পরিবারের যিনি গৃহিণী তাঁরই শান্ত আধ্যাত্মিক প্রেরণায়।

শ্রীশ্রীমা নিজেও ছিলেন এইরকমই একজন নারী। এবং সেইজন্যই তাঁর জীবনের মধ্যে রয়েছে একটি সর্বজনীন আবেদন। ভারতের এক অখ্যাত পল্লীতে জন্ম হ'য়েছিল তাঁর, পিতৃপরিবারের অবস্থা ছিল অত্যন্তই সাধারণ, এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল সাধকপ্রকৃতির মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। কিন্তু তিনি হ'য়ে উঠলেন একজন আদর্শ হিন্দু নারী—নিঃস্বার্থ স্বামীসেবা এবং স্বামীর সাধনপথে সর্বাঙ্গীন সহায়তার দ্বারা তিনি হ'লেন প্রকৃতই একজন সহধর্মিণী সাধ্বী। উচ্চচিন্তা এবং ধর্মকর্মে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি সংসারের

তুচ্ছতম কর্তব্যও অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। স্বামীর পাশাপাশি তিনিও সাধনায় ব্যাপৃত থেকে আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চমার্গে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু কখনোই তিনি সাংসারিক জীবনের দাবীদাওয়াকে তুচ্ছ মনে করেননি। যেমন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষা করতেন, তেমনি, যে সব রামকৃষ্ণ-শিষ্য প্রভুর দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় উপস্থিত হ'তেন, তাঁদেরও তিনি নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ যত্ন করতেন। তাঁর জীবন হিন্দু নারীত্বের চরমোৎকর্ষেরই প্রতীক—একাধারে তিনি পালন করেছেন হিন্দুনারীর যুগ্ম-আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ কর্তব্যে আত্মসমর্পণ এবং তারই ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। দুটি দিকই তাঁর জীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল।

বিভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন যুগের যে সমস্ত ধর্মসাধিকার জীবন এই গ্রন্থে আলোচিত হ'য়েছে তাঁরাও সারদা দেবীর মতোই পরমব্রহ্মের সাধনার মধ্য দিয়েই নারীত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটাতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। নারীকে এখানে দেখি এক শান্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। অপরিসীম ভক্তি ও সেবার ক্ষমতার মধ্যে নারীর সমগ্র মাধুর্য যেন এখানে একাগ্র হ'য়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরান্বেষণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা। কিন্তু সাধনার পথে বিভিন্ন ধর্মসাধিকার ভগবদ্ উপলব্ধির কথা বলতে গিয়ে এখানে মানব চরিত্রেরই মহিমা কীর্তন করা হ'য়েছে। মানুষের সেই উন্নত চরিত্রকে এখানে ঈশ্বরের দান হিসাবে বর্ণনা করা হয়নি, দেখানো হয়েছে মানুষেরই অপরিসীম আত্মসংযম, দুঃখস্বীকার, সাধনা ও ধ্যানের দ্বারা অর্জিত এক চরমোৎকর্ষের প্রতিরূপ হিসাবে। সমস্ত ধর্মেরই পরম লক্ষ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা। সাধক-সাধিকাদেরও কাম্যবস্তু হল এই আত্মজ্ঞান। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তাঁদের জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়, আত্মজ্ঞানের সাধনমার্গ এমন একটি পথ যা অহংবোধের রাজত্ব থেকে বহুদূরে বিসর্পিত। নিজের কথা ভুলে গিয়ে, নিজের সংগ্রাম ও যন্ত্রণার স্থানে অন্যের দুঃখকষ্টের অনুভূতি হৃদয়ে স্থান দিলে তাতেই আমরা আত্মজ্ঞানের স্পর্শ লাভ করি এবং সেই পথে ঈশ্বরের সমীপবর্তী হই। এই গ্রন্থে উল্লিখিত নারীগণ মুখের ভাষায় বাণী দিয়ে যাননি। তাঁদের বাণী বাহিত হ'য়েছে তাঁদের ধ্রুব বিশ্বাসের মানস-বিহঙ্গের পাখায়। আর এই পথে তাঁরা সর্বকালের সমস্ত মানুষের জন্যে রেখে গেছেন সাধনা ও আত্মোপলব্ধির চরমাদর্শ।

ব্রহ্মলাভ অতি বিরল সৌভাগ্য। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সাধনার আদর্শ অবশ্যই অনুসরণ করতে পারেন। সেইখানেই নিহিত রয়েছে এই ধর্মসাধিকাদের জীবনী-আলোচনার সার্থকতা। কবিসাধক কবীরও বলেছেন ঃ

দেখ, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আমার গুরু
আর সৃষ্টিকর্তা।

কার পায়ে প্রণাম জানাব আমি ?
আমার গুরুর পায়ে, হে শিষ্য,
তিনিই যে ঈশ্বরের পথে তোমার আলো
জেবলে দিয়েছেন !

যিনি তাঁর জীবিত-কালে শতশত ভক্তের পথে আলো জেবলে দিয়েছেন, তিনি যেন সমস্ত আত্মোৎকর্ষকামী ব্যক্তিরই প্রেরণার উৎস হন। তাঁরই নামে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থখানি যেন তাঁর এবং অন্যান্য ধর্মসাধিকার জীবনাদর্শ। এই যুগেও জগতের সম্মুখে পুনরায় উপস্থিত করে সার্থক হ'য়ে ওঠে।

—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

অবতরণিকা

সূচনাতেই আমি বুঝতে পারছি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধর্মসাধিকাদের উপরে লিখিত একটি গ্রন্থের অবতরণিকা লেখার ব্যাপারে আমার যোগ্যতা কতো কম। আমি নারী নই, এবং সাধকও নই। তাছাড়া আমি যেমন পন্ডিত নই, তেমনি শাস্ত্রপুরাণেও আমার দখল নেই। এতো সব বাধা সত্ত্বেও একটা আশার ব্যাপার অবশ্য রয়েছে। এবং সেইজন্যেই এই গ্রন্থের অবতরণিকা লেখারও একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পাচ্ছি। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির বিষয়ে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা আছে। আমার ধারণায়, ভারতের এই সংস্কৃতিতেই মানবজাতির চিন্তা ও অনুভূতির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের অতীত অবদান এতোই সু-উন্নত যে, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পৃথিবীর বর্তমান চিন্তা-জগতে এবং বিশ্বশান্তির বিকাশে তার অনেক কিছুই করার রয়েছে। এই গ্রন্থের পাঠকপাঠিকাগণ আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, শান্তি সংরক্ষণ নিতান্ত একটি রাজনৈতিক সমস্যা নয়, কেননা বহির্জাগতিক বা বহির্মুখী কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দীর্ঘকাল ধ'রে জাতিতে জাতিতে ঐক্যভাব রক্ষা ক'রে চলা সম্ভব নয়। এই ঐক্যবোধ আসতে পারে তখনই যখন বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর অন্তর্গত মানুষগুলির ব্যক্তিসত্তায় অন্তরের প্রেরণায় পরস্পরের ভিতর উন্নত ধরনের বোঝাপড়া দেখা দেয়, এবং ভ্রাতৃবোধে উদ্দীপ্ত সমস্ত মানবজাতির মধ্যে গভীরতর আত্মোপলব্ধির বিকাশ ঘটে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ এখনকার চেয়ে আরো ভালো করে হৃদয়ঙ্গম করব যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমতের মধ্যেই সত্যের এক বিশ্ব-জনীন আবেদন রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দও তাই বহুকাল আগে লিখেছিলেন, "প্রত্যেকেই অন্যদের সদ্‌গুণ-গুলো আত্মসাৎ করবে, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেবে না, নিজের নিয়মেই নিজে বেড়ে চলবে" ......সমস্ত বিশ্বসংসারই হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের লীলা।"

এইসব কারণেই, ধর্মসাধিকাদের উপরে লিখিত গ্রন্থের অবতরণিকা লেখার যোগ্যতা আমার থাক বা না থাক, এটিকে আমি একাধারে কর্তব্য এবং সৌভাগ্য বলে গ্রহণ করেছি। এই গ্রন্থে বিবৃত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহীয়সী সাধিকাদের জীবন ও বাণীর কথা পাঠ করার সময়ে সকলেরই "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং

ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের লীলা"র কথা মনে পড়বে। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, যাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত, তিনি যদিও তাঁর শিষ্যদের কাছে বেদান্তের দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেননি, তবু তাঁর সমস্ত বাণীর পটভূমিতে রয়েছে বেদান্তেরই প্রভাব। তাছাড়া বেশীর ভাগ নারীর মতো তিনিও ছিলেন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না নারী। ফলে তাঁর নিজের জীবনেই তিনি মানবজাতি এবং মানুষের আচরিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন, সেই সময় শ্রীশ্রীমা ক্ষীণকণ্ঠে জনৈকা উপদেশ প্রার্থিনীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, "মনের শান্তি চাও তো অন্যের দোষ ধ'রো না। তার চেয়ে নিজের দোষ দেখো। সমস্ত সংসারটাকেই নিজের করে নিতে চেষ্টা করো। কেউই পর নয় বাছা, সারা সংসারই তোমার আপন"। সরলভাবে বলা এই কয়েকটি কথায় তিনি সেই শিষ্যার মারফৎ আমাদের ঠুনকো অহমিকা-বোধের বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। এই অহমিকাই আমাদের পরস্পরের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করে। শ্রীশ্রীমা তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মানুষে মানুষে রয়েছে এক ঐক্যভাব, আর সেই ঐক্যের জগতে 'তোমার' 'আমার' বলে কোনো কথা নেই,—কেউই পর নয় সেই জগতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এটা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত করেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ ধর্মেই সিদ্ধিলাভের পথ এক। সিদ্ধব্যক্তি হতে হলে সত্তার উন্নততর স্তরে ওঠার জন্যে দীর্ঘস্থায়ী সাধনার প্রয়োজন। তখন চিৎপ্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। এই কঠিন সাধনার পথে কোন্ কোন্ স্তর পার হ'তে হয়, পৃথিবীর ধর্মসাহিত্যগুলিতে তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থে এই সিদ্ধিলাভের তত্ত্ব স্মৃতিশাস্ত্রের বিধিনিষেধ এবং আচার আচরণের জালে এমনভাবে আচ্ছন্ন যে সহসা তার সত্যস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু তত্ত্বটি যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সেখানেও আছে তাতে সন্দেহ নেই।

বেদান্তকে পৃথিবীর সমস্তধর্মের সারমর্ম বলা যায়। সংক্ষেপে, ঐ বেদান্তদর্শনের মূল বক্তব্য তিনটি সূত্রের মধ্যে ব্যক্ত করা যায়। প্রথম সূত্র হল, মানুষের প্রকৃত সত্তা হল ঐশ্বরিক; দ্বিতীয়, নিজের মধ্যে সেই ঐশ্বরিক সত্তার আবিষ্কার হল মানবজীবনের পরম লক্ষ্য; এবং তৃতীয়, ভাষার মধ্যে যতো পার্থক্য থাক, সমস্ত ধর্মের মৌল সত্য একই। এই তিনটি আদর্শকে সামনে রেখে, স্মৃতিপুরাণের বিধিনিষেধ ও তর্কবিতর্ককে অতিক্রম ক'রে সাধক সত্যানুসন্ধান ও আত্মোপলব্ধির সাধনায় অগ্রসর হন। কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই

যে, আজকাল আমাদের দেশের বহু যুবক পাশ্চাত্যের ধর্মগত কূটবিতর্ক ও পাদ্রি-পুরোহিতের নানা বিধিনিষেধের বাঁধনে তিক্তবিরক্ত হ'য়ে ভারতের প্রাচীন প্রজ্ঞার কাছে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন, এবং যে সরল ও গভীর অধ্যাত্ম-শিক্ষা তাঁদের প্রয়োজন তা তাঁরা পাচ্ছেন বেদান্তের মধ্যে। এই অধ্যাত্মসাধনার ব্যাপারটা আরো একটি কারণে উল্লেখযোগ্য এবং তৃপ্তিদায়ক হ'য়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের তরুণ সাধকেরা মনে করেছিলেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে বুঝি দুরতিগম্য কোনো ব্যবধান আছে। কিন্তু কার্যকালে তাঁরা দেখছেন যে, আজকের পদার্থবিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা যেসব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তার সম্ভাবনার কথা বেদ বেদান্তের মধ্যে হাজার হাজার বছর আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই পরস্পরকে দেবার অনেক কিছু আছে। এই দুই জগতের আদানপ্রদানের সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠ ক'রে এক নতুন ও প্রশান্ত পৃথিবীর উদ্বোধনে আমাদের প্রয়াস যতো তীব্র হয় ততোই আমাদের মঙ্গল। বহুদিন আগে লিখিত হওয়া সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এতোই যথাযথ যে আমি আবার তা থেকে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। "শুধু যে আমরা ভারতীয়েরাই পাশ্চাত্য থেকে সব কিছু শিখব তা নয়, কিংবা এও নয় যে, তারাই আমাদের কাছ থেকে সব কিছু শিখবে, উভয়কেই পরস্পরের সাহায্যে এমনভাবে এগিয়ে আসতে হবে যাতে আমাদের বহু যুগের স্বপ্ন—জাতিতে জাতিতে ঐক্যবোধ এবং আদর্শের একাত্মতা পৃথিবীতে উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারি আমাদের বংশধরদের জন্যে।" এই নতুন পৃথিবীর নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই যথাযোগ্য ভূমিকা আছে। আমি এই নতুন পৃথিবীর নির্মাণকে অত্যন্তই জরুরী ব্যাপার মনে করি, এবং এজন্য আমাদের পরস্পরকে আরো আন্তরিক ভাবে চিনে নেওয়া দরকার। সেই কর্মপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মসাধিকাদের বিষয়ে লিখিত এই ছোট বইখানি আমি ভবিষ্যৎ পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে অমূল্য সম্পদ বলে মনে করি।

—কেনেথ ওয়াকার

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

হিন্দুধর্মের সাধিকাগণ

দ্বিতীয় খণ্ড

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সাধিকাগণ

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টধর্মের ধর্মসাধিকাগণ

চতুর্থ খণ্ড

ইহুদী ও সুফীধর্মের ধর্মসাধিকাগণ

প্রথম খণ্ড

হিন্দুধর্মের সাধিকাগণ

প্রথম অধ্যায়

হিন্দুনারীদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য

অবতরণিকা

(১)

ফরাসী লেখক লুই জাকোলিয়-র ভাষায় বলা যায়, বৈদিক যুগের ভারতবর্ষে নারীদের প্রতি এমন শ্রদ্ধা দেখানো হ'য়েছে যা প্রায় পূজার গোত্রে পড়ে। তিনি বলেছেন, "কী! এই তো এক সভ্যতা যা তোমাদের সভ্যতার চেয়ে অনস্বীকার্য-রূপে প্রাচীনতর, তার মধ্যে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান আসনে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং পরিবার ও সমাজে নারী পেয়েছে সম-অধিকার।"

সংহিতা-প্রণেতা মনু, "যাঁর বিধানগুলি জাষ্টিনিয়ানের আইন বা প্রাচীন বাইবেলের মুশার বিধানগুলির পিতা-পুত্রের মতো সম্পর্কিত," তিনি বৈদিক অনুশাসন গ্রহণ করেছিলেন এবং পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দান করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "এই দৃশ্যময় জগৎসংসার সৃষ্ট হওয়ার আগে স্বয়ম্ভূ সৃষ্টিকর্তা নিজেকেই দুই অংশে বিভক্ত করেছিলেন, যাতে এক অংশ পুরুষ এবং অন্য অংশ নারী হ'তে পারে। এখনও ঈশ্বরকে একটি রূপে অর্ধনারীশ্বর মনে করা হয়। এইটি এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত হিন্দুদের মনে সর্বদাই নারীপুরুষের মৌলিক সমতার ধারণা এবং আদর্শ জাগ্রত রেখেছে। বাস্তবিক, হিন্দুধর্ম ও সমাজনীতির যে বিশাল সৌধ কালের করালস্পর্শ অতিক্রম করে আজও টিঁকে রয়েছে, তার মূলভিত্তিই হ'ল এইখানে। হিন্দুদের সমাজনৈতিক, নৈতিক এবং ধর্মগত দিক থেকে পুরুষ বা নারী কারো দিকেই পক্ষপাত করা অনভিপ্রেত বা আদর্শবিরোধী—অধর্ম। এটি অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে এই বাণীতে—"স্বামী এবং স্ত্রী একই সত্তার সমান অংশ ব'লে সর্বতোভাবেই তারা সমান। কাজেই সর্বপ্রকার ধর্মগত ও সাংসারিক কর্মে তারা উভয়েই যোগদান করে সমান অংশ গ্রহণ করবে।"[১] বৈদিক যুগে নারী ও পুরুষের কর্মে এবং বালক ও বালিকাদের শিক্ষায় সমান সুযোগ দানের বিধি ও রীতি

[১] ঋগ্বেদ, ৫।৬১।৮ দ্রষ্টব্য বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১।৪।৩

প্রচলিত ছিল। বালিকাদেরও বালকদের মতোই উপনয়ন দানান্তে গায়ত্রীমন্ত্র ও ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হত। হিন্দুদের বেদ গ্রন্থের মতো পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ নারীকে পুরুষের সঙ্গে এমন সমান অধিকার দেয়নি।

(২)

বৈদিক যুগের শেষের দিকেও দুই শ্রেণীর শিক্ষিতা নারী ছিলেনঃ (ক) সদ্যোদ্বাহাং অর্থাৎ যাঁরা বিবাহকাল পর্যন্ত জ্ঞানচর্চা করতেন, এবং (খ) ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ যাঁরা বিবাহের দিকে মন না দিয়ে সারাজীবন জ্ঞানচর্চাতেই অতিবাহিত করতেন। ব্রহ্মযজ্ঞ কালে যে সব মহান বৈদিক ঋষিদের নাম পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হতো তার তালিকায় তিনজন মহামানবীর নামও স্থান পেয়েছে। তাঁরা হলেন—গার্গী বাচকনবী, বড়বা প্রাতীথেয়ী এবং সুলভা মৈত্রেয়ী।[২]

সেকালে এইভাবে বেদাভ্যাস পর্যন্ত, সর্বোচ্চ শিক্ষা, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই অবারিত ছিল। অনেক নারীই বৈদিকশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, অনেকেই হ'য়েছিলেন উচ্চস্তরের দার্শনিক, তর্কশাস্ত্রে তীক্ষ্ণধী এবং সার্থকনামা শিক্ষাদাত্রী। তাছাড়া বৈদিক যাগযজ্ঞও সাধারণত স্বামীস্ত্রীর অংশীদারত্বে অর্থাৎ সংযুক্তভাবেই করণীয় ছিল।

বৈদিকযুগের প্রথমদিকে পিতাই সাধারণত সন্তানদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণ ঔপনিষদিক কালে বালিকাদের শিক্ষা প্রায়শই গৃহে তাদের পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যদের দ্বারা পরিচালিত হত। কিছুসংখ্যক বালিকা অবশ্য বাইরের শিক্ষকদের কাছে থেকেও সাহায্য পেত এবং কেউ কেউ ছাত্রীনিবাসেও বাস করত। এই যুগে কোনো কোনো বিদুষী বিচার সভার বিতর্কে অংশ গ্রহণ করার প্রাচীনতর প্রথাকেও অনুসরণ করতে পেরেছিলেন।

সে সময়ে অনেক বিদুষী ছিলেন যাঁরা কাশকৃৎস্নশাস্ত্রের মীমাংসা শাখায় বিশেষভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা ক্রমেই তাঁদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সুলভা, গার্গী এবং বড়বা গভীরভাবে দর্শনশাস্ত্রানুরাগিনী ছিলেন। এই নারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিবাহিত জীবনের সুখৈশ্বর্যের প্রলোভনও ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। অল্প সংখ্যায় হলেও, বৌদ্ধধর্মের আগেও ভারতীয় সমাজে সন্ন্যাসিনীর অস্তিত্ব ছিল। ধীরে ধীরে সন্ন্যাসধর্মের প্রভাব ক্রমেই বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ফলে

২ আশ্বলায়ণ গৃহ্য সূত্র, ৩।৪।৪

স্বাভাবিক বিবাহিত জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মজীবন অচল, এই ধারণা বদ্ধমূল হ'তে থাকে।

প্রাচীন ভারতে নারীপুরুষের এই সমতার আবহাওয়াতেই নারীগণ জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতেন। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে তখন যে এত সাধু-সন্ন্যাসী, ঋষি ও দ্রষ্টার আবির্ভাব ঘটেছিল, তার কারণ হিন্দুদের বিবাহিত জীবনের উচ্চ আদর্শ। দেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সাধারণ মানুষের মনে এতোই দৃঢ়ভিত্তিক যে, বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন ঐহিকস্বার্থ চরিতার্থতার উপায় হিসাবে গৃহীত না হ'য়ে চিরদিনই অনুক্ষণ আত্মার মোক্ষলাভের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এক একটি সংস্কার হিসাবে পরিগণিত হয়। হিন্দুধর্ম বিবাহের বিষয়ে স্বপ্নবিলাসের ধারণা বরাবরই প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছে। দম্পতি হবে পরস্পরের আধ্যাত্মিক সহযোগী, যারা প্রত্যেকেই পরস্পরের পরিপূরক এবং একই সঙ্গে যারা স্থির এক আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের পথে নিরন্তর যাত্রী। বিবাহের সার্থকতা আসে ভোগে নয়, সংযম ও সেবার মধ্য দিয়ে। এই পথেই মিলিত জীবন দুটি অমৃতময় পরিপূর্ণতা লাভ ক'রে।

আবালবৃদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন গ্রামসমাজ-ভিত্তিক পরিবারের গণ্ডিতে বেড়ে উঠত, যাতে তুচ্ছতম থেকে শুরু ক'রে জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হত। কাজেই এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, যুগ যুগ ধ'রে এই বিশাল দেশে প্রচুর সংখ্যায় এমন নারীপুরুষ তৈরী হ'য়েছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের শেষ পর্বে সংসারত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

ঋগ্বেদে আমরা অনেক নারীর নাম পাই যাঁরা আত্মিক সত্যের চরম উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। তাঁরা সত্যদ্রষ্টা, আধ্যাত্মিক গুরুস্থানীয়া, মন্ত্রদাত্রী ও ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা হিসাবে পরিগণিত হ'য়েছেন। এক ঋগ্বেদেই প্রচুর সংখ্যায় 'সূক্ত' নামে অভিহিত সেই উদ্দীপনাময় স্তোত্রগুলি আছে যা কমপক্ষে সাতাশজন নারী ঋষি বা ব্রহ্মবাদিনীর দ্বারা রচিত। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সংখ্যক সূক্তটি হিন্দুনারী রোমশা কর্তৃক দৃষ্ট হ'য়েছিল, এবং ঐ মণ্ডলেরই ১৭৯ সংখ্যক সূক্তটির দ্রষ্টা হলেন লোপামুদ্রা। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই নারী ঋষিদের অনেকেই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির চূড়ান্ত পর্বে উপনীত হ'য়েছিলেন। ঋষি অম্ভৃনের কন্যা বাচ নামে একজন সত্যদ্রষ্টা নারী পরম ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা উপলব্ধি করে অসীম অধ্যাত্ম হর্ষে গেয়ে উঠেছিলেন, "আমিই সেই পরমা প্রকৃতি।.........আমারই প্রসাদে লোকে অন্নগ্রহণ করে;

আমারই প্রসাদে সম্পন্ন হয় দৃষ্টি, শ্বাসপ্রশ্বাস আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ। সর্বভূতের সৃষ্টিকারিণী আমি বায়ুর মতো প্রবহমানা। স্বর্গ ছাড়িয়ে, পাতাল ছাড়িয়ে আমি পরিব্যাপ্ত—সীমাহীন বিশালত্বে আমার বিরাটত্বই ওতোপ্রতো।"[১]

বৈদিক প্রজ্ঞার আরও অনেক নারী উদ্‌গাতা ছিলেন, যেমন বিশ্ববারা, শাশ্বতী, অপালা, ঘোষা এবং অদিতি, যারা সাংসারিক কলুষস্পর্শের ঊর্ধ্বে আদর্শ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের ক্রিয়াকলাপ উদ্‌যাপন করতেন, মন্ত্রোচ্চারণ করতেন, এবং মহান্ দার্শনিকদের সঙ্গে জীবন-মৃত্যু, আত্মা-ঈশ্বর ইত্যাদি বিষয়ের জটিল ও দুরূহ সমস্যার আলোচনায় রত হতেন; কখনো কখনো সমসাময়িক অগ্রবর্তী চিন্তানায়কদের তাঁরা বিচারে পরাস্তও করতেন।

এমন কি, আদিম বৈদিকযুগেও হিন্দুনারীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সংস্কার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। এই সংস্কারের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই সেই ঘটনায়, যখন কুমারী দার্শনিক গার্গী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রকাশ্য সভায় দুরূহ দার্শনিক তর্কযুদ্ধে আহবান জানিয়েছিলেন।[১]

শান্তি এবং অমরতা লাভ করার শাশ্বত প্রশ্ন যে কেবল অবিবাহিতা নারীদের মনকেই বিচলিত করত তা নয়। বিবাহিতা নারীগণও এই প্রশ্নে সমানই জিজ্ঞাসু ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসারত্যাগ ক'রে বানপ্রস্থ গ্রহণ করার আগে তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্পত্তিতে তাঁর প্রাপ্য অংশের বিষয়ে নিষ্পত্তি ক'রে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়[২] তাতেই এটি সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু, এই সমগ্র পৃথিবীতে যদি তার সমস্ত ধনৈশ্বর্যের অধিকার আমার হত, তবু কি তাতে আমি অমরতা লাভ করতাম?"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ "না, তোমার জীবনও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির মতোই হত। ঐশ্বর্যের ভিতর দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করার সম্ভাবনা নাই।"

মৈত্রেয়ীঃ "তবে আমি এমন বস্তু নিয়ে কী করব যা দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যায় না? প্রভু, একমাত্র সেই তত্ত্বই ব্যক্ত করুন, যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায়।"

যাজ্ঞবল্ক্যঃ "পূর্বেই তুমি আমার যথার্থ প্রিয়ত্ব অর্জন করেছিলে। এখন,

---

[১] ঋগ্বেদ, ১০।১২৫
[১] বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩।৬
[২] বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।৪।৩

তোমার মধ্যে যা আমার প্রিয় তাকে বহুগুণে বর্ধিত করলে। প্রিয়ে, যদি অমৃতত্ব লাভের উপায় জানার জন্যে সত্যই ইচ্ছা করে থাকো, তবে অবশ্যই আমি তা জানাব। যতোক্ষণ আমি এই তত্ত্ব তোমার কাছে ব্যক্ত করব, ততোক্ষণ তুমি তার অর্থের বিষয়ে ধ্যান করতে থাকো।—সত্য জানবে, মৈত্রেয়ী, স্বামী শুধু স্বামী বলেই প্রিয় নন, পরমাত্মার জন্যেই তিনি প্রিয়। সত্য জানবে, মৈত্রেয়ী, পত্নী শুধু পত্নী বলেই প্রিয় নন, পরমাত্মার জন্যেই তিনি প্রিয়। সত্য জানবে, মৈত্রেয়ী, পুত্রগণ শুধু পুত্র বলে প্রিয় নয়, পরমাত্মার জন্যেই তারা প্রিয়। সত্য জানবে, মৈত্রেয়ী, ঐশ্বর্য শুধু ঐশ্বর্য বলেই প্রিয় নয়, পরমাত্মার জন্যেই প্রিয়। ....সেই পরমাত্মাকে জানতে হবে, প্রিয়তমা—প্রথমে গুরু এবং শাস্ত্রের কাছ থেকে দীক্ষিত হ'য়ে, তারপর যুক্তির দ্বারা উপলব্ধি ক'রে, এবং পরিশেষে ধ্যানের ভিতর দিয়ে। প্রিয়তমা, যখন শ্রুতি, চিন্তা এবং ধ্যানের ভিতর দিয়ে পরমাত্মাকে জানা হ'য়ে যায়, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুই জানা যায়, কারণ পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই নাই।"

অনেক সময়েই নারীগণ দার্শনিক বিতর্কে বিচারকের আসনে আহূত হতেন এবং তাঁদের গভীর জ্ঞান ও অটুট পক্ষপাতহীনতার জন্যে সকলেরই সাধুবাদ অর্জন করতেন। পরবর্তীকালে শ্রীশংকরাচার্য যখন আচার-নির্ভর ধার্মিকতার হোতা মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে বৈদান্তিক তর্কে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন, তখন মণ্ডন মিশ্রের পত্নী, হিন্দু শাস্ত্রে পরম বিদুষী ভারতী হ'য়েছিলেন মধ্যস্থা। যদিও সাতদিনব্যাপী সেই তর্কযুদ্ধে তাঁর প্রিয়তম স্বামী ছিলেন শংকরাচার্যের প্রতিপক্ষ, তবু শংকরাচার্যকেই তিনি বিজয়ী ঘোষণা করেছিলেন। এবং শংকরাচার্যও যে তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন, তা এই অবিস্মরণীয় বিতর্কের পর তাঁর নিজের সন্ন্যাসাশ্রমের নামের শেষে "ভারতী" নামটি যুক্ত করাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

বৈদিকযুগের পরে কোনো কোনো গুরুস্থানীয়া নারীকে উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী বা আচার্যা বলা হত, যাতে গুরুপত্নী, অর্থাৎ যাঁরা উপাধ্যায়ানী বা আচার্যানী বলে পরিচিতা হতেন, তাঁদের থেকে এ'দের পার্থক্য সূচিত হয়।

(৩)

পৌরাণিক ও মহাকাব্যের যুগে এসে আমরা নারীদের মধ্যে অনেক ব্রহ্ম তপস্বিনী, সন্ন্যাসিনী ও যোগিনীর সাক্ষাৎ পাই। রামায়ণে তাপসী শ্রমণী ও

শবরীর কাহিনী কথিত হ'য়েছে। শবরী ছিলেন মহর্ষি মাতঙ্গের শিষ্যা এবং তিনি অশেষ অধ্যাত্ম শক্তির অধিকারিণী। তিনি জটাবল্কল ধারণ করে কঠিন তপশ্চর্যায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। মহাভারতে আমরা প্রব্রজ্যা-গ্রহণকারিণী সন্ন্যাসিনী ও মহাযোগিনী সুলভার কাহিনী পড়ি। তিনি যোগসাধনা করে যে মহাশক্তি ও জ্ঞানের অধিকারিণী হয়েছিলেন, তার বিভূতি জনকরাজার সভায় গিয়ে প্রদর্শন করেন। শিব নামে আরেকজন তপস্বিনী বেদশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং তিনি অধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। শাণ্ডিল্যের কন্যাও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে আত্মোপলব্ধিতে সিদ্ধিলাভ করেন। কখনো কখনো বিবাহিতা নারীগণও তপস্বিনী হ'য়ে যেতেন। প্রভাসের পত্নী এইভাবে ব্রহ্মবাদিনী হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

এমন কি আজো ভারতবর্ষে অনেক 'যোগিনী' আছেন, যারা চূড়ান্ত আত্মোৎকর্ষের অধিকারিণী। এ'দের অনেকেই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই গুরুর আসন অধিকার করেছেন। এইরকম একজন 'যোগিনী'ই শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতমা গুরু ছিলেন। এবং শ্রীরামকৃষ্ণেরও এমন অনেক শিষ্যা ছিলেন যাঁরা মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ ক'রে নিজেরাও গুরুর আসন অধিকার করেন।

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের শ্রমণী ও সন্ন্যাসিনীদের সম্পর্কে পরবর্তী খণ্ডের কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

ভারতের ইতিহাসে স্মৃতি-পুরাণের যুগকে (৫০০ খ্রীঃ পূঃ—৬০০ খ্রীঃ) অন্ধকার যুগ বলা হয়, এবং এ সময়ে বালিকাদের শিক্ষার সুযোগ ছিল না। বাল্যবিবাহ প্রথা হিসাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এবং বালিকাদের বিবাহ ছিল অবশ্য করণীয়। তাদের পরিপূর্ণ মানসিক ও আত্মিক বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত না। এই যুগের সূচনাতেই বালিকাদের উপনয়ন একান্তভাবে আচারধর্মী সংস্কার-কর্ম বা নিয়মরক্ষার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল; উপনয়নের পর বেদাভ্যাসে আত্মিক পরিণতি লাভ করবার উপায় ছিল না। নারীদের বেদ অধ্যয়ন উঠে যাবার মত হয়েছিল। এমনকি একথাও বলা হয়েছিল যে, বালিকাদের ক্ষেত্রে উপনয়ন-ক্রিয়া তাদের দ্বারা বেদমন্ত্র আবৃত্তি-করা ছাড়াই চলতে পারে। সমাজপতিগণ ক্রমে এটা অনুভব করলেন যে, ব্যাপারটা যেহেতু নিছক রীতিরক্ষার পর্যায়ে এসে গেছে, সেইহেতু এটাও উঠিয়ে দেওয়া চলতে পারে। যাজ্ঞবল্ক্য সেইজন্য বালিকাদের উপনয়নের অধিকার দেননি। পরবর্তী স্মার্ত মনীষীরাও এই পথেই চলেছিলেন।

যদিও হিন্দুদের মধ্যে কিছুসংখ্যক সন্ন্যাসিনীর অস্তিত্ব ছিল, তবু হিন্দুদের ধর্মজীবনে তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। একজন বানপ্রস্থিন আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মোৎসর্গের বাসনায় তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই বনগমন করতে পারতেন, তবে এমন ঘটনা ছিল খুবই বিরল। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম স্ত্রীর পক্ষে বনগমনের এই অনুমতিও প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, এবং বিধিনিষেধের সেই "লৌহযুগে" অনুশাসন দিয়েছিল যে আশ্রমিক জীবন নারীদের পক্ষে অনাচরণীয়। এই অনুমতি প্রত্যাহারের ব্যাপারটা আরো বেশী কঠিন হ'য়ে চেপে বসেছিল সেই সময়, যখন বৌদ্ধ সংঘারামে শ্রমণ-শ্রমণীদের মধ্যে অনাচার আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল।

(৪)

মহাকাব্য ও পুরাণবর্ণিত ধর্মাচরণ ৬০০—১৮০০ খৃষ্টাব্দের ভিতর লোকপ্রিয় হ'য়ে ওঠে। একাদশ শতাব্দী নাগাদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি যে ভাষায় রচিত হ'য়েছে সেই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের পক্ষে অবোধ্য হ'য়ে উঠল। নারীদের কাছে বৈদিকযুগের সমস্ত অধিকারই বন্ধ হ'য়ে গেল। ভক্তিবাদের আবির্ভাব ঘটল এই যুগে এবং নারীসমাজ তাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে নিল। সমস্ত হিন্দু ধর্মসাধিকাই কোনো না কোনো শাখার অনুরাগিণী ছিলেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এ ধরনের অনেক ধর্মসাধিকা জন্ম গ্রহণ করেছেন। ব্রতপালন. উপাসনা, স্তোত্রপাঠ, ধর্মগ্রন্থের পাঠশ্রবণ এবং অন্যান্য আত্মিক সংযমই ছিল তাঁদের সাধনার অঙ্গ। এ'দের মধ্যে কয়েকজন স্মরণীয়া ধর্মসাধিকার কথা স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থে।

এটা খুবই আশ্চর্য মনে হতে পারে যে, ভারতের মতো বিশাল দেশে গভীর আত্মোপলব্ধি-সম্পন্না এত বহুসংখ্যক ধর্মসাধিকা ও ধর্মপ্রাণা নারী থাকা সত্ত্বেও কেন সন্ন্যাসিনীদের কোনো ধর্মসংঘ গঠিত হ'তে পারেনি। এমন কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকার কারণ অবশ্য অনেকগুলি। প্রথমত, হিন্দুসমাজের অন্তর্ঘাতী বিশৃঙ্খলা এবং মুসলমান শাসনের বাধানিষেধের ফলে এই দেশ তখন জাতীয় অবনতি ও সামাজিক ভাঙনের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছিল। দ্বিতীয়ত, শ্রীশঙ্করাচার্য যদিও তাঁর সুগভীর মনীষা ও সমুচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সমাজের বুদ্ধিশালী আত্মোন্নত শ্রেণীর উপর একাধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তবু সে সময়ে হিন্দুধর্মে এমন কোনো একক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব

ঘটেনি, যিনি যুগপৎ বুদ্ধিবাদী শ্রেণী এবং বৈষ্ণব ইত্যাদি সাধন পদ্ধতির কোনো একটিতে, অথবা রাম, কৃষ্ণ, গণেশ কিংবা সূর্য ইত্যাদি ঈশ্বরের কোনো একটি অভিব্যক্তিতে অনুরাগিনী ছিলেন। ফলে একটি ধর্মসংঘ গঠিত হওয়ার জন্যে যে ধারণকারিনী শক্তির প্রয়োজন, নিশ্চিতভাবেই তার অভাব ছিল। চতুর্থত, পরিবারে এবং সমাজে নারীগণ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষের উপর একান্ত নির্ভরশীল ছিল; সেজন্য মানসিক ও আত্মিক বিকাশের যা প্রথম শর্ত, সেই কর্মের স্বাধীনতা তাদের একেবারেই ছিল না। পঞ্চমত, বিভিন্ন প্রদেশের আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন নারীদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ ছিল না; তাছাড়া এমন একটি সর্বজনবোধ্য ভাষাও ছিল না যার ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলতে পারত। এইসব কারণে, বৌদ্ধ শ্রমণীদের সংঘারাম লোপ পাওয়ার পর ভারতীয় নারীদের মধ্যে ধর্মসংঘ স্থাপনের কোনো আগ্রহ দেখা দেয়নি। আর এ সময়ে হিন্দুধর্মের কর্ণধারদের কাছ থেকেও অনুরূপ সংঘ-স্থাপনের দাবী আদায় করা সম্ভব ছিল না। তাই পূর্ণাবয়ব কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেয়ে ব্যক্তিগত সাধনসিদ্ধির দিকেই জোর দেওয়া হ'য়েছিল।

(৫)

আধুনিক ভারতবর্ষের অভ্যুদয় ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে, এবং এই সময়েই জাতীয় নবজাগরণের সূত্রপাত। হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্ম, যা বহুকাল নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল, এই সময়ে আধুনিক ধরনের চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে নবচেতনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই জাগরণের ফলে পুরুষ ও নারী উভয়েই উপকৃত হয়। নারীদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কোনোপ্রকারে ধিকিধিকি জ্বলছিল; পরবর্তী কয়েক বংশকালের মধ্যেই তা অগ্নিশিখার অনির্বাণ আলোকে ভাস্বর হ'য়ে উঠল। প্রেরণা এসেছিল বিজাগ্রত হিন্দুধর্মের কাছ থেকেই। এর চিন্তা-নায়কেরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। নারীগণও এর ফলে তাঁদের লুপ্ত অধিকার ফিরিয়ে পেতে লাগলেন। ক্রমে তাঁরা অনেক পরিমাণে সামাজিক স্বাধীনতা পেলেন, এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে, আর নাগরিক ও সামাজিক জীবনে সমান সুযোগ সুবিধা অর্জন করতে লাগলেন।

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের পর যতো ধর্মান্দোলনের আবির্ভাব ঘটে তাদের

প্রত্যেকটিই নারীকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর সহযোগী সন্ন্যাসীদের উদ্দীপনাময় প্রেরণা এবং প্রবুদ্ধ পরিচালনায় 'রামকৃষ্ণ-আন্দোলনে'-এ কাজ হ'য়েছিল যথেষ্ট, তেমনি কাজ হ'য়েছিল মহাত্মা গান্ধীর দেশব্যাপী সংগঠন-কর্মের মধ্য দিয়ে। এখন ভারতবর্ষে নারীজাতি অধিকতর সামাজিক সমতার আবহাওয়ায় বাস করেন এবং তাঁদের মানসিক এবং আত্মিক স্বাধীনতাও অনেক বেশী। তাঁদের অগ্রগতির পথে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা—বিশেষ করে বাংলাদেশ, মহারাষ্ট্র, কেরালা, তামিলনাদ এবং অন্যান্য প্রদেশে।

রামকৃষ্ণ, সারদা দেবী, বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যের জীবন ও শিক্ষা যে কেবল উন্নতমনা, সর্বত্যাগী পুরুষের আবির্ভাব ঘটতে সাহায্য করেছে তাই নয়; আত্মোৎসর্গকারিণী, ধর্মপ্রাণা নারীও দেখা দিয়েছেন অনেক। এই প্রেরণা এত ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে যে পাশ্চাত্য থেকেও কয়েকজন নারীকে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁরা এদেশে এসে এদেশেরই সন্ন্যাসিনীরূপে সমাজে স্থান লাভ করেছেন। যেমন ভগিনী নিবেদিতা (কুমারী মার্গারেট নোবল) এবং ভগিনী ক্রিস্টাইন। এঁরা সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করে ভারতীয় নারীদের মধ্যে ভারতীয় সন্ন্যাসিনীর মর্যাদাতেই সেবাকর্ম পরিচালনা করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও শত শত নারী ও বালিকাদের হৃদয়ে আত্মত্যাগ ও সেবার আহ্বান সাড়া জাগিয়েছে। এরা দেশব্যাপী সেবার কাজে এবং আত্মোপলব্ধির আদর্শে উৎসর্গ করেছেন নিজেদের। এবং এটা আশা করা অযৌক্তিক হবে না যে, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেবের অনুমতিক্রমে যেমন শ্রমণীদের সংঘারাম স্থাপিত হ'তে পেরেছিল, তারই অনুরূপ কোনো সংঘের মধ্যে এই নারীদের ভিতর যাঁরা অধিকতর নিষ্ঠাবতী তাঁরা নিজেদের সংগঠিত করে নেবেন। এ লক্ষ্যের দিকে প্রাথমিক কাজ, কোনোরকম প্রতিষ্ঠান-গত সাহায্য ছাড়াই, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্যা অন্যান্য সহকর্মিণীর দ্বারা এখনি আরব্ধ হ'য়ে গেছে। গত দুই পুরুষের নারীগণ এই সন্ন্যাসিনীদের পূত-চরিত্রের প্রভাবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে খুবই প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছেন। ভবিষ্যতে যে নারীবৃন্দ বংশের পর বংশ ধরে জন্ম গ্রহণ করবেন, তাঁরাও যেন এঁদের প্রভাবেই গঠিত করতে পারেন নিজেদের জীবন ও চরিত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অব্বইয়ার

অব্বইয়ার ছিলেন প্রাচীন ভারতের মহান সাহিত্যিকবৃন্দের অন্যতমা। যে সব বিশিষ্ট ধর্ম-সাধিকার নাম যুগ যুগ ধ'রে স্মরণীয় হ'য়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত টিঁকে রয়েছে, তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, পৃথিবীর জীবন্ত-ভাষাগুলির মধ্যে তামিলই হচ্ছে সব চেয়ে প্রাচীন। তামিল ভাষার সূত্রপাত ঘটে চার হাজার বছরেরও বেশী আগে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এমন নিদর্শন আমরা পেয়েছি যার রচনাকাল নির্দেশ করা হ'য়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০, এমনকি ১০০০ বছরের সম-সময়ে। আর ঐ সাহিত্য যে কোনো দেশের অত্যন্ত উৎকর্ষ-সমৃদ্ধ আধুনিক সাহিত্যের মতোই জ্ঞানদীপ্ত, বৈচিত্র্যশালী এবং গভীর জীবনজিজ্ঞাসু হিসাবে কৌতূহলোদ্দীপক। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ভাষাটির অস্তিত্ব আরও অনেক শতাব্দী পূর্ব থেকেই ছিল। কথিত আছে যে, সে সময়কার তামিল-অধ্যুষিত দেশ দক্ষিণ ভারতের বর্তমান সীমারেখা ছাড়িয়েও বহু দূরান্তর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্যের নিদর্শন এখন যা পাওয়া যায় তার উল্লেখ অনুসারে মনে হয়, তখন তার অস্তিত্ব ছিল এমন এক গোটা উপমহাদেশই এখন সমুদ্রগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে। এ ত বর্তমান ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণাতেও সমর্থিত হয় যে, বহু সহস্র বৎসর আগে ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা একই ভূখণ্ডে সংযুক্ত ছিল এবং দেশটি এখনকার কুমারিকা অন্তরীপ ছাড়িয়ে দক্ষিণে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বহু ভাষার অস্তিত্ব ছিল, যা নিজেদের যুগে খুবই উৎকর্ষলাভ করেছিল, কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সুমেরীয়, আসিরীয় এবং অন্যান্য সভ্যতার প্রত্যেকেরই ঐশ্বর্যশালী ভাষা ছিল, অথচ পরবর্তীকালে বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। সংস্কৃত নিজেও একটি প্রাচীনতম ভাষা এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মাতৃস্থানীয়া, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য সম্পদের অধিকারিণী হয়েও পণ্ডিত সমাজ-ছাড়া এ-ভাষা অন্যদের এখন কথ্য ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। তামিল ভাষার ব্যাপার কিন্তু আশ্চর্য! কত সহস্র বছর আগে এর উৎপত্তি ঘটেছে, প্রাচীনকালের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য

এতে বিকাশলাভ করেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ ভাষা একইভাবে ব্যবহৃত হ'য়ে চলেছে। সেই প্রাচীন সাহিত্যে এমন একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষাৎ আমরা পাই, যা ভাবের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শের উদ্‌গাতা।

এই প্রাচীন সাহিত্যে অনেক বিশিষ্ট চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়দের একজন হচ্ছেন অব্বইয়ার। মনে হয়, তখন অব্বইয়ার ছিলেন দুজন। একজন হলেন 'তিরুক্কুরল' নামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নীতি-গ্রন্থের রচয়িতা মহান তিরুবল্লুবরের সমসাময়িক। তাঁর কাল ছিল খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে। অন্য জন ছিলেন বর্তমান খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতকে। পূর্বতন অব্বইয়ার-ই এই নিবন্ধের আলোচ্য, এবং তিনি ছিলেন বিরাটতর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। পরবর্তী জন তাঁরই সুপরিচিত নামে পরিচিত করেছিলেন নিজেকে। এই মহান ধর্মসাধিকার নাম বহু শতাব্দী অতিক্রম করে আমাদের কাছে পৌঁছানোর কালে স্বভাবতই উপকথামণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এই উপকথার অস্পষ্টতার ভিতর দিয়েও অব্বইয়ারের প্রকৃত চরিত্রটিকে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। দেখা যায়, তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞানের আধার, মানবিক করুণায় বিরাট, মহীয়সী নারী—যাঁর মৈত্রীবোধ ছিল পরাক্রমশালী রাজন্যবর্গ থেকে শুরু ক'রে দীনতম নরনারী পর্যন্ত প্রসারিত।

কথিত আছে যে অতি শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীনা হ'য়ে পড়েন, এবং একজন কবি তাঁকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেন। ষোল বছর বয়সে তিনি সৌন্দর্যের জন্য এতোই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন যে, অনেক রাজারাজড়াও তাঁকে বিবাহ করার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ধর্মানুরাগ ও সাহিত্য-প্রীতি ছিল খুবই গভীর, এবং তিনি মানুষের সেবাতেই আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এদিকে তাঁর পালক পিতা এবং পালিকা মাতার প্রবল অভিপ্রায়, তাঁর বিবাহ দিবেন। বড় বড় লোকের কাছ থেকে লোভনীয় দানের আকর্ষণ তাঁরা উপেক্ষা করতে পারছিলেন না; এবং শেষ পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী রাজ্যের এক রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করলেন তাঁরা। এই আদেশের সম্মুখীন হ'য়ে অব্বইয়ার তাঁর দেবতা বিঘ্নেশ্বরের কাছে সাশ্রুনয়নে প্রার্থনা জানালেন যেন সেই দুর্দৈব থেকে তিনি উদ্ধার পান। তিনি বলেছিলেন, "হে প্রভু, এই ব্যক্তিরা কেবল আমার যৌবন আর রূপের প্রতি মোহমুগ্ধ। কিন্তু আমি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেশের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে চাই। দয়া করে তুমি আমার রূপ-যৌবন ফিরিয়ে নাও, তাহলে হয়তো আমি শান্তি পাব, এবং অভীষ্ট পথে জীবন কাটাতে পারব।" কথিত আছে যে, ঈশ্বর তার

প্রার্থনা শুনেছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ এই রূপসী নবযৌবনা কন্যা রূপহীনা এক বৃদ্ধা নারীতে রূপান্তরিতা হ'য়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে তিনি বিবাহের প্রস্তাব থেকে অব্যাহতি পান, এবং তখনকার তামিল-অধ্যুষিত স্থানগুলিতে ভ্রমণ ক'রে জ্ঞানের বাণী বিতরণ করতে থাকেন। হয়তো এটা উপকথা; কিন্তু সত্য যা ঘটেছিল তাও অনুমান করা কঠিন নয়। এটা প্রায় আপ্তবাক্য যে, কেবল একনিষ্ঠ আত্মদানের ফলেই জ্ঞানের উচ্চতম মার্গে উপনীত হওয়া সম্ভব। পরমের সন্ধানে একাগ্র হ'তে হলে রূপযৌবনের চর্চার আনন্দ পরিহার করতে হবে। মনে হয় অব্বইয়ার এই কাজই করেছিলেন, হয়তো বল্কল জটায় ও কৃচ্ছ্রসাধনে তিনি শীর্ণা ও রূপহীনায় পরিণত হয়েছিলেন। হয়তো বা এইরূপ দর্শনে ভোগীর দৃষ্টি সংকুচিত হয়েছিল। এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাপারটা উপকথার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল।

ছোট বড় সকলের কাছেই তিনি তাঁর জ্ঞানের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর এই দেশ পরিক্রমার সময়ে তিনি এক দম্পতির দেখা পেয়েছিলেন। স্ত্রীটি ছিল খুবই মুখরা, এবং স্বামীর উপর সে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতো। অব্বইয়ারকে উপবাসক্লিষ্টা দেখে স্বামীটি করুণা-পরবশ হ'য়ে নিজের বাড়ীতে তাঁকে আমন্ত্রণ করে আনে, কিন্তু স্ত্রীকে কিছুতেই সাহস ক'রে খাবার দেওয়ার কথা বলতে পারে না। স্ত্রীর মন ভেজানোর জন্যে সে তাকে আদর করলো, চুল আঁচড়ে দিল, মিষ্ট কথা বলল; তারপর সবশেষে জানাল যে একজন গরীব, উপবাস-কাতর নারীকে কিছু খাবার দেওয়ার জন্যে সে বাড়ীতে এনেছে। স্ত্রী শুনে রাগে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে স্বামীকে মারতে লাগল। অব্বইয়ার এটা দেখতে পেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর স্বামীটি যখন এসে ক্ষমা চাইতে লাগল, অব্বইয়ার তার দুঃখে সমবেদনা জানিয়ে বললেন, "বিবাহিত জীবন আনন্দ ও সুখ দেয় তখনই যখন উপযুক্ত, প্রীতিময়ী স্ত্রী পাওয়া যায়। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয় তো বিবাহিত জীবন নরক, এবং তখন কর্তব্য হ'ল সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করা।"

এই রকমই, তাঁর প্রব্রজ্যার সময়ে অন্য এক উপলক্ষে তিনি এক গ্রাম্য কৃষকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে এই ব্যক্তির অবশ্য খুব সদ্ভাব ছিল, কিন্তু স্ত্রী তাকে তার তদানীন্তন জীবিকা ছেড়ে প্রতিবেশী এক সর্দারের কাছে চাকরী নেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছিল। তারা অব্বইয়ারের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করে, এবং তিনি তাদের এই উপদেশ দেন, "নদীর ধারের গাছ আর রাজার উপর নির্ভরশীল জীবন, দুয়েরই অস্তিত্ব খুব অনিশ্চিত, এবং কোনো

না কোনো সময়ে ভেঙে পড়বেই। ভূমি কর্ষণকারীর মত আর কারও জীবন এত সুখসম্মান-জনক নয়। আর কোন জীবিকাই এত স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন নয়, যেমন হল কৃষিকর্ম।"

সে সময়ে তামিল দেশের বিভিন্ন রাজ্যের অনেক রাজাই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। নিজেদের রাজসভাতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত রাজাদের মধ্যে। দু'এক সময় যখন যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিত, অব্বইয়ার সাফল্যের সঙ্গে মধ্যস্থের ভূমিকা নিতেন। তিনি বুঝিয়ে দিতেন যে, রাজাদের উচ্চাশাই যুদ্ধের কারণ; কিন্তু যারা এতে দুর্দশা ভোগ ক'রে তারা হল দুই পক্ষেরই সাধারণ নরনারী। যুদ্ধের অনিষ্টের কথা বুঝিয়ে তাই তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের জন্যে অনুরোধ জানাতেন।

তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্যে রাজারা যদিও সর্বদাই তাঁর শরণাপন্ন হতেন, তবু তিনি রাজন্যসমাজের সংস্পর্শ এড়িয়ে দরিদ্র, সরলপ্রকৃতির সাধারণ মানুষের মধ্যে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনই বেশী পছন্দ করতেন; আর এই সাধারণ মানুষেরাও তাঁর সঙ্গ ছাড়ত না কখনো। তিনি তাদের মধ্যে অনাড়ম্বর কুটীরে বাস করতেন, তাদেরই সামান্য খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং তাদের আটপৌরে কাপড়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করতেন, এবং এই সাধারণ মানুষদের দুঃখ দুশ্চিন্তার মধ্যে তাদের সাহস দিয়ে কর্তব্য পথে চালিত করতেন। সকলে তাঁকে এতো ভালবাসত যে তাঁর নাম হ'য়েছিল 'বিশ্বমাতামহী'। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন, এবং তাঁর এই দীর্ঘজীবন সকলের পক্ষেই মঙ্গলজনক হ'য়েছিল।

অব্বইয়ার অনেকগুলি নীতিগ্রন্থ রচনা করেন। তার কোনো-কোনোটি এখনো বিদ্যালয়ে শিশুরা পাঠ করে থাকে। তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম—আত্তিচূড়ি, কন্‌রই বেন্তন্, উলকনীতি, মূতুরই, নল্‌বঝি, নন্নেরি, নীতি-নেরি-বিলক্কম্, নীতি বেন্‌বা এবং অরণেরিচারম্। এদের মধ্যে কয়েকখানি হল সংক্ষিপ্ত বাণীর সংগ্রহ, আর কয়েকখানি হল প্রচলিত 'বেনবা' ধরনের চতুষ্পদী কবিতা। এদের সবগুলিই বালক-বালিকা অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের উদ্দেশ্যে রচিত জ্ঞানের বাণী। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

১। উত্তেজনাকর বাক্য বলো না। — আত্তি চূড়ি

২। দানকর্মে আসক্তি আনো। — আত্তি চূড়ি

৩। চিন্তা ক'রে কাজ কর। — আত্তি চূড়ি

৪। নিজের সদ্‌গুণের অহঙ্কার করো না। — আত্তি চূড়ি

৫। ধানের খোসা থেকে যদিও চালই পাওয়া যায়, তবু খোসা না থাকলে ধান ফলে না। সেই রকম প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও উপযুক্ত মাধ্যম ছাড়া কিছু করা সম্ভব হয় না। — মুতুরই

৬। তাল গাছের ফুল বড়, কিন্তু সুগন্ধহীন; ছোট্ট মগিঝা ফুলের কতো সুগন্ধ। মানুষকে তার আকার দেখে বিচার করো না। বিশাল সমুদ্রে কতো জল, কিন্তু স্নানও করা চলে না; অথচ তারই পাশে ছোট ঝরণাতে সুপেয় জলের ধারা ব'য়ে চলেছে। — মুতুরই।

৭। কঠিন কথা দিয়ে কোমল হৃদয়কে জয় করা যায় না। যে তীর দিয়ে হাতি শিকার চলে, সেই তীর দিয়েও একটুকরো তুলোতে দাগ বসানো যায় না। যে পাথুরে পাহাড় দীর্ঘ লোহার শাবলে অটুট থাকে, তাই কোমল গুল্মের শিকড়ে বিদীর্ণ হ'য়ে যায়। — নলবঝি

৮। একজন যতোই সৎপ্রকৃতির হোক না কেন, নীচ প্রকৃতির লোক সর্বদাই তার দোষের কথাই বলবে; যেমন কোনো ফলের বাগানে ফুলে ফুলে কতোই না মৌমাছি ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কাক খোঁজে কেবল নিমফল। — নন্নেরি

৯। সেচের জলাধারে বাঁধ থাকা দরকার। সমুদ্রের কোনো বাঁধ দরকার হয় না। যাঁরা শ্রদ্ধা চান তাঁদের বেলাতেও তেমনি ঘটে; ছোটরা নিজেদের বাঁচিয়ে চলে, প্রকৃত যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এ নিয়ে ব্যস্ত হন না। — নন্নেরি

১০। যৌবন জলবুদ্বুদের মতো; উচ্ছল ধনসম্পদ সমুদ্রের চঞ্চল ঊর্মিমালার মতো; এবং জলের লিখন যতোটা স্থায়ী, দেহ তার চেয়ে বেশী স্থায়ী নয়। বন্ধুগণ, তবে কেন তোমরা ঈশ্বরের রাজত্বে উপাসনায় আত্মনিবেদন কর না। — নীতি-নেরি-বিলক্কম্

১১। কেবল গুপ্তচরের আনা সংবাদের উপর নির্ভর করেই রাজাদের[১] পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়, নানাস্থানে একা ছদ্মবেশে ঘুরে সত্যনির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত। এবং যেহেতু স্থূল ঘটনার ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রতিবিধান করলে ন্যায়বিচার না হওয়া সম্ভব, সেইজন্য স্থিরমস্তিষ্কে না ভেবে ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা করা উচিত। — নীতি-সেরি-বিলক্কম্

১২। প্রকৃত মন্ত্রীরা রাজার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তাঁদের সুপরামর্শের দ্বারা

---

১ এখানে তামিল রাজাদের প্রাচীন রীতির বিষয়ে উল্লেখ করা হ'য়েছে। তখন রাজারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছদ্মবেশে ঘুরে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতেন।

রাজাকে ন্যায়বোধে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে ভয় পান না। মত্ত হস্তীও যেমন মাহুতের দ্বারা চালিত হয়, তেমনি মন্ত্রীরা রাজাকে ন্যায়পথে চালিত করেন।

— নীতি-সৌর-বিলক্কম্

১৩। মাতৃবিয়োগে আহারে রুচি চলে যায়; পিতৃবিয়োগে পড়াশোনায় বাধা পড়ে; ভ্রাতৃবিয়োগে ডান হাত পঙ্গু হ'য়ে যায়; কিন্তু, হায়, যখন স্ত্রীবিয়োগ ঘটে তখন সবই তার সঙ্গে চলে যায়। — নীতি-বেন্‌বা

১৪। যে মণি সভাস্থল আলো করে সে হল বিদ্বান ব্যক্তি; আকাশমণ্ডল আলো করে সূর্য; ....আর ঘর আলো করে পুত্র। — নীতি বেন্‌বা

১৫। কন্যার বিবাহের সময় পিতার চাহিদা হয় বিদ্যা, মাতা খোঁজ করেন ধনসম্পত্তির খবর, আত্মীয়রা লক্ষ্য করেন বংশ-কুলজী, আর কন্যা নিজে দেখে শুধু বরের সৌন্দর্য। — নীতি বেন্‌বা

১৬। যাঁরা অত্যন্ত উন্নতহৃদয় ব্যক্তি, দানের ক্ষেত্রে তাঁরা তালবৃক্ষের মতো। গ্রহণ করেন তাঁরা খুবই কম, কিন্তু দান করেন অনেক বেশী। এ'দের নিচে হ'ল সেই সব ব্যক্তিদের স্থান, যারা সুপারী ও কলাগাছের মতো, যে পরিমাণে গ্রহণ করে, ফিরিয়ে দেয় তার চেয়ে অনেক কম। — নীতি-বেন্‌বা

১৭। চন্দ্রকিরণ স্নিগ্ধ, চন্দনপ্রলেপ স্নিগ্ধতর, কিন্তু স্নিগ্ধতম হল সেই সব মধুর প্রকৃতি ব্যক্তির মিষ্ট বাক্য যাঁরা প্রীতি, বিদ্যা এবং ধৈর্যের অধিকারী।

— নীতি বেন্‌বা

১৮। হে শীতল পর্বতের অধীশ্বর! মানুষের সমস্ত সঞ্চয়ই পিছনে তার বাড়ীতে পড়ে থাকে। তার ক্রন্দনরত আত্মীয়স্বজন তাকে শ্মশানে রেখে যায়। আগুন তার দেহকে গ্রাস করে। যদি তার কিছু সুকৃতি থাকে, তবে সেই সদ্‌গুণই কেবল তার সঙ্গী হয়। — অরণেরিচারন্

১৯। যে দিনগুলি চলে গেছে তা আঙুলে গুণে শেষ করা যায়; সম্মুখের দিনগুলি হিসাবের মধ্যে আনা যায় না। ভালো কাজ না ক'রে দিনের পর দিন নষ্ট করা কী ভীষণ অন্যায়! — অরণেরিচারন্

২০। স্নানে না নেমে ঢেউগুলিকে শান্ত করা যায় না। ধনী হওয়ার অপেক্ষায় সৎকর্ম স্থগিত রাখাও সেইরকম—কেননা ধনসম্পদ তখন উপকারে না লাগতেও পারে। নিজের সাধ্যানুসারে প্রত্যেকেরই যখনকার দরকার তখনই সৎকাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। একমাত্র এদেরই ক্ষেত্রে ধনসম্পদ উপকারী হ'য়ে উঠে।

— অরণেরিচারম্

২১। লোকহিতব্রত-সবচেয়ে উন্নত সদ্‌গুণ; নিজের জ্ঞান সবচেয়ে ভাল সঙ্গী; আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন-যাপন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট আচরণ। নিন্দার হাত থেকে যাঁরা অব্যাহতি চান, এই পথেই তাঁদের চলা উচিত। — অরণেরিচারম্

২২। অতি ভোজনের ফলে ইন্দ্রিয়গুলি বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে, আসক্তি বেড়ে যায়, এবং পরিণামে ধ্বংস আসে। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিরই উচিত, জীবনধারণের জন্যে যতটুকু দরকার সেই পরিমাণে আহার গ্রহণ ক'রে জীবনের পূর্ণতম সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হওয়া। — অরণেরিচারম্

কারইক্কাল অম্মইয়ার

শৈবধর্মের চারজন আচার্যের অন্যতম, তপস্বী সুন্দর যে তেষট্টিজন বিধিবদ্ধ শৈব সাধুর নাম উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তিনজন নারীর নাম অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। তাপসী কারইক্কাল অম্মইয়ার তাঁদেরই একজন। অন্য দুজন হ'লেন—পান্ডীয়ন রাজমহিষী তাপসী মঙ্গইয়র করশিয়ার এবং তপস্বী সুন্দরের জননী ঈশই জ্ঞানিয়ার। তাপসী কারইক্কাল অম্মইয়ারের নামকরণ হ'য়েছিল তাঁর জন্মস্থান কারইক্কালের[১] নামানুসারে। কোন শতাব্দীতে তিনি জন্মেছিলেন তার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে শৈবধর্মের আচার্য চতুষ্টয়ের অন্যতম-তপস্বী তিরুজ্ঞান সম্বন্ধের অনেক পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তপস্বী তিরুজ্ঞান সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মেছিলেন। কাজেই কারইক্কাল অম্মইয়ারের জন্মকাল ৪০০—৬০০ খৃীষ্টাব্দের মধ্যেই হওয়া সম্ভব।

চোল সম্রাট দ্বিতীয় কুলট্টুঙ্গের (১১৩৩—১১৪৬ খৃীঃ) প্রধানমন্ত্রী নোক্কিঝার[২] রচিত তিরুতোন্ডর পুরাণ, যা পেরিয়া পুরাণ নামে পরিচিত সেই গ্রন্থ থেকেই তাপসী অম্মইয়ারের জীবন-বিষয়ে আমরা প্রাথমিক সূত্র পাই। আর অম্মইয়ারের স্ব-রচিত কাব্য গ্রন্থগুলি থেকে তাঁর ধর্মবিশ্বাস, আদর্শাকাঙ্ক্ষা ও আত্মোপলব্ধির বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি।

পেরিয়া পুরাণের বর্ণনাকে অনুসরণ করে এইবার তাপসী অম্মইয়ারের জীবন বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া গেল।

বহু শতাব্দী থেকেই কারইক্কাল ছিল আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের একটি কর্মচঞ্চল বর্ধিষ্ণু বন্দর। এর ধনশালী বণিক সম্প্রদায় সর্বব্যাপারে সাধুতা ও ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা ক'রে চলতেন। অম্মইয়ারের সময়ে এঁদের প্রধান ছিলেন দানদত্ত নামে একজন শ্রেষ্ঠী। এবং অম্মইয়ার তাঁরই ঘরে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক'রে রূপের জন্যে বিখ্যাত হন। তখন তাঁর নাম ছিল পুণিদবতী, অর্থাৎ 'যে নারী পুণ্যহৃদয়া'।

---

১ করকমন্ডল উপকূলের এই বন্দরটি আগে ফরাসী অধিকারে ছিল। স্থানটি মাদ্রাজ-রাজ্যের তাঞ্জোর জেলার মধ্যে অবস্থিত।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদটীকা দ্রষ্টব্য।

অতি শৈশবেই পুণিদবতী অত্যন্ত প্রেম ও আনন্দের সঙ্গে শিব-নাম আবৃত্তি করতেন। পরবর্তী জীবনে একটি স্তোত্রে তিনি গেয়েছেন—

হে দেবাদিদেব, হে নীলকণ্ঠ! আমার বাক্যস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমি পরম প্রেমভরে তোমার পুণ্যচরণে শরণাগত হ'য়েছি। প্রভু, কতদিনে তুমি আমার এ ভবযন্ত্রণা মোচন করবে?

বলাইবাহুল্য, শ্রেষ্ঠীপ্রধানের একমাত্র কন্যারূপে অম্মইয়ার অত্যন্ত আদরের মধ্যেই লালিত-পালিত হ'য়েছিলেন। দিনে দিনে তাঁর স্বাভাবিক রূপলাবণ্য পূর্ণবিকশিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু লক্ষ্য করা গেল, তাঁর বালিকা বয়সের সমস্ত খেলা-ধূলোই শিবপূজাকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত। শিবভক্তদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং তাঁদের সেবা করার জন্যে তাঁর ব্যগ্রতাও সমভাবেই বেড়ে উঠতে লাগল।

এরপর তিনি ক্রমে পূর্ণবয়স্কা হ'য়ে উঠলেন। এই বয়সে হিন্দু বালিকাদের বাড়ীর বাইরে বেরোনো বন্ধ হ'য়ে আসে, এবং বিবাহের কথাবার্তা শুরু হয়। নাগপত্তিনম নামে অন্য একটি বৃহৎ সামুদ্রিক বন্দরে তখন একজন ধনী বণিক বাস করতেন। পরমদত্ত নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল। বণিকটি তাঁর এই পুত্রের জন্যে কারাইক্কালে লোক পাঠালেন, যাতে পুণিদবতীকে পাত্রী হিসাবে পাওয়া যায়। দানদত্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কন্যার গৃহে অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়ে গেল। পুণিদবতী তাঁর একমাত্র কন্যা ছিলেন বলে দানদত্ত জামাতাকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি কারইক্কালেই থেকে যান। এই উদ্দেশ্যে তিনি জামাতাকে একটি প্রাসাদোপম গৃহ উপঢৌকন দিলেন। তাছাড়া স্বাধীনভাবে বাণিজ্য চালানোর জন্যে প্রচুর অর্থও দিলেন।

পুণিদবতীর বিবাহিত জীবন এইভাবে শুভারম্ভের মধ্য দিয়েই শুরু হ'য়েছিল। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোবাসতেন এবং শিক্ষিত পরিবারের কর্তব্যপরায়ণা পত্নীর মতো স্বামীর সন্তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করতেন। কিন্তু বালিকা বয়সের সেই গভীর ও অন্তহীন শিবপ্রেমও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলতে লাগল। ফলে যখনই কোনো শিবভক্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, পরমশ্রদ্ধাভরে পুণিদবতী তাঁকে আহার করাতেন এবং বিদায় হিসাবে স্বর্ণদ্রব্য ও বস্ত্রাদি উপহার দিতেন। এইভাবে তাঁর ঈশ্বরপ্রেম গভীর থেকে গভীরতর হ'তে লাগল। তাঁর স্বামীর অবশ্য এ সব দিকে মতি ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে ধর্মকর্মে বাধাও দিতেন না।

একদিন পরমদত্তকে তাঁর বাণিজ্য স্থলে একদল দর্শনপ্রার্থী এসে দুটি সুমিষ্ট

আম উপহার দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা শেষ হলে একজন ভৃত্যের হাতে পরমদত্ত এই আম দুইটি তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পুণিদবতী সেগুলি গ্রহণ ক'রে যত্নের সঙ্গে রেখে দিলেন। এরপর একজন বৃদ্ধ শিবভক্ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তাঁকে অত্যন্তই উপবাসক্লিষ্ট ও ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছিল। পুণিদবতী বুঝতে পারলেন, তখনই তাঁকে কিছু আহার্য দেওয়া দরকার। তিনি বৃদ্ধটির হাত-পা ধোওয়ার জন্যে জল দিয়ে খাবার দেওয়ার জন্যে পাত পাতলেন। কিন্তু দেখতে পেলেন, তখন শুধু ভাতই রান্না হ'য়েছে অন্য তরকারী কিছু তৈরী হয়নি। কাজেই পুণিদবতী তাঁকে ভাত বেড়ে দিলেন, আর তারপর তাঁর স্বামী যে দুটি সুমিষ্ট আম তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন তারই একটি ধরে দিলেন তিনি। বৃদ্ধটি এই সযত্ন পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করলেন। আহারান্তে পুণিদবতীকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন তিনি।

দুপুরে পরমদত্ত এলেন আহারের জন্যে। স্নানাদি ক'রে তিনি আহারে বসলেন। তাঁর নিষ্ঠাবতী পত্নী প্রথমে তাঁকে ভাত ও নানারকম তরকারী পরিবেশন ক'রে, সবশেষে পাতার উপর অবশিষ্ট আমটি রাখলেন। কিন্তু পরমদত্ত তো দুটি আমই পাঠিয়েছেন, তাই তিনি এই আমটি অত্যন্ত সুস্বাদু দেখে দ্বিতীয় আমটিও দিতে বললেন। একথা শুনে কিছুক্ষণের জন্যে পুণিদবতী স্তম্ভিত ও হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু স্বামীর আদেশ পালন করার জন্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁকে আম আনার জন্যে যেতেই হল। তারপর তিনি সর্ব-প্রাণমন দিয়ে শিবের কাছে মিনতি জানালেন, একটি আম যেন তাঁকে বর দেওয়া হয়। আর কী আশ্চর্য, সত্যিই তাঁর হাতে একটি অতি উৎকৃষ্ট জাতের আম এসে গেল। আনন্দিত মনে ফিরে এসে তিনি এই আমটি নীরবে তাঁর স্বামীর পাতে দিলেন। কিন্তু এ আমটির আস্বাদ গ্রহণ ক'রে পরমদত্ত বললেন যে, তিনি যে আম পাঠিয়েছিলেন এটি সে আম হতে পারে না। তারপর তিনি সোজাসুজি পুণিদবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এ আম পেয়েছেন তিনি।

পুণিদবতী এবার এক মহাসমস্যায় পড়লেন, সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল তাঁর। একদিকে, ভক্ত হিসাবে ঈশ্বরানুগ্রহের গোপন তথ্যটি অন্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করা তাঁর অন্যায় হবে, এটা অনুভব করলেন তিনি। আবার অন্যদিকে, পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে স্বামী যা আদেশ করছেন তা মেনে প্রার্থিত সংবাদটি তাঁকে জানানোও সমানই প্রয়োজনীয়। অবশেষে তিনি স্থির করলেন, প্রকৃত ঘটনাটি স্বামীকে জানানোই তাঁর অধিকতর কর্তব্য। তখন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ

ক'রে তিনি আসলে যা যা ঘটেছিল তা সবই অকপটে জানালেন। পরমদত্ত শুনে একেবারে হতচকিত হ'য়ে গেলেন, এবং বললেন, সত্যিই যদি ফলটি শিব-প্রেরিত হ'য়ে থাকে, তবে পুণিদবতী আরো একটি এইরকম ফল শিবের কাছ থেকে প্রার্থনা করে নিয়ে আসুন। শিবের কাছে আরো ফল চাওয়া ছাড়া পুণিদবতীর আর কোনো উপায় রইল না। কারণ তা না হলে তাঁর স্বামী ভাবতে পারেন তিনি মিথ্যা কথা বলেছেন। তিনি স্বামীর সামনে থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে আবার মিনতি জানালেন। এবারো তিনি আরেকটি আম পেলেন এবং বিস্মিত স্বামীর হাতে তুলে দিলেন ফলটি। কিন্তু যেই তাঁর স্বামী ফলটি হাতে নিয়েছেন অমনি অদৃশ্য হ'য়ে গেল সেটি।

পরমদত্ত হতভম্ব হ'য়ে গেলেন এবং ভয়ও পেলেন। অবশেষে তিনি অনুমান করলেন তাঁর স্ত্রী সামান্যা নারী নন, ঈশ্বরেরই অবতার। কাজেই এরকম স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই শ্রেয়। তাই, যদিও তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একই গৃহে বাস করতে লাগলেন, তাঁর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর রাখলেন না। এবং কী করে কারইক্কাল ত্যাগ করা যায়, তারই উপায় খুঁজতে লাগলেন।

প্রাচীন তামিলনাদে অনেক বণিকই পণ্যদ্রব্য বোঝাই বাণিজ্যপোত নিয়ে সমুদ্রে যাতায়াত করতেন। পরমদত্তও এইরকম কয়েকটি জাহাজ তৈরী করিয়ে পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিদেশ যাত্রা করলেন। তারপর অনেক ধনসম্পদ আহরণ করে তিনি কারইক্কাল বা নাগপত্তিনমে না ফিরে নিজের দেশ তামিলনাদে ফিরে এলেন।

পান্ড্য রাজাদের প্রসিদ্ধ রাজধানী মাদুরাইয়ে ফিরে তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করলেন। কিন্তু পুণিদবতীর স্বামী হিসাবে তাঁর পরিচয় তিনি গোপন রাখলেন। এবং শুধু তাই নয়, তিনি স্ত্রী বা তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে মাদুরাইয়ের এক কুমারীকে বিবাহও করলেন। কালক্রমে এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল। পরমদত্ত কিন্তু তখনও তাঁর প্রথমা স্ত্রী পুণিদবতীকে দেবী হিসাবে প্রতিদিন পূজা করতেন। তাই এই কন্যাটির নামও তিনি রাখলেন পুণিদবতী। ওদিকে আসল পুণিদবতী এসব ঘটনা কিছুই জানতে পারলেন না, এবং আদর্শ হিন্দু নারীর মতো স্বামীর অবর্তমানে—গৃহকর্মের কর্তব্য পালন করতে লাগলেন।

কালক্রমে পুণিদবতীর আত্মীয় স্বজনেরা সংবাদ পেলেন যে পরমদত্ত মাদুরাইয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। সংবাদটির বিষয়ে তাঁরা প্রথমে স্থির-নিশ্চয় হলেন। তারপর এক সুসজ্জিত পালকীতে পুণিদবতীকে বসিয়ে তাঁরা বহুদূরে অবস্থিত মাদুরাইয়ে এলেন, এবং পরমদত্তকে তাঁদের আসার সংবাদ

পাঠালেন। সংবাদটি পেয়ে প্রথমে পরমদত্ত খুবেই বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন, তারপর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং শিশুকন্যাটিকে নিয়ে বিস্মিত পুণিদবতীর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত জানালেন। তিনি বলতে লাগলেন, "তোমারই কৃপায় আমি এখানে বাস করছি, আর এই শিশুটিকেও তোমারই নাম দিয়ে আমি ধন্য হয়েছি।" আতঙ্কে কম্পিত-কলেবর হ'য়ে পুণিদবতী দূরে সরে গেলেন। আত্মীয়রা জিজ্ঞাসা করলেন, স্ত্রীকে প্রণাম করার মতো এই অস্বাভাবিক কাজ-করার অর্থ কি? তখন পরমদত্ত দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন, "দেবী পুণিদবতী সামান্য মানুষ নন, পরমকারুণিক ঈশ্বরেরই অবতার। এই সত্য জানতে পেরেই আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি। আর আমার কন্যাটির নামও আমি তাঁরই নামানুসারে রেখেছি। সেইজন্যেই আমি তাঁর পায়ে প্রণাম জানিয়েছি। আপনাদেরও তাই করা উচিত।"

আত্মীয়েরা এসব ব্যাপার দেখে শুনে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বামীর কথা শুনে পুণিদবতী ভগবান্ শিবের ধ্যান ক'রে পরম আবেগভরে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, "হে পরম প্রভু, লোকটির ব্যবহার কী রকম তাতো তুমি দেখলে! তাই আমি মিনতি করছি, এই শরীরের রক্তমাংসের যে সৌন্দর্য ঐ লোকটির জন্যেই এতদিন ছিল তা তুমি আমার এই নশ্বর দেহ থেকে সরিয়ে নাও, আর তোমার চারিদিকে যে ডাকিনীযোগিনীরা পরম ভক্তিভরে নৃত্য করে, আমাকে দাও তাদেরই দেহ।" তারপর সেখানে দাঁড়িয়েই ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব করতে লাগলেন। আর, কী আশ্চর্য, তাঁর যে দেহের ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তকরণের সৌন্দর্য বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল, তা ঝরে গেল, এবং তিনি মানুষের দৃষ্টিতে পীড়াদায়ক অস্থিচর্মসার যোগিনীর দেহ ধারণ করলেন। স্বর্গ থেকে দেবতারা পারিজাত বৃষ্টি করতে লাগলেন তাঁর মাথায়, আর আশ্চর্য দিব্য-রাগিণীতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গেল সারা পৃথিবী। দেবতারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। কিন্তু উপস্থিত আত্মীয়গণ পুণিদবতীর এই রূপান্তরে ভীত হ'য়ে উঠলেন, এবং তাঁকে প্রণাম জানিয়ে স্থানত্যাগ করলেন।

কারইক্কাল অম্মইয়ার এরপর নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর এই যোগিনীদেহকে একান্ত আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে ভগবান শিবের স্তবগান করতে লাগলেন। এই অবস্থায় তিনি তামিল ভাষায় একশত একটি শ্লোক রচনা করেন। এগুলি 'অর্পুদ তিরুবন্তাদি' নামে খ্যাত। তাছাড়া কুড়িটি শ্লোকের আরো একটি স্তবমালা রচনা করেছিলেন তিনি। সেগুলি "তিরু ইরট্টই মণিমালই" নামে পরিচিত।

পুণিদবতীর নশ্বর দেহের এই রূপান্তর একটি রূপকের মতো পার্থিব জীবনের সঙ্গে তাঁর বন্ধনমুক্তিরও ইঙ্গিত দেয়। কৈলাসশিখরে পূর্ণজ্যোতিতে আসীন ভগবান শিবের দর্শন পাওয়ার উদগ্র বাসনায় আপ্লুত হ'য়ে গেলেন তিনি। কৈলাসের পথে তীর্থযাত্রা ক'রে ক্রমাগত উত্তরের দিকে চলতে লাগলেন তিনি। পথের লোকেরা তাঁকে দেখে সভয়ে পথ ছেড়ে দিতে লাগল। এই দেখে তিনি আত্মগতভাবে বলতে শুরু করলেন, "কী আমার আসে যায় যদি বিশ্বের অজ্ঞান-মনা লোকেরা আমাকে দেখে দূরে সরে যায়। যে দেবাদিদেবের চরণে আমি আত্মনিবেদন করেছি, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন তাহলেই আমি ধন্য!"

কী একটা দুর্বোধ্য ধারনা মনের মধ্যে বাসা বাঁধল অম্মইয়ারের যে, তিনি মনে করলেন পায়ে হে'টে কৈলাস পর্বতে আরোহণ করা তাঁর পক্ষে সঙ্গত হবে না। বরং মাথা নিচের দিকে করেই তাঁর যাওয়া উচিত। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি এ প্রবাদের এই ব্যাখ্যা করেন যে, অম্মাইয়ার সাধারণের আচরিত জীবনের বিপরীত পথ গ্রহণ করেছিলেন, তাই বোঝানোই হল এর উদ্দেশ্য। অন্যেরা মনে করেন, এ ব্যাপার হয়তো আক্ষরিক ভাবেই সত্য। কেননা, ঈশ্বরের চরণে যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন এবং যাঁদের দেহ-মন-আত্মা নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তাতেই নিমগ্ন, তাঁদের পক্ষে সবই সম্ভব। এ ব্যাপারের মধ্যে সত্য যাই ঘটে থাক, অম্মইয়ার শিবের আবাসস্থল কৈলাসধামে যে পে'ৗছেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাপসী অম্মইয়ার যখন যোগিনীর মতো ভৌতিক দেহে মাথার উপর ভর দিয়ে হে'টে আসছিলেন তখন তাঁকে দেখে শিবপ্রিয়া উমা বলে উঠেছিলেন, "প্রভু, ঐ কঙ্কালসার দেহে তোমার প্রতি কী অপূর্ব ভালোবাসাই না প্রকাশিত হ'য়েছে!" তখন দেবাদিদেব বললেন, "উমা! স্থির জানবে, যিনি আমাদের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছেন তিনি আমার জননী। তাঁর প্রার্থনা অনুসারে আমিই তাঁকে এই যোগিনীর দেহ দিয়েছি।" যখন অম্মইয়ার তাঁর নিকটস্থ হলেন, তখন ভগবান শিব তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করলেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অম্মইয়ার তাঁকে 'পিতা' বলে সম্মোধন করে চরণে প্রণিপাত করলেন। ভগবান শিব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী বর তিনি প্রার্থনা করেন। তাঁর উত্তর কবি নেয়াক্কিঝার এইভাবে তাঁর কাব্যে রূপায়িত করেছেন—

"প্রথমে অম্মইয়ার চাইলেন ঈশ্বরের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসার শান্তি। তার পর প্রার্থনা জানালেন, 'প্রভু জন্মগ্রহণের বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। কিন্তু এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় যে আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করি, আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমাকে কখনো বিস্মৃত না হই। আরো একটি বর দাও প্রভু, তুমি ধর্মের ঈশ্বর,

এই কর যে, তুমি যখন বিশ্বনৃত্যে মগ্ন থাকবে, আমি তা যেন তোমার চরণের কাছে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।”

প্রভু শিব তখন তাঁকে বললেন যে, অম্মইয়ার পরম শান্তিতে তাঁর এই শাশ্বত-নৃত্য তিরুবালঙ্গাড়ুতেই[১] প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আর সেখানেই যেন তিনি শিবমহিমা গান করেন। অম্মইয়ার পরম চরিতার্থ ও অনুগৃহীত বলে মনে করলেন নিজেকে। তিনি কৈলাস পর্বত থেকে দক্ষিণের তামিলনাদে ফিরে এলেন, এবং সোজা তিরুবালঙ্গাড়ুতে এসে মাথায় হেঁটে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এখনো তিনি হয়তো সেখানেই আছেন, আর নটরাজরূপী শিবের শাশ্বত বিশ্বনৃত্য প্রত্যক্ষ করছেন। যাই হোক, এই পবিত্র মন্দিরে এসে শিবনৃত্য দর্শন করে তাপসী অম্মইয়ার নৃত্যের বন্দনায় এগারোটি ক'রে শ্লোকের দুটি স্তবমালা রচনা করেন।

উপরের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় অম্মইয়ারের স্বামী শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে অথবা আত্মোৎকর্ষের গুণে তাঁর স্ত্রীর মতো এতো অগ্রসর ছিলেন না। জীবনীকার যখন সরল মনে স্বামীটিকে একটি বলশালী ষণ্ড এবং স্ত্রীকে সুন্দর ময়ূরের সঙ্গে তুলনা করেছেন তখনই এটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ময়ূরটি আবার নিজের ইচ্ছায় তার কলাপের সৌন্দর্য প্রকাশিত করতে পারে এবং সংবৃত করতে পারে, এতোই তার আত্মসংযম। তা সত্ত্বেও অম্মইয়ার পতিপ্রাণা অনুগত স্ত্রীর মতো সশ্রদ্ধ চিত্তে স্বামীর সেবা করেছিলেন। আর এটাও সুস্পষ্ট যে অম্মইয়ার এমন একজন সুশিক্ষিতা নারী ছিলেন, যাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তিময় শ্লোকগুলি তামিলনাদের শৈব-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তপস্বী সম্বন্ধ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত কতো তপস্বীই না তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আর যে শিবমন্দিরগুলিতে তেষট্টিজন নায়নমারের প্রতিমূর্তি রক্ষিত হ'য়েছে, সেখানেই আমরা আজও তাঁর মূর্তি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

তাপসী অম্মইয়ারের 'অর্পুদ তিরুবন্তাদি' গ্রন্থ থেকে উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি শ্লোক নিচে অনুবাদ করে দেওয়া হল,—

১। যে প্রভু অগ্নিশিখা হস্তে নৃত্য করেন এবং যিনি অস্থিমালা শোভিত, তিনি যদি আমার যন্ত্রণা দূর না করেন, করুণা না করেন এবং যদি আমার পথনির্দেশও না করেন, আমার অন্তর তবু তাঁর প্রতি প্রেমে অবিচল থাকবে।

---

১ এই মন্দিরটি তিরুবালঙ্গাড়ু নামে রেল-স্টেশনের পশ্চিমদিকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানটি মাদ্রাজ থেকে আর্কোনাম যেতে সাঁইত্রিশ মাইল দূরে পড়ে।

২। কেউ হয়ত বলবে, ঈশ্বর বহু উর্ধ্বে স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত আছেন; আবার অন্য কেউ হয়ত বলবে, তিনি দেবতাগণের অধিপতিরূপে আসীন। কিন্তু আমি বলব, সেই পরম জ্ঞানের নীলকণ্ঠ আমারই হৃদয়ে চিরজাগ্রত।

৩। একমাত্র আমিই তপের ফল আহরণ করেছি; আমারই হৃদয় সৎ; আমিই শুধু জন্মমৃত্যুর বন্ধন কাটাতে বদ্ধপরিকর; কেননা কেবল আমিই সেই গজচর্ম পরিহিত ভস্মাচ্ছাদিত ত্রিলোচন প্রভুর সেবিকা হ'তে সক্ষম হ'য়েছি।

৪। ঈশ্বরেরই করুণায় এই বিশ্বসংসার নিয়ন্ত্রিত। সেই করুণাই আত্মার বন্ধন-মুক্তি ঘটায়, তাই, ঈশ্বরের করুণাময় দৃষ্টির ভিতর দিয়ে পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করাই যেহেতু আমার জীবনের মূলমন্ত্র, সেই কারণে সমস্ত কিছুই আমার আয়ত্তের মধ্যে।

৫। শুধু একটি বিষয়েই আমি সর্বদা অনুধ্যান করি; একটি কর্মই আমি নিষ্পন্ন করতে চাই; একটিই কেবল আমার অন্তরের কামনা; তা হল এই যে, আমি যেন আমার প্রভুর সেবিকা হ'তে পারি। আমার সেই প্রভু জটাজুটমণ্ডিত মাথায় গঙ্গাকে ধারণ ক'রে আছেন, আর তারই উপর অঙ্কিত আছে চন্দ্রকলার টিকা। হাতে তাঁর অনির্বাণ অগ্নিশিখা।

৬। আমি কি তাঁকে হর বলবো, না ব্রহ্মা বলব, অথবা তারও অতীত অন্য কিছু? কী যে তাঁর স্বরূপ, আমি জানি না।

৭। একমাত্র তিনিই জ্ঞাতা। একমাত্র তিনিই মন্ত্রদাতা। জ্ঞানরূপে তিনি সর্বকিছুই জানেন। পরমসত্তারূপে তাঁকে জানাই আমাদের লক্ষ্য। একাধারে তিনি তেজ, ক্ষিতি ও মহাব্যোম।

৮। তাঁর প্রকৃত সত্তা যাদের বুদ্ধির অগম্য তারাই তাঁকে নিয়ে পরিহাস করে। তারা শুধু দেখে ঐ পরম সুন্দর দেহ ভস্মবিভূতিতে আচ্ছাদিত আর প্রেতের মতো অস্থিমালায় শোভিত।

৯। গ্রন্থকীট পণ্ডিতেরা কূটতর্কে রত হোক, শাস্ত্রের নির্দেশের অন্তরালে পরমসত্যকে আবিষ্কারের দৃষ্টি থেকে তারা চিরবঞ্চিত। ধ্যানের মধ্যে যে আকারে বা যে রূপে তাঁকে তাঁর ভক্তেরা অন্বেষণ করেন, সেই মূর্তিতেই নীল-কণ্ঠ নিজেকে প্রকাশ করেন।

১০। হে পিতঃ, এই আমার অন্তহীন সুতীব্র কামনা, তোমার সেই রূপ কি তুমি আমার কাছে প্রকাশিত করবে না কোন দিন? সংহারের মহাঘোর রাত্রিতে অগ্নিশিখা হাতে নিয়ে সেই রূপেই নৃত্য কর তুমি!

১১। তোমার চরণপাতে পাতাল কম্পিত হ'য়ে ওঠে। তুমি মাথা তুললে

আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যায়। অলঙ্কারশোভিত তোমার হাতের মুদ্রায় দশদিক শিহরিত হ'তে থাকে। এ বিশ্বের পাদপীঠ তোমার নৃত্যের বেগ ধারণ ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

১২। মৃত্যুকে আমরা জয় করেছি, আর নরককেও আমরা অতিক্রম করেছি। সদসদ্ কর্মের বন্ধনকে উৎপাটিত করেছি আমরা। কিন্তু এ সবই সম্ভব হ'য়েছে তাঁর, কারণ ত্রিপুরাসুরের দুর্গাকে যিনি নয়নবহ্নিতে ভস্মস্তূপে পরিণত করেছেন, সেই প্রভুর পবিত্র চরণে নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে পেরেছি আমরা।

চতুর্থ অধ্যায়

আণ্ডাল

হে তুলসীজন্মা তাপসী, হে দেবপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী।
তুমি মূর্তিমতী করুণা, তুমি ভক্তির প্রতিমাস্বরূপিনী॥

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসবিখ্যাত মাদুরাই নগরী প্রাচীনকাল থেকেই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই নগরীর পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীবৈষ্ণব ভক্তদের স্মৃতি সঞ্জীবিত শ্রীবিল্লিপুত্তুর শহরটি অবস্থিত। শ্রীবিল্লিপুত্তুর কথাটির অর্থ, 'বিল্লির' নতুন শহর। বিল্লি এবং কান্তন নামে দুইজন ব্যাধ-সর্দার এই শহরটির পত্তন করেন। এই স্থানের পার্শ্ববর্তী গভীর ও বিপদসঙ্কুল অরণ্যকে উচ্ছেদ ক'রে পত্তন করা হ'য়েছিল শহরটির। দেবতার আদেশ অনুসারে, বন্য জন্তু ও বিষধর সর্পসঙ্কুল, এই বন ক্রমে দুজন শ্রীবৈষ্ণবপন্থী তপস্বী তাঁদের ভক্তদের জন্যে এক সুন্দর নগরীতে রূপান্তরিত করে নেন। বাস্তব জগতের এই পরিবর্তন যেন পরবর্তী কালের আধ্যাত্মিক ভাব-বিপ্লবের ভূমিকা, অথবা প্রতীকের মতো। প্রেম ধর্মের চির অধিশ্বরী আণ্ডালই এই ভাববিপ্লব এনেছিলেন পৃথিবীতে। আর তিনিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পিত ভক্তগণই ভগবদ্ প্রেমের দৃষ্টান্তস্থল। কারণ তাঁরা সর্বদাই ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য অনুভব করেন। শ্রীবৈষ্ণবধর্মে তাঁদের বলা হয় 'অঝ্ওয়ার'। এই তামিল শব্দটির অর্থ হল, 'যিনি ঈশ্বরের অন্তহীন করুণা-সমুদ্রে আত্মসমর্পণ করেছেন।' এরই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ হল 'আণ্ডাল', অর্থাৎ 'যে নারী ভগবদ্প্রেমের মহাসমুদ্রে আত্মসমর্পণ করেছেন।' যেহেতু এই গণ-বাচক উপাধিটি কেবলমাত্র একজন তাপসীর ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য হ'য়েছে, এবং 'আঝ্ওয়ার'—নামে তপস্বী আছেন এগারোজন, সেজন্যে এই দেবোপমা ব্রহ্মচারিণীর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পরিমাণ আর ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হয় না। ঈশ্বর-প্রেমের মহাকাশে তিনি মরমীয়া সাধনার চিরদয়িতার মতো নক্ষত্রালোকিত।

অন্যান্য মহাতপস্বীর মতোই এ বিশ্বমঞ্চে আণ্ডালের প্রবেশ ও প্রস্থানের ইতিহাস চিররহস্যাবৃত। তা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব যে ঐতিহাসিক সত্য সে বিষয়ে

সন্দেহ নেই। এবং সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি শ্রীবিল্লিপত্তুরের পেরিআঝ্‌ওয়ারকে তাঁর পিতা বলে ঘোষণা করেছেন। লোকশ্রুতি পরম্পরায় জানা যায়, জনক রাজা যেমন সীতাকে পেয়েছিলেন, তেমনি তপস্বী পেরিআঝ্‌ওয়ার একদিন তাঁর তুলসী বাগানের পরিচর্যা করতে করতে রহস্যজনকভাবে তুলসী গাছের নীচেই একটি শিশুকন্যাকে দেখতে পেয়েছিলেন। সন্তানহীন পেরিআঝ্‌ওয়ার কন্যাটিকে দৈবানুগ্রহে প্রাপ্ত ব'লে মনে করেছিলেন, এবং সযত্নে তাকে গ্রহণ ক'রে নাম রেখেছিলেন 'গোদা', অর্থাৎ 'মাতা বসুমতীর কন্যা'। কৃপণ যেমন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে, তিনিও তেমনি বালিকাটির গুণের মূল্য বুঝেছিলেন। অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাকে লালন-পালন ক'রে সেকালের শ্রীবৈষ্ণব ধর্মের অনুমোদিত শুদ্ধিক্রিয়ার পর তিনি কালক্রমে এই বালিকাটিকে বয়সোচিত অধ্যাত্ম-উপদেশে দীক্ষিত ক'রে তুলেছিলেন।

সর্বদা বিষ্ণু চিন্তায় বিভোর থাকতেন ব'লে পেরিআঝ্‌ওয়ারকে প্রথম বয়সে 'বিষ্ণুচিত্ত' বলে ডাকা হত। তিনি আত্মচেতনা বিসর্জন দিয়ে প্রভুর কর্মে আত্ম-নিবেদিত ভৃত্যের মত ঈশ্বরের প্রীতিসাধনের জন্যে তৎপর থাকতেন।

ফুল বাগানের পরিচর্যা ক'রে সেই ফুলে সযত্নে গাঁথা মালায় স্থানীয় দেববিগ্রহকে সকালে-সন্ধ্যায় সজ্জিত করাই ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহের ব্যাপার। তাঁর দৃষ্টিতে ঐ দেববিগ্রহটি ছিল ঈশ্বরের অপার করুণার মূর্তিময় প্রতিভূ। যেন, এই মাটির পৃথিবীতে ভক্তগণ যা'তে ঈশ্বরের আনন্দময় আসঙ্গ লাভ করতে পারে, সেই জন্যেই তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে অসীম থেকে সীমার মধ্যে স্বতঃপ্রকাশ করে রেখেছেন। এই বোধ পেরিআঝ্‌ওয়ারের মনে বিকাশলাভ করার পর আজন্ম নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধর্মের বাণী প্রচার করার জন্যে অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রের জ্ঞান ও তর্কশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য দেখা দিল। একবার তিনি ঈশ্বরের অপার সৌন্দর্যকে এই নশ্বর চক্ষুতেই দর্শন লাভের সৌভাগ্য লাভ করেন, এবং ভগবদ্‌ প্রেমে আপ্লুত অবস্থায় তামিল ভাষায় ঈশ্বরের শাশ্বত সৌন্দর্যের মহিমায় স্তব-রচনা করেন। এরপর তাঁর ঈশ্বরানুরাগ এক নতুন পথে প্রবাহিত হয়। বৃন্দাবনের মা যশোদার মতো শিশু কৃষ্ণের প্রতি গভীর ও অন্তহীন বাৎসল্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন তিনি। পরবর্তী সমগ্র জীবন যেন মনেপ্রাণে তিনি ব্রজবালক ও গোপিনীর সঙ্গে বৃন্দাবনেই বাস করতে লাগলেন এবং কৃষ্ণলীলার অধ্যাত্ম-অনুভূতিতে নিমগ্ন হ'য়ে রইলেন।

এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, এই রকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি সম্পন্ন পিতার

কন্যা হ'য়ে আণ্ডালের জন্মগত অধ্যাত্ম গুণাবলী অল্প বয়সেই দ্রুত বিকশিত হ'য়ে উঠবে। তুলসীপাতার সুগন্ধের মতো আণ্ডাল হৃদয়ে প্রেম নিয়েই জন্মেছিলেন, এবং তিনি বেড়েও উঠেছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে পরিপূর্ণ আবহাওয়ায়। দাম্পত্য-প্রেমের সূক্ষ্ম ও কোমল রূপ-পরিবর্তনের অনুভূতি সম্পন্ন তাঁর পবিত্র নারী-হৃদয় অতি সহজেই গোপিনীর মত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অধ্যাত্ম-বিবাহের আদর্শে সাড়া দিল। শৈশবকাল থেকেই বৃন্দাবনের মদনমোহনের দয়িতা হিসাবে নিজেকে মনে করতেন তিনি; সেই মদনমোহনের প্রেম ও মহিমার অনুধ্যানে আনন্দলাভ করতেন। একদিন ঈশ্বরের দয়িতারূপে নিজের যোগ্যতা নিরূপণের জন্যে তাঁর পিতা বিগ্রহের জন্যে যে মালা গেঁথে রেখেছিলেন, অত্যন্ত গোপনে তাই দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করলেন তিনি। তারপর দর্পণে নিজেকে দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন মালাগুলি। এরপর থেকে প্রতিদিনই তিনি গোপনে এই খেলা খেলতে লাগলেন, আর তাঁর পিতা নিজের অজ্ঞাতে এই ব্যবহার-উচ্ছিষ্ট মালাগুলি ঈশ্বরকে নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু একদিন পেরিআঝ্ওয়ার তাঁকে মালা পরিহিত অবস্থায় দেখে ফেললেন এবং এই অভক্তজনোচিত হীন কার্যের জন্যে তিরস্কার করে ভবিষ্যতে এ রকম করতে নিষেধ করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় এই ব্যবহৃত মালাগুলি তিনি ঈশ্বরকে নিবেদন করবেন কিনা তা স্থির করতে পারলেন না। কিন্তু রাত্রে ঈশ্বর তাঁকে স্বপ্নের মধ্যে দর্শন দিয়ে জানালেন যে, এর পর থেকে যেন আণ্ডালের পবিত্র প্রেমময়ী দেহের সংস্পর্শে সুরভিত মালাগুলিই কেবল তাঁকে নিবেদন করা হয়। পরদিন সকালে পেরিআঝ্ওয়ার কন্যাকে ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়ে বিগ্রহকে নিবেদন করার আগে মালাগুলি তাঁকে দেহে ধারণ করতে বললেন। এবং কন্যাকে বিশ্বপালিকা জগন্মাতার অবতার বলে চিনতে পেরে তিনি তাঁর নামকরণ করলেন—'আণ্ডাল'।

বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডালের জ্ঞান ও অনুরাগও বৃদ্ধি পেতে লাগল। পরিশেষে তাঁর মনে ঈশ্বরকে বিবাহ করার অদম্য আবেগ জন্মলাভ করল। দয়িতের কাছ থেকে বিরহের যন্ত্রণা এবং প্রতিদানহীন এই প্রেমের বেদনা সহ্য করতে না পেরে তিনি বৃন্দাবনের প্রণয়াহত গোপিনীদের অবলম্বিত পন্থা অনুসরণ করলেন। কল্পনার ঐশ্বর্যে তিনি নিজের মনে বৃন্দাবনের সুরম্য বনরাজি এবং মধুসলিলা যমুনা নদী রচনা করে নিলেন। নিজেকে কৃষ্ণের কামনায় প্রতীক্ষিত গোপিনী কল্পনা করে তিনি পুণ্যদায়ী মাঘ মাসের ঊষাকালে স্নান ও প্রসাধন সেরে সেইখানে উপস্থিত হতেন। তাঁর ব্রত ছিল এই যে "নিজের সঙ্গিনীদের সঙ্গে শোভাযাত্রা ক'রে নিদ্রিত মদনমোহনকে ঘুম থেকে

জাগিয়ে 'পরই'[১] বাজানোর আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন।" তারপর কৃষ্ণ ঘুম থেকে উঠে সভাগৃহে এসে নিজের আসনে বসে তাঁদের আবেদন কী তা জানতে চাইবেন। কিন্তু দলের অধিনেত্রী আণ্ডাল পার্থিব কিছুই প্রার্থনা করবেন না। তিনি শুধু চাইবেন কৃষ্ণের জন্যে সেবার অধিকার, কৃষ্ণকে ভালোবাসার অধিকার। কারণ চিরদিনের জন্যেই তো তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। এই সমগ্র দৃশ্যটিই তাঁর 'তিরুপ্পারই' নামে তিরিশটি স্তবকের এক অবিস্মরণীয় স্তোত্রে ছন্দায়িত হ'য়েছে। 'তিরুপ্পারই' কথাটির অর্থ হল 'স্বর্গীয় সঙ্গীত', এবং এতে কবিত্ব, দর্শন ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। এই সঙ্গীতটি প্রত্যেক বৈষ্ণব মন্দিরেই প্রতিদিন গাওয়া হ'য়ে থাকে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অধ্যাত্মমিলনের দৈব-উন্মাদনা, তাঁর কল্পনার উন্মেষ থেকে গভীরতর ব্যাপ্তির পরিণতি পর্যন্ত স্তরে স্তরে রূপায়িত হ'য়েছে আণ্ডালের 'তিরুমোঝি' নামে একখানি কাব্যে। নামটির অর্থ হল 'পুণ্যবাণী'। এখানি আত্মজীবনীমূলক রচনা এবং আকারেও বেশ বড়। এখানে দেখা যায় তাঁর গভীর কান্তা-প্রেমের নানা ভাবতরঙ্গের অকপট ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। তাঁর আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, তাঁর শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষায় প্রেমের দেবতা মদনের কাছে বর প্রার্থনা; তাঁর আত্মবিশ্বাস ও জয়; তাঁর গভীর মর্মবেদনা; তাঁর স্বপ্নের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে বিবাহে সুতীব্র আনন্দ-শিহরণ; তাঁর বিশ্ববিলোপী প্রেম ও অতল নৈরাশ্য; তাঁর পাষাণহৃদয়-গলানো প্রেমের বার্তা; তাঁর প্রেমিকের দিক থেকে চরম উদাসীন্যে কুণ্ঠিত অনুযোগ; তাঁর আত্মীয়গণের অসহযোগিতায় প্রিয়তমের চরম সান্নিধ্যে যেতে না পারার ক্ষোভ; এবং পরিশেষে আছে তাঁর সর্বদেহে জ্বালার অনুভূতি, যা কৃষ্ণদেহে ব্যবহৃত দ্রব্যের সংস্পর্শেই কেবল উপশমিত হ'তে পারে।

ঈশ্বরের প্রতি আণ্ডালের পবিত্র প্রেমের দ্রুত পরিণতি সত্ত্বেও, তাঁর বিবাহ-যোগ্য বয়সের কথা তাঁর তপস্বী পিতারও উদ্বেগের কারণ হ'য়ে উঠেছিল। বিশেষ করে নিঃসন্তান গৃহের এই কন্যারত্নের জন্যে যোগ্য পাত্র সংগ্রহ করাই ছিল সমস্যা। একদিন কন্যার মনোভাব জানার জন্যে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, কাকে বিবাহ করতে চাও তুমি?" আণ্ডাল দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "আমি যদি শুনি একজন নশ্বর মানুষকে বিবাহ করতে হবে, তা হলে প্রাণধারণ করাই আমার

১ 'পরই' এক ধরনের মৃদঙ্গ, যা বাজিয়ে দেববিগ্রহকে ঘুম থেকে জাগানো হয়। এখানে আণ্ডাল 'পরই' বাজিয়ে কৃষ্ণকে ঘুম থেকে জাগানোর অধিকার সৌভাগ্য বলে মনে করছেন।

পক্ষে কঠিন হ'য়ে দাঁড়াবে।" পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তাহলে কী করব এখন?" আণ্ডাল উত্তর দিলেন, "আমি শুধু শ্রীকৃষ্ণকেই বিবাহ করতে চাই।" তখন পেরিআঝ্‌ওয়ার শ্রীকৃষ্ণের নানা রূপের মাহাত্ম্য বর্ণনা ক'রে কন্যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গম শহরের শ্রীরঙ্গনাথমের প্রতিই কন্যার পক্ষপাত যেন কিছু বেশী। কারণ দেখা গেল, এই বিগ্রহটির মাহাত্ম্যের উল্লেখ মাত্রেই আণ্ডালের কুমারী হৃদয় সংযমের বাঁধ ভেঙে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। আর এরপর থেকে আণ্ডাল শ্রীরঙ্গনাথমের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার স্বপ্নবিলাসেই মগ্ন হ'য়ে রইলেন।

কিন্তু পেরিআঝ্‌ওয়ারের মন আবার সন্দেহ দোলায় চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কারণ ঈশ্বরের বিরল করুণা ছাড়া এ-ধরনের অবিশ্বাস্য বিবাহ ঘটা প্রায় অসম্ভব। যাই হোক্, একদিন রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে আণ্ডালের নির্বাচিত স্বামী শ্রীরঙ্গনাথম্ পেরিআঝও্য়ারকে নির্দেশ দিলেন যে, আণ্ডালকে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে দয়িতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। এই নির্দেশানুসারে পেরিআঝ্‌ওয়ার নিজের ভক্তদের সঙ্গে আণ্ডালকে নিয়ে শ্রীরঙ্গনাথমের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সেখানে বিগ্রহটির দর্শনমাত্রই আণ্ডাল অনুভব করলেন তাঁর দেহমনপ্রাণ যেন কী এক প্রবল আকর্ষণে উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে। তিনি ধীর চরণে দেবমূর্তিটির দিকে অগ্রসর হ'য়ে পাশাপাশি স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন। আর, কী আশ্চর্য, সকলকে বিস্ময় ও ক্ষোভে অভিভূত ক'রে তিনি সর্বচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন। অচিরেই এক মধুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময়াহত পেরিআঝ্‌ওয়ার সম্বিত ফিরে দৈববাণী শুনতে পেলেন, "তুমি আজ থেকে আমার শ্বশুর হলে। আণ্ডালের মূর্তি আমার পাশে রেখে তুমি নিজের গৃহে প্রত্যহ আমার পূজা করো, এবং যথারীতি প্রেমভরে মালা দিও আমাকে।" এরপর দুঃখভার-পীড়িত পেরিআঝ্‌ওয়ার শূন্য মনে বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে নিজের আবাসকে একটি আশ্রমে রূপান্তরিত ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরঙ্গনাথম্ ও আণ্ডালের সেবা করতে লাগলেন।

এইভাবে কবি-তাপসী আণ্ডালের নশ্বর-লীলার অবসান ঘটল। তাঁর নাম আজ দক্ষিণ ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত। বিশেষ ক'রে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বটেই। ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের পথটি পুনঃ প্রচার করার জন্যেই তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। এর সূত্রপাত ঘটে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেমোন্মাদনার অধীরতায়। তিনি ঐ অহঙ্কারী মনচোর কৃষ্ণকে প্রথমে

নিজের অঙ্গ সুবাসে সমৃদ্ধ মালা দিয়ে বন্দী করেছিলেন। আর তারপর সেই বন্ধনকেই দৃঢ়তর করেছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় স্তবমালায়। প্রেমই ছিল তাঁর অন্নজল, প্রেমই ছিল তাঁর তাম্বুল। অর্থাৎ নিছক শরীর রক্ষা বা বিলাস সবই ছিল তাঁর প্রেমময়। দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর এই ত্রুটিহীন ঈশ্বর-প্রেম গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে মহত্তর হ'তে থাকে। তারপর যে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি এই দেহ, সেই ঈশ্বরের মধ্যেই তিনি দেহকে অতিক্রম ক'রে প্রেমময় সত্তা রূপে বিলীন হ'য়ে যান। তাঁর কাব্যে উপনিষদকেই সারবস্তু বলে গ্রহণ করা হ'য়েছে। আর তাঁর জীবনও ছিল ঔপনিষদিক যুগের মতোই নিষ্পাপ। কেননা তাঁর কাব্যে কোথাও দিব্যজীবন লাভের আগের পর্যায়ে ঘটিত একটি অন্যায়েরও উল্লেখ নেই, একটুও অনুতাপ বা মর্মবেদনা নেই কোনো দুষ্কৃতির জন্যে। তাঁর স্বনির্বাচিত ঐ দেব-দয়িতের কাছে তাঁর আত্মনিবেদন এতই সুসম্পূর্ণ ছিল যে, সেখানে কোনো স্বার্থসিদ্ধি, ঈর্ষা বা কোনো মানবিক দুর্বলতা ও স্খালনের স্থান ছিল না। তিনি ছিলেন সাফোর মতোই প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ, এবং তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল কৃষ্ণপ্রেমের আবেগে সংহত একটি কবিতার মতো আদি-অন্তে সুসম্পূর্ণ। তাঁর রচিত কাব্যের নিম্নোদ্ধৃত এই অনুবাদগুলির মধ্যেও তাঁর সেই মরমী প্রেম-সাধনার আবেগদীপ্ত নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

১। ওগো গোকুলের সালংকারা যুবতীগণ! এখন জ্যোতির্ময় ধনুরাশি, রাত্রি রৌপ্যালোকে উজ্জ্বল। চল, সুস্নাত, পবিত্রদেহে চল আমরা যাই—সশস্ত্র নন্দ ও কোমলনয়না যশোদার পুত্র যেখানে নিদ্রিত। সেই নীলকান্তি দেহ, কমলাক্ষী কৃষ্ণের কেশদাম কখনো শান্ত, কখনো উদ্দাম শিখাময়। সেই নারায়ণ, তিনিই শুধু দিতে পারেন আমাদের বাঞ্ছিত আশীর্বাদ—'পরই' বাদনের অক্ষয় অধিকার![১]

২। হে প্রেমের দেবতা কন্দর্প, তোমার ক্ষমতা অসীম! আমি আমার এই অশুচিদেহে আলুলায়িত কুন্তলে ক্লান্ত নয়নে একাহার করে যে কঠোর ব্রত উদ্‌-যাপন করেছি তুমি তার মান রাখো—যাতে আমি নিতান্ত বেঁচে থাকতে পারি, সেজন্যে আমাকে তুমি এই বর দাও যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শের ক্ষমতা অর্জন করি।[২]

৩। ওগো কোকিল! কতোদিন ধরে আমার শরীরের অস্থিগুলি আড়ষ্ট হ'য়ে

---

১ তিরুপ্পাবই থেকে অনূদিত।

২ এই অংশ এবং পরবর্তী সমস্ত অংশই তিরুমোঝি থেকে অনূদিত।

আসছে, বিস্ফারিত দুই চোখের পাতা পড়ছে না। অন্তহীন দুঃখের সাগরে ডুবে গেছি আমি, কিন্তু তুমি তো জানো বিরহের যন্ত্রণা কী তীব্র। তুমি কী সেই আমার সোনার বরণ গরুড়াধিপতিকে ডেকে দিতে পার না?

৪। হে সুস্নিগ্ধ মেঘদল! আমার বর্ণকান্তি, অলংকার, মন ও নিদ্রা পরিত্যাগ করেছে আমাকে। আমার এই নিঃসঙ্গ বেদনায় ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছি আমি। স্নিগ্ধ নির্ঝর প্রবাহিত বেঙ্কটগিরির অধিপতি গোবিন্দের মহিমা কীর্তন ক'রে জীবন ধারণ করতে পারি না কি আমি?

৫। লজ্জায় আর এখন কী লাভ! সকলেই তো জানতে পেরেছে এখন। যদি অবিলম্বে আমাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে বাঁচাতে না পারো তো গোকুলে নিয়ে চল।...

৬। সেই নন্দতনয় কৃষ্ণের নিষ্ঠুর চরণে দলিত মথিত হ'য়ে মানসম্ভ্রম হারিয়ে আমি আর নড়তে পারি না যেন। যেখানে যেখানে সেই নিষ্ঠুর কিশোরের চরণপাত ঘটেছে সেখানকার ধূলিরেণু নিয়ে এসে আমার শরীরে মাখিয়ে দাও তোমরা। তবে যদি প্রাণ থাকে আমার দেহে!

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি শেষ করা হল বাঙালী কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের রচিত একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে—

"হৃদয়ে বিমুক্ত তুমি, মুক্ত তবু নও যে হৃদয়ে!
অন্তরের উৎস হ'তে প্রস্রবণ যে ঐশ্বর্য ঢালে
সেই তো করুণা তব। হে তাপসী দেবতা-নিলয়ে
পবিত্র ও প্রেমধারা ঝরে স্বচ্ছ মুকুতার জালে।
মুক্তপক্ষ হে বিহঙ্গী ভক্তির শিখর অতিক্রমি
সানন্দে চলেছ কোথা! এই বিশ্বচরাচর তব
অমৃতনিষ্যন্দী গানে ধন্য। তুমি প্রেমের মরমী
চল অন্য লোকে। কোনো নারীর হৃদয় অভিনব
যেন কামনায় কভু উদ্বেলিত হয়নি কখনো।
ঈশ্বর-দয়িতা তুমি, সুদূরের ওগো ধ্রুবতারা,
কতদূর হ'তে যেন আমাদের এ ক্রন্দন শোনো।
মিশেছ পরমব্রহ্মে, রৌদ্র যথা মেশে সূর্য সনে।
আছ, তবু নেই তুমি। সন্ন্যাসিনী, চির-অবন্ধনে!" (অনুবাদ)

আক্কা মহাদেবী

কানাড়া দেশের ইতিহাসে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। এই সময়ে ধর্মগুরু এবং সমাজ সংস্কারক বাসবেশ্বর[১] এবং আচার্য আল্লামা প্রভু প্রমুখ তাঁর সহকর্মিগণ শৈবধর্মের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে তাকে বীর শৈবমত নামে এক নতুন ধর্মশাস্ত্রে রূপান্তরিত করেন। এই যুগের জ্যোতিষ্কবৃন্দের মধ্যে আক্কা মহাদেবী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হ'য়ে আছেন। তিনি নিজের জীবনে যে ধর্মনীতিকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন তাকে বলা যায়—"শরণসতী[২]"; লিঙ্গপতি[৩] অর্থাৎ ভক্ত হলেন পত্নী, আর শিব তাঁর স্বামী। কানাড়াতে 'আক্কা' ডাকটি নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এবং এর অর্থ হল 'বড় দিদি'। মহাদেবী নিশ্চয়ই অধ্যাত্ম-সাধনায় জ্ঞান-জ্যেষ্ঠা ছিলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বীরশৈব ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা। ভগবান শিবের প্রতি তাঁর গভীর ও একনিষ্ঠ ভক্তিতে তিনি রাজপ্রাসাদের ধন-সম্পদ ও বিলাসভূষণকে পদদলিত ক'রে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন; এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে অজস্র বাধা বিঘ্নের পর তাঁর শেষ লক্ষ্যে উপনীত হ'য়েছিলেন। এছাড়া তিনি কল্পনাময় কবিত্বশক্তিরও অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর কিছু সংখ্যক উক্তি ভাবীকালের জন্যে 'বচন' হিসাবে সংগৃহীত হ'য়ে আছে। এই ছন্দোময় গদ্য রচনাগুলি সেকালের বীরশৈব পন্থী ভক্তদের কাছে খুবই প্রিয় ছিল এবং কানাড়া সাহিত্যের পুষ্টিতে এগুলির অবদান অসামান্য। কানাড়া ভাষায় 'বচন' রচয়িতার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু প্রাচীন ও বর্তমান সমালোচকেরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে এঁদের মধ্যে মহাদেবীর স্থান একেবারে প্রথম

---

১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিচে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২ শরণ, মহেশ্বর, ভক্ত ইত্যাদি সংজ্ঞা বীরশৈব শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বিভিন্ন স্তর বোঝানোর জন্যে। সংক্ষেপে, ভক্ত অর্থাৎ শিবভক্ত। তার পরের স্তরে থাকেন মহেশ্বর, যাঁর বিশ্বাস খুবই দৃঢ়মূল এবং যিনি বিশ্বাসের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আরো পরের স্তরে থাকেন শরণ, যিনি শিবের কাছে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করেছেন।

৩ লিঙ্গ অর্থ এখানে শিবের প্রতীক, অর্থাৎ শিবলিঙ্গ।

সারিতে। তাঁর 'বচন'গুলি সুতীব্র আবেগে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু কিছু ইতিহাস, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় এই 'বচন'গুলি থেকে পাওয়া যায়।[১]

কৌশিক নামে এক রাজপুত্রের নগররাজ্য উড়ুতাড়িতে এক শিবভক্ত দম্পতির[২] কন্যা ছিলেন মহাদেবী। তিনি যৌবনে অসামান্যা সুন্দরী বলে বিখ্যাত হন। একদিন কৌশিক যখন রঙ্গভূমি থেকে শোভাযাত্রা করে রাজ-প্রাসাদে ফিরছিলেন, মহাদেবীকে তাঁর নিজের বাড়ীর সামনে দেখতে পান তিনি। দর্শনমাত্রেই তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন কৌশিক। নিজেকে কিছুতেই সংযত করতে না পেরে, তিনি তাঁর হাতিকে সেখানেই থামতে নির্দেশ দেন। শোভাযাত্রাও থেমে গেল সেই সঙ্গে। মহাদেবী সম্ভবত সরলচিত্তে রাজ-শোভাযাত্রাই দেখছিলেন, কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তিনিই কৌশিকের লক্ষ্যস্থল, তখন দ্রুতপায়ে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। কৌশিক আর তাঁকে চোখে দেখতে পেলেন না বটে, কিন্তু হৃদয় যেন তাঁকেই অনুসরণ করতে লাগল। এরপর পারিষদবৃন্দ কোনোক্রমে রাজাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলেন, কিন্তু মহাদেবীর প্রতি কৌশিকের অনুরাগ এতোই প্রবল হ'য়ে উঠল যে মন্ত্রীরা মহাদেবীর পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব আনা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখলেন না। তাঁরা এই পিতার কাছে কৌশিকের প্রণয়পীড়িত অবস্থার বর্ণনা দিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন যে, উচ্চনীচ যেই হোক্ রাজার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হলে আর রক্ষা নেই। মহাদেবীর পিতা-মাতা ছিলেন সরল ও ভীরু স্বভাবের মানুষ। তাঁরা ভীত হ'য়ে মহা-দেবীকে রাজার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে ধনসম্পদের অধিকারিণী হতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কৌশিক ছিলেন "ভবী" অর্থাৎ যাঁরা শৈব নয় তাঁদের একজন। তাই চরম অবজ্ঞার সঙ্গে প্রস্তাবটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন মহাদেবী।

বাল্যকাল থেকেই মহাদেবী ছিলেন চেন্না মল্লিকার্জুনের ভক্ত। তিনিই ছিলেন মহাদেবীর হৃদয়মনের অধীশ্বর। কাজেই কোনো নশ্বর পুরুষের সঙ্গে বিবাহের

---

১ আক্কা মহাদেবীর প্রচলিত "যোগাঙ্গ ত্রিবিধি" নামে সংক্ষিপ্ত বচন সংগ্রহ পাওয়া যায়। এতে সাঁইত্রিশটি ত্রিপদী কবিতা আছে, এবং এগুলি সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ আত্মোৎ-কর্ষের বর্ণনা।

২ কবি হরিহর তাঁর কাব্যে মহাদেবীর যে জীবনী বিবৃত করেছেন তারই সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে এখানে। তিনি মহাদেবীর পিতার নাম শিবভক্ত এবং মাতার নাম শিবভক্তে বলে জানিয়েছেন। চামরস নামে কবির বিবরণে এই নাম দুটি যথাক্রমে নির্মল ও সুমতী বলে উল্লিখিত হ'য়েছে। তাঁদের প্রকৃত নাম যে কী ছিল তা বলা খুবই কঠিন।

কথা তাঁর কল্পনাতেই আসে নি। কে জানে হয়তো এইরকম বিবাহের প্রস্তাবের চাপেই তিনি এই বচনগুলি[১] রচনা করে ছিলেন কিনা?—

মাগো, আমি তাঁরই অনুরাগিনী হ'য়েছি
সেই চিরসুন্দর, যাঁর মৃত্যু নেই,
যাঁর ধ্বংসও নেই, আকারও নেই।

মাগো, আমি তাঁরই অনুরাগিনী হ'য়েছি
সেই চিরসুন্দর, যাঁর মধ্য নেই
যাঁর শেষ নেই, অংশ নেই, ভবিষ্যৎও নেই।

মাগো, আমি তাঁরই অনুরাগিনী হ'য়েছি
সেই চিরসুন্দর, যাঁর জন্ম নেই
আর যাঁর ভয়ও নেই।

আমি তাঁরই অনুরাগিনী হ'য়েছি, সেই চিরসুন্দর,
যিনি পরিবার বন্ধনের বাইরে,
যিনি দেশহীন, অদ্বিতীয়;

চেন্না মল্লিকার্জুন, সেই চিরসুন্দরই আমার স্বামী।
আগুনে সঁপে দাও সেই সব অন্য স্বামীদের
যারা মৃত্যু ও ধ্বংসের অধীন।

এই যখন তাঁর মনোভাব, তখন বোঝাই যায় যে মহাদেবী কিছুতেই শিবদ্বেষী কৌশিককে বিবাহ করতে সম্মত হ'তে পারেন না।

এরপর আমরা দেখি, হরিহর তাঁর বর্ণনায় কী বলেছেন। কৌশিকের বার্তাবাহকগণ ফিরে এসে তাঁদের ব্যর্থতার কথা জানালেন। তাঁরা বললেন যে পার্থিব ধন সম্পদের দিকে মহাদেবীর আকর্ষণ নেই, এবং তিনি শিবানুরাগে এতোই নিমগ্ন যে 'ভক্ত' বা 'ভবী' কাউকেই বিবাহ করতে সম্মত নয়। এ সংবাদে কৌশিকের জ্বলন্ত কামনায় যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "অনুরোধে হোক, বা বল প্রকাশে হোক, যেমন ক'রে সম্ভব তাকে এখানে আনো। সে যা প্রার্থনা করে তাই পাবে। কিন্তু একবার তাঁকে এখানে আনো।" মন্ত্রীরা আবার মহাদেবীর পিত্রালয়ে এলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, রাজার আদেশ অনুসারে কন্যাকে বিবাহ দিতে রাজি না হলে কন্যার পিতা-

---

১ যে অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো তা খুবই প্রাথমিক ধরনের। অন্য কোন ভাষায় কবিতার ব্যঞ্জনা, আবেগ এবং ছন্দের ঝঙ্কার জীবন্ত করে তোলা অত্যন্ত দুরূহ।

মাতাকে বধ করা হবে। তাঁরা বললেন, "তাঁকে দিয়ে দাও, এবং অর্থ সম্পদ নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর।" এই কথা শুনে আতঙ্কে মহাদেবীর পিতামাতা প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অশ্রুপাত করতে করতে তাঁরা মহাদেবীকে বললেন, "মাগো, তোর অবাধ্যতার ফলেই আমরা দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রাণ হারাতে যাচ্ছি। তোর 'ভক্তি' তো দেখছি বড় অদ্ভুত জিনিস! সৎস্বভাবের শৈব নারীরা কি আগে কখনো 'ভবী'দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নি? কেন তা হলে তুই আমাদের এই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিস? বাছা, তোকে অনুরোধ করছি, আগে যেমন লোকে করেছে তুইও তাই কর—কৌশিককে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নে!"

এটা ছিল একটা প্রচন্ড আঘাত। কেননা, যদি শুধু তিনি সংশ্লিষ্ট থাকতেন, তবে মহাদেবী হয়ত শেষ পর্যন্তই বাধা দিতেন। কিন্তু এখন তাঁকে পিতা-মাতার জীবন রক্ষার কথা ভাবতে হল, এবং যা তিনি নিজের জন্যে কখনোই করতেন না, তাই তাঁকে করতে হল এই দুটি বৃদ্ধ শিবভক্তের জন্যে। সাধুদের একটি বাণী স্মরণপথে এল তাঁর; "যে কোনো উপায়েই শিবভক্তদের রক্ষা করা উচিত। 'শরণ'দের রক্ষা করার জন্যে সর্বপ্রকার দুঃখযন্ত্রণাই সহ্য করা সঙ্গত।" এইভাবে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে তিনি চরম আত্মত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে স্থির করলেন, বিবাহের জন্যে তিনি তাঁর নশ্বর দেহকে উৎসর্গ করবেন। তখন তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে শান্ত ক'রে মন্ত্রীদের জানালেন, তিনি তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হবেন, যদি অবশ্য তাঁরা তাঁর শর্তে রাজি হন। শর্তটি ছিল তাঁর নিজের ভাষায় এই রকম—"আমি নিজের ইচ্ছামতো শিবারাধনায় আত্মনিয়োগ করব। আমি 'মহেশ্বর'-বৃন্দের সঙ্গে যে ভাবে ইচ্ছা কালাতিপাত করব। আমি যে ভাবে ইচ্ছা রাজার সঙ্গে থাকব। এবং এই শর্তগুলি তিন বারের বেশী লঙ্ঘন করা হলে আমি আর ক্ষমা করব না।" মন্ত্রীরা সানন্দে এসব শর্তে সম্মত হলেন; তখনই একটা চুক্তিপত্রও রচনা করে ফেললেন। আর মহাদেবী তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হ'য়েছেন শুনে কৌশিক আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন। তিনি কন্যার পিতাকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দান ক'রে বিবাহের দিনের প্রতীক্ষায় সময় কাটাতে লাগলেন।

অবশেষে বিবাহের দিন এসে পড়ল। মহাদেবী তাঁর শরীরের অলঙ্কার সজ্জায় কোনো বাধা দিলেন না, কিন্তু অন্তরে ছিল তাঁর দুঃখ ও হতাশার একাধিপত্য। বলিদানের জন্যে উৎসর্গীকৃত পশুকে হাড়িকাষ্ঠের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে যে ভাবে সাজানো হয়, তাঁর হয়তো নিজেকে সেইরকম মনে হচ্ছিল। আর তাঁর দুঃখটা হয়তো সেই জন্যেই আরো বেশী হ'য়েছিল যে নিজেই তিনি নিজেকে

উৎসর্গ করেছেন আত্মদানের জন্যে। বিবাহ-সভায় এই অনিচ্ছুক কন্যাকে অতি উৎসাহী এক বরের হাতে সম্প্রদান করা হল, এবং কৌশিকের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে তাঁরই প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন মহাদেবী।

একটি তৃপ্তি অবশ্য তাঁর ছিল। সর্বনাশের মধ্যেও এইটি তিনি নিজের জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। প্রতিদিন তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা শিবের আরাধনায় অতিবাহিত করতেন। শিবলিঙ্গকে হাতে নিয়ে তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন, পূজা করতেন, বুকে চেপে ধরতেন এবং চেন্না মল্লিকার্জুনের গুণগান ক'রে একজন ভবীর স্ত্রী হওয়ার বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রার্থনা জানাতেন। এরপর তিনি 'শরণ'দের আহার করিয়ে তাঁদের সৎসঙ্গে নবরচিত 'বচন' গান ক'রে দৈব অভিজ্ঞতার মহিমা কীর্তন করতেন। কিন্তু এ আনন্দের পরিবেশে তিনি বেশীক্ষণ থাকতে পারতেন না। সূর্যাস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একই কালে বহির্বিশ্বে এবং তাঁর অন্তরের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে আসত। কৌশিক ডেকে পাঠাতেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মহাদেবী ভক্তদের বিদায় দিয়ে শিবের কাছে আরো একটি গান গেয়ে ভক্তি এবং সাংসারিক জীবনের মধ্যে এই ইতস্তত পারাপারের জন্যে ক্ষোভ জানাতেন। তিনি সমস্ত অলংকার খুলে ফেলে মলিন বস্ত্র ধারণ করতেন, এবং অসজ্জিত অবস্থায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কৌশিকের শয়নমন্দিরে প্রবেশ করতেন।

কিন্তু তাঁর প্রতি কৌশিকের আকর্ষণ এতোই তীব্র ছিল যে এই বিরূপতাও তাঁর কাছে মাধুর্যময় মনে হত। যেন একটি পরশপাথরের প্রতিমা একটি লৌহমূর্তিকে স্পর্শ করেছে, আর লৌহমূর্তিতে সোনার রঙ্ ধরে গেছে! শিবের প্রতি প্রবল অনুরাগের মুহূর্তে রচিত একটি 'বচনে' মহাদেবী বলেছেন—

হে প্রভু, আমার এ-গান তুমি শুনতে হয় শোন
অথবা ইচ্ছা না হলে শুনো না; কিন্তু আমি
তোমাকে এ গান না শুনিয়ে পারব না।

হে প্রভু, আমাকে গ্রহণ করতে হয় গ্রহণ কর,
অথবা ইচ্ছা না হলে গ্রহণ করো না; কিন্তু আমি
তোমাকে পূজা না ক'রে থাকতে পারব না।

হে প্রভু, আমাকে ভালবাসতে হয় ভালোবেসো,
অথবা ইচ্ছা না হলে ভালো বেসো না; কিন্তু আমি
তোমাকে বক্ষে ধারণ না ক'রে থাকতে পারব না।

হে প্রভু, আমাকে দেখতে হয় দেখো,
অথবা ইচ্ছা না হলে দেখো না; কিন্তু আমি
তোমাকে সতৃষ্ণ নয়নে না দেখে থাকতে পারব না।

হে প্রভু, চেন্না মল্লিকার্জুন,
আমি তোমার পূজা করি, আর
অন্তহীন আনন্দে শিহরিত হই।

তবে শিবের জন্যে মহাদেবীর অনুরাগ ছিল অধ্যাত্ম-প্রকৃতির, আর কৌশিকের অনুরাগ ছিল পার্থিব ধরনের। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভালোবাসার মাত্রার দিক থেকে দেখলে, কৌশিকও হয়তো এমনি করেই তাঁর প্রেমাস্পদাকে অনুরাগ জানাতে পারতেন।

আর এই পরস্পর-বিরোধী বিবাহের যন্ত্রণাকে মহাদেবী কী ভাবে সহ্য করতেন? কবি জানিয়েছেন, এ মিলনটাই ছিল যেন দুঃস্বপ্নের মতো; মহাদেবীর আত্মা যেন তাঁর দেহের এই যন্ত্রণাকে সাক্ষীর মতো দূরত্ব থেকে প্রত্যক্ষ করত। তাঁর সংযমের মহত্ত্ব ছিল এতোই বিরাট!

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হ'য়ে গেল। একদিন কয়েকজন 'মহেশ্বর' দূর দেশ থেকে রাজপ্রাসাদে এসে রাণীর কাছে সংবাদ পাঠালেন। কিন্তু মহাদেবী তখন বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। কৌশিক সংবাদদাতা ভৃত্যকে ফিরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে জানালেন, একটা দিনও এইসব ভক্তদের আগমন থেকে বাদ যায় না; কাজেই ঐ দিনটায় অন্তত রাণীকে বিরক্ত না করে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত। এই চিৎকারে মহাদেবী জেগে উঠলেন। এবং ভক্তদের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করেছেন বলে কৌশিকের উপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন তিনি। বিবাহের শর্ত অনুযায়ী এটা ছিল কৌশিকের প্রথম 'অপরাধ', এবং অনেক সাধ্যসাধনার পর মহাদেবী এ অপরাধ ক্ষমা করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় 'অপরাধ' আসতে দেরি হল না। একদিন সকালে যখন তিনি শুদ্ধাচারে বসে পূজায় তন্ময় হ'য়েছিলেন, কৌশিক গোপনে এসে তাঁকে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তিনি মহাদেবীর পবিত্র সৌন্দর্যে এতোই মুগ্ধ হ'য়ে পড়লেন যে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে ছুটে গিয়ে মহাদেবীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। পূজায় বাধা পড়ল। তিনি চোখ ফিরিয়ে কৌশিকের মুখ দেখতে পেলেন এবং সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো তা তাঁকে আতঙ্কিত ক'রে ফেলল। রাগে দুঃখে তিনি কটুবাক্য বলতে লাগলেন। কী স্পর্ধায় একজন 'ভবী' হওয়া সত্ত্বেও কৌশিক

শিবপূজার মাঝখানে মহাদেবীকে স্পর্শ করতে পারলেন। বেশ, এই হল তাঁর দ্বিতীয় 'অপরাধ'!

শোনা যায়, আরো একদিন মহাদেবী যখন স্বামীর সঙ্গে বিরলে ছিলেন, তাঁর গুরু এসে উপস্থিত হন রাজপ্রাসাদে। তখন তাঁর অঙ্গে উপযুক্ত সাজসজ্জা ছিল না; কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি গুরুকে প্রণাম করার জন্যে ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন। কৌশিক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান ক'রে ধৈর্যের সীমা হারিয়ে ফেললেন। মহাদেবীর শরীরে সামান্য যা অঙ্গবাস ছিল তাও একটানে খুলে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গভরে বলে উঠলেন, "খুলে ফেলো, এটুকুও খুলে ফেলো! তোমার মতো এত বড় ভক্ত তাপসীর আর কাপড় দিয়ে শরীর ঢাকার দরকার কী!" এটা ছিল সহ্যের শেষ বিন্দু। তিনটি "অপরাধ"ই সম্পূর্ণ হল এতদিনে। মহাদেবীর প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ এবং স্ত্রীকে নিজের কাছে ধরে রাখার আপ্রাণ বাসনা সত্ত্বেও কৌশিক তিনবার বিবাহ-শর্ত লঙ্ঘন করে ফেললেন। তিনি 'মহেশ্বর'গণ ও মহাদেবীর মধ্যে একবার, মহাদেবী ও শিবলিঙ্গের মধ্যে একবার, এবং শেষবার মহাদেবী ও তাঁর গুরুর মধ্যে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ালেন।

যে মুক্তি মহাদেবী কামনা করছিলেন তা এইবার আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়ল। তিনি শিবলিঙ্গকে নিয়ে কৌশিকের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। দেহের

---

১ চামরস প্রণীত 'প্রভুলিঙ্গলীলে' গ্রন্থে অন্য এক বিবরণ পাওয়া যায়। চামরস বলেন, যখন মহাদেবী জানতে পারলেন যে কৌশিক তাঁকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, তখন তিনি এই শর্ত আরোপ করেছিলেন যে রাজা নিজে তাঁর সামনে এক মহাদেবীর কথা শুনবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলে তবে বিবাহের কথা বিবেচিত হতে পারবে। কৌশিক এইভাবে প্রতিজ্ঞা করলে তবেই মহাদেবী তাঁর উপঢৌকন গ্রহণ করে রাজপ্রাসাদে আসেন। সেখানে গিয়ে তিনি শর্ত দেন যে বিবাহের আগে কৌশিককে 'ভক্ত' হ'তে হবে। কৌশিক ধর্মমত পরিবর্তন করতে সম্মত হলেন না। তখন মহাদেবী জানালেন যে তাহলে কৌশিকের সঙ্গে বাস করতে পারবেন না। এতেই তাঁদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটল; এবং রাজার দেওয়া অলঙ্কার-বস্ত্রাদি ফিরিয়ে দিয়ে মহাদেবী রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। এই অস্বাভাবিক আচরণে কৌশিক স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন, মহাদেবী উম্মাদ হ'য়ে গেছেন। ধীরে ধীরে তাঁর আবেগে ভাঁটা পড়ে এল এবং জোর ক'রে তিনি আর মহাদেবীকে ফিরিয়ে আনলেন না।

মহাদেবী কৌশিকের সঙ্গে কিছুকালের জন্যে বিবাহিত জীবন-যাপন করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে প্রবল মতভেদ আছে। অন্য সব বিষয় বিবেচনা করে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি মনে করেন হরিহরের কাব্যে বিবৃত ঘটনাই সঠিক, কেননা এটা প্রাচীনতর ভাষ্য এবং স্বাভাবিকও। তাছাড়া এটা ভুলে গেলে চলবে না যে পিতা-মাতাকে রক্ষা করার জন্যে জবরদস্তিমূলক বিবাহে মহাদেবীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য খর্ব হয় নাই। হরিহর তাঁর আত্মদানের কাহিনী এতোই জীবন্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন যে তাঁর ভক্তি ও আধ্যাত্মিক গরিমা আরো ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে।

কামনা বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের যন্ত্রণা তাঁর কাছে অতীত বিষয় হ'য়ে গেল। তিনি তাঁর নতুন মুক্তির উল্লাসে পিতা-মাতা এবং গুরুর কাছে বিদায় নিয়ে একাকী উড়ুতাড়ি নগর পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

হরিহরের বর্ণনা অনুসারে, এরপর আক্কা মহাদেবী চেন্না মল্লিকার্জুনের আবাসস্থল শ্রীশৈল পর্বতের দিকে মুখ ক'রে চলতে লাগলেন। ক্রমে বহু পথশ্রমের পর তাঁর তীর্থযাত্রার শেষ লক্ষ্যে উপনীত হ'য়ে তিনি বাধাহীনভাবে শিবারাধনায় রত হলেন। সর্বদা শিবের নাম ধ্যান করতে করতে তাঁকে গুহাকন্দরে, নির্ঝরতীরে, বৃক্ষকুঞ্জে ও পুষ্পোদ্যানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কিন্তু পূর্ব জীবনের ছায়া তাঁকে এখানেও অনুসরণ করতে লাগল। তাঁর পিতা-মাতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং তরুণী কন্যার এই তাপসীর জীবন দেখে তাঁদের হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল। মহাদেবী অবশ্য তাঁদের অনুরোধে কান দিলেন না। তিনি তাঁদের বললেন, এতদিনে কৌশিক-রূপ ভবীর বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে শিবরূপ ভবের সেবায় নিযুক্ত হ'তে পেরেছেন তিনি। তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তায় পিতা-মাতা বিস্মিত হলেন, এবং তাঁকে আর কিছু না বলে স্থান ত্যাগ করলেন। কিন্তু মহাদেবীর শেষ পরীক্ষার এখনো বাকী ছিল। এরপর প্রণয়াহত কৌশিক এক নতুন ভেক নিয়ে উপস্থিত হলেন তাঁর সামনে। কৌশিকের ধারণা হ'য়েছিল, তিনি বুঝি এখনো মহাদেবীর প্রেম ফিরে পেতে পারেন, যদি তিনি শৈব সাজেন। কাজেই রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ ক'রে সারা দেহে ভস্ম মেখে তিনি মহাদেবীর পায়ের উপর পড়ে জানালেন, তিনি এখন 'ভক্ত' হ'য়েছেন, অতএব মহাদেবী যেন তাঁকে করুণা করেন। হরিহর বলেন, এইরকম অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ্য করেই মহাদেবী একটি সুপরিচিত বচন[১] আবৃত্তি করেনঃ—

> হে প্রভু, তোমার মায়া তো আমাকে ছাড়ে না,
> অথচ আমি তাকে ছেড়ে এসেছি। আমার বাধা সত্ত্বেও
> সে যেন পায়ে পায়ে আমাকে অনুসরণ করে।
>
> তোমার মায়া যোগীর কাছে যোগিনী হয়,
> সন্ন্যাসীর কাছে হয় সন্ন্যাসিনী, আর
> সাধুর কাছে অনুচর। প্রত্যেকের স্বভাব অনুসারে
> এ যেন নিজেকে নিত্য নতুন সাজে সাজায়।

---

১ এই অনুবাদ হরিহরের ভাবানুবাদ অনুযায়ী।

আমি যখন পাহাড়ে উঠলাম, তোমার মায়াও
সঙ্গে এল; আমি যখন অরণ্যে প্রবেশ করলাম
তোমার মায়াও আমাকে অনুসরণ করল।
দেখ দেখ, সংসার এখনো আমাকে
পিছনে টানতে ছাড়ে না।
হে অপার করুণাময় প্রভু, তোমার মায়া আমাকে
ভীত করে তোলে। হে প্রভু মল্লিকার্জুন, তুমি
আশীর্বাদ কর আমাকে।

মহাদেবী সত্যই মায়াকে পরাভূত করেছিলেন। সাংসারিক প্রণয়-প্রলোভনের ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলেন তিনি। কৌশিকের কামাতুর প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনি জানালেন যে 'ভক্তে'র সাজে সজ্জিত হলেও তাঁর সঙ্গে মহাদেবীর কোনোই সম্পর্ক নেই। তখন কৌশিক শেষ চেষ্টা করে দেখলেন। তিনি উপঢৌকন নিয়ে কয়েকজন শৈব ভক্তের শরণাপন্ন হ'য়ে জানালেন যে, তিনি 'ভবী' ছিলেন বলে তাঁর স্ত্রী মহাদেবী তাঁকে ত্যাগ করে গেছেন; কিন্তু এখন যেহেতু তিনি 'ভক্ত' হ'য়েছেন তাঁরা যেন তাঁর স্ত্রীকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ জানান। 'মহেশ্বরগ'ণ একে যোগ্য প্রার্থনা বলে বিবেচনা ক'রে মহাদেবীকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের দূত এসে দেখল মহাদেবী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন; কাজেই তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস না করে সে ফিরে এল। তখন 'মহেশ্বর'গণ নিজেরাই এলেন, এবং মহাদেবীর গভীর আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষ্য করে তাঁর প্রভূত প্রশংসা ক'রে কৌশিককে ফিরে যেতে বললেন। কেননা মহাদেবীর নিষ্কাম মনে স্বামীর জন্যে কোনো স্থান নেই।

কিছুকাল পরে মহাদেবী তাঁর নশ্বর অস্তিত্বের জন্যে ক্লান্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি শিবের কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তাঁর যে দেহ একজন ভবীর সংস্পর্শে কলুষিত হ'য়েছে, তাঁর বন্ধন থেকে যেন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। শিব তাঁর প্রার্থনায় তথাস্তু জানালেন এবং দিব্য শরীরে তিনি কৈলাসে চলে গেলেন।[১]

জীবন তাঁর প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি মোটেই। তাঁর অন্তরের চাহিদা না বুঝে

---

১ কৌশিকের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পর মহাদেবীর সাধনা ও সিদ্ধির বিষয়ে হরিহর বিশেষ কিছু বলেন নি। এমন কি তিনি বীরশৈব মতের মহাসংস্কারক বাসবেশ্বরের সঙ্গেও মহাদেবীর সাক্ষাতের বিষয়ে কিছু বলেন নি। এখানে "প্রভু লিঙ্গলীলে" এবং "শূন্য সম্পাদনে" নামে গ্রন্থ দুখানির স্মরণ নিতে হয়।

সংসার তাঁকে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। নিজের সুদৃঢ় মনোবল ও অসাধারণ সাহসের বলেই মহাদেবী ঐ জাল-জঞ্জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। তবু এর ফলে সংসারের প্রতি তাঁর অন্তর বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে নি। বরং সংসারের কলকোলাহল ও নানা প্রতিবন্ধককে তিনি একটি অমূল্য শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ ক'রে আত্মসংযমের প্রয়োজনের বিষয়ে অবহিত হ'য়েছিলেন।

> পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে, কী ক'রে
> বন্য জন্তুর ভয় পেলে চলবে?
> সমুদ্রতীরে বাসা বেঁধে, কী ক'রে
> উত্তাল ঢেউয়ের ভয় পেলে চলবে?
> বাজারের মধ্যে বাসা বেঁধে, কী ক'রে
> হট্টগোলে আতঙ্কিত হলে চলবে?
> হে চেন্না মল্লিকার্জুন, আমি তাই বলি শোনঃ
> এ সংসারে জন্মগ্রহণ করে, নিন্দা বা প্রশংসায়
> মাথা হারালে চলবে না কারো,
> অন্তরের সৌম্যভাব রক্ষা ক'রে চলতে হবে।

মহাদেবী কল্যাণে[১] এসেছিলেন আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্যে। কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধেরা দেখলেন, তিনি আধ্যাত্মিক পথে বহুদূরে অগ্রসর হ'য়ে আছেন, এবং তাঁকে উপদেশ দেওয়ার আর বিশেষ কিছুই নেই। এই তরুণী তাপসীর আত্মোৎকর্ষের পরিমাণ দেখে বাসবেশ্বর মুগ্ধ হ'য়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। এবং অন্যদের থেকে তাঁর কাছেই মহাদেবী বেশী ক'রে সেই সদা চঞ্চল প্রেমিক চেন্না মল্লিকার্জুনকে খুঁজে পাওয়ার পথ জানতে চেয়েছিলেন। বাসবেশ্বর এবং অন্যান্য জ্ঞান বৃদ্ধেরা মহাদেবীকে তাঁর প্রার্থিত ঈশ্বরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংকল্পে আশীর্বাদ জানালেন। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ালো যেন তাঁরা তাঁদের এই কন্যাকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন, এখন শ্রীশৈলে স্বামীর ঘর করতে পাঠালেন তাঁকে। এবং মহাদেবীও বিদায়কালে তাঁদের আশ্বাস দিলেন

---

১ এঁদের মতে শ্রীশৈলে যাত্রার আগে মহাদেবী প্রথমে কল্যাণ নামক স্থানে যান। এখানেই বাসবেশ্বরের এবং আল্লামা প্রভুর বাসস্থান ছিল, এবং বীরশৈব আন্দোলনের স্নায়ুকেন্দ্রও ছিল এইখানেই। আক্কা মহাদেবীর কয়েকটি বচন থেকেও অনুমান করা যায় যে শ্রীশৈল যাত্রার আগে বেশ কিছুদিন কালক্ষেপ ঘটেছিল।

যে তিনি তাঁর আত্মিক পিতৃগৃহের যাতে দুর্নাম না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন।—

আমি পুনর্জন্ম লাভ করি গুরুর হাতে;
আমি বেড়ে উঠেছি কতো না শরণের কৃপায়
দেখ, তাঁরা আমাকে ভবের [১] দুগ্ধ পান করিয়েছেন,
পবিত্র জ্ঞানের ঘৃত এবং প্রমথের [২] শর্করা দান করেছেন;
এই তিনরকম অমৃতেই তুমি আমাকে লালন পালন করেছ।
তুমি আমাকে যোগ্য পাত্রে বিবাহ দিয়েছ;
এখন তোমরা সদলে উপস্থিত হ'য়েছ আমাকে
পতিগৃহে বিদায় দেওয়ার জন্যে;
আমি এমন ভাবেই প্রভুকে সেবা করব যাতে
বাসবন্ন তৃপ্ত হন।
চেন্না মল্লিকার্জুনের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার পর
আমি তোমাদের সুনাম বৃদ্ধি করব, দুর্নাম আনব না।
হে ভক্ত! তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ফিরে
যাও। তোমাদের প্রণাম করি।

ঈশ্বরের আত্মিক দয়িতা মহাদেবী তারপর তাঁর প্রেমের অধীশ্বরকে মুখোমুখি দেখতে পাবেন আশা করে একাকী শ্রীশৈলে চলে এলেন। তাঁর মরমী প্রেমের ব্যথাতুর কামনায় আপ্লুত 'বচন'গুলি কানাড়া ভাষার শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতাগুলির অন্যতম। গভীর আসঙ্গকামনায় কাতর এই প্রতীক্ষমানা দয়িতা তাঁর হৃদয়েশ্বরকে ডেকে বলছেন।

এস, এস, হে আমার দয়িত, তুমি চন্দন সুবাসিত
স্বর্ণশোভিত, দিব্য বস্ত্র পরিহিত,
তোমার আগমনে এ দেহে আবার আমি প্রাণ
ফিরে পাব।
আমি পথের দিকে চেয়ে আছি, তৃষ্ণায় কণ্ঠ
পুড়ে যায়,
আশা শুধু, চেন্না মল্লিকার্জুন আমার আসবে!

---

১ 'ভব' কথাটির অর্থ আছে অনেক। এখানে বোধ হয় শিবলিঙ্গের সূক্ষ্মশরীর ধ্যানকে বোঝাচ্ছে।

২ 'প্রমথ' অর্থ হল আধ্যাত্মিক জগতের মহত্তম গুণ।

প্রেমোপাখ্যানের নায়িকাদের মতোই মহাদেবী তাঁর দেব-দয়িতের বিরহে দুঃসহ শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করতেন। নিম্নোক্ত এই 'বচন'টি যদিও প্রথাসিদ্ধ কোনো সখীকে সম্বোধন করেই রচিত হ'য়েছে, তবু এর ভাবাবেগ কিন্তু একেবারেই প্রথাসিদ্ধ নয়।—

সখী, আমার ব্যথিত মন একেবারেই দিশাহারা
হ'য়ে পড়েছে।
সুমন্দ পবন যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো মনে হয়।
চন্দ্রকিরণ যেন সূর্যালোকের মতো প্রখর,
সখী, আমি নগরের কর-আদায়কারীর মতো টহল দিয়ে ফিরছি,
দোহাই তোদের তোরা তাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে
আমার কাছে নিয়ে আয়;
চেন্না মল্লিকার্জুন যে আমার কাছ থেকে রাগ করে চলে গেছে!

প্রেমের উত্তাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রকৃতিস্থতাও লোপ পায়৷ মহাদেবী বহু পূর্বেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর ঈশ্বর বিশ্বসংসারের সর্বত্র বিরাজমান, এবং সর্বভূতে যাতে তিনি প্রকাশ হন তাই এই তিনি প্রার্থনা করেছিলেন—

তুমিই অরণ্য,
অরণ্যের প্রতি বনস্পতিও তুমি,
বনস্পতির ফাঁকে ফাঁকে যতো পশুপাখী
ঘুরে বেড়ায় তারাও তুমি,
হে চেন্না মল্লিকার্জুন, তোমার মুখের আবরণ
উন্মোচিত কর, সর্বভূতে দেখা দাও তুমি।

এই কল্পনাসমৃদ্ধ প্রার্থনার স্থলে এখন দেখা দিল সর্বভূতে আতুর আবেদন—

ওগো চন্দনা, তুমি তো কতো বুলি জানো, তুমি দেখেছ
দেখেছ কি তাঁকে?
ওগো কোকিল, তুমি পঞ্চমে তান ধরেছ, তুমি দেখেছ
দেখেছ কি তাঁকে?
ওগো ভ্রমর, তুমি কতোই ঘুরলে, তুমি দেখেছ
দেখেছ কি তাঁকে?

ওগো রাজহাঁস, তুমি দীঘিতে কত সাঁতার দিলে
তুমি দেখেছ, দেখেছ কি তাঁকে?
ওগো ময়ূর, তুমি পর্বত গুহায় কলাপবিস্তার করে আছ
তুমি দেখেছ, দেখেছ কি তাঁকে?
বল, ওগো তোমরা বল আমায়, কোথায় সেই
চেন্না মল্লিকার্জুন?

অবশেষে অনেক আত্ম-অন্বেষণের পর মহাদেবী দিব্যদৃষ্টি লাভ করলেন। চিত্ররূপময় এই 'বচন'টি তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য—

আমি তাঁকে দেখেছি তাঁর দিব্য বেশে,
সেই জটাজুটধারী দেহ,
দিব্য রত্ন শোভিত,
স্ফুরিত দন্ত অধরে
সদা হাস্যময় সেই তাঁকে,
যিনি চতুর্দশ ভুবন আলোকিত করেন তাঁর নয়নালোকে
আমি তাঁকে দেখেছি, আর

দু চক্ষের তৃষ্ণা আজ আমার তৃপ্ত,
আমি তাঁকে দেখেছি, সেই পরমেশ্বরকে
যাঁকে পুরুষেরাও পত্নীর মতো সেবা করে।
আমি দেখেছি সেই পরমগুরু চেন্না মল্লিকার্জুনকে
আদি জননী শক্তির সঙ্গে লীলারত,
আর ধন্য হ'য়ে গেছি আমি।

এ হল মূর্তিময় ঈশ্বরের চরমোপলব্ধির কথা। কিন্তু মহাদেবী আরো ঊর্ধ্বে উঠলেন, এবং মূর্তিহীন আদিভূতের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় মিলনের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এই শেষ 'বচন'টি উদ্ধার করেই আমরা সমাপ্তি রেখা টানব। এখানে মহাদেবী অজ্ঞেয়কে জ্ঞানের সীমায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন—

আমি বলি না এটা 'লিঙ্গ',
আমি বলি না এটা লিঙ্গের সঙ্গে একাত্মতা,
আমি বলি না এটা মিলন,
আমি বলি না এটা সঙ্গতি,

আমি বলি না এটা সংঘটিত,
আমি বলি না এটা অসংঘটিত,
আমি বলি না এটা তুমি,
আমি বলি না এটা আমি
চেন্না মল্লিকার্জ্জুনের লিঙ্গ শরীরে এক হ'য়ে যাওয়ার পর
আমি আর কিছুই বলি না এখন।

লালেশ্বরী বা কাশ্মীরের লালদিদি

লালেশ্বরী ছিলেন কাশ্মীরের একজন মরমী কবি। তিনি আবির্ভূত হ'য়েছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীতে, এবং তিনি লীলা যোগীশ্বরী, লালদিদি বা লালদেদ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে খুবই ভালবাসত, আর আজও তাঁর নাম প্রতি ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তিনি ছিলেন তাঁর দেশবাসীর উচ্চাদর্শের প্রতিমাস্বরূপিণী। তৎকালে কাশ্মীরে যে শৈবধর্ম প্রচলিত ছিল, তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। শৈবধর্ম বেদান্তের একেশ্বরবাদ গ্রহণ ক'রে একটি বাক্যে তার সার কথা ঘোষণা করেছে। "সোঽহম্"। এই ধর্ম আরো ঘোষণা করে যে, মূলত ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মা এক, এবং পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে ঈশ্বরই একমাত্র ধ্রুব সত্য। তিনি এই বিশ্বচরাচরের সর্বভূতে বিরাজ করে জগতকে ধারণ ক'রে আছেন। আবার এ জগতের বাইরেও তিনি সৎরূপে বিরাজমান। কাজেই তিনি একইকালে প্রত্যক্ষ এবং অবাঙ্মানসগোচর। লালেশ্বরীর উপদেশাবলীর মূল বিষয়বস্তু ছিল এইটেই, আর এই একটি উপলব্ধিকেই তিনি অন্তহীন-রূপকল্পের সাহায্যে রূপায়িত করেছেন। অবশ্য তিনি কোনো ধর্মমত বা প্রথাসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের প্রচারে ব্রতী হন নি। তিনি যা বলতেন তা তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপলব্ধিতেই বলতেন। কিন্তু এটা খুবই সত্য যে, কেউ যদি নিজের গভীর উপলব্ধিকেই ভাষা দিতে পারেন তবে সেই ভাষা প্রাণস্পন্দনে সজীব হ'য়ে ওঠে, এবং কালস্রোতের ক্ষয়কে অস্বীকার ক'রে সেই বাণী অমরতা অর্জন করে। স্যার রিচার্ড কারনাক টেম্পাক তাঁর গ্রন্থ "দি ওয়ার্ডস্ অব লালাদি প্রফেটস্"-এর মুখবন্ধে পণ্ডিত আনন্দ কলের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে পণ্ডিত কল বলেছেন, "'লালবাকি' বা লালের বচনগুলি কাশ্মীরীদের কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্মে গিয়ে সাড়া তোলে, তাই কথাবার্তার সময়ে উপযুক্ত সময়ে তাঁর নীতিবাক্য বলা একটা সহজ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই বচনগুলির উপরেই কাশ্মীরের জাতীয় মানস ও জাতীয় আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত।" আর তারপর লেখক স্যার রিচার্ড মন্তব্য করেছেন, "দেশের লোকচিত্তে যে কাব্যোক্তিগুলির এত প্রভাব, তাঁদের আন্তরিকভাবে বিচার ক'রে দেখা অবশ্যই কর্তব্য।"

লালেশ্বরীর জীবন কথা নানা রহস্যময় ঘটনা ও উপকথায় আবৃত। উপরোক্ত গ্রন্থখানি ছাড়া রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত

হ'য়েছে। নিবন্ধটিতে স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন্ এবং ডক্টর লায়নেল বার্ণেট কর্তৃক অনূদিত কবিতার উদ্ধৃতি আছে। ঐ নিবন্ধের নাম "দি লালা বাক্যানী অর ওয়াইজ সেইংস অব লালদেদ (অর লালা)'—প্রাচীন কাশ্মীরের একজন মরমী কবি।" কাশ্মীরের পণ্ডিত আনন্দ কল "লালযোগীশ্বরী, তাঁর জীবন ও বচনাবলী" বলে একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। এই পুস্তিকাখানি রচিত হ'য়েছে লোকগীতি ও লোকশ্রুতির উপর ভিত্তি ক'রে। সামান্য এই সব উপাদান ছাড়া লালেশ্বরীর মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপর আর কোনোই সাহিত্য রচিত হয় নি। কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও যে বর্তিকা তিনি স্বহস্তে জেবলে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে অম্লান শিখায় ভাস্বর হ'য়ে আছে, এবং এই ভাবেই কত পুরুষ ধরে অখণ্ড অস্তিত্বে উজ্জবল হ'য়ে আছে তাঁর বচনগুলি। তাঁর শ্লোকগুলিতে তাই আজো দেখতে পাওয়া যায় বহু রকম প্রাচীন বাগ্‌বিন্যাস, বহু অপ্রচলিত শব্দ। আবার কখনো কখনো মনে হয়, মুখে মুখে উচ্চারিত হ'য়ে ভাষাও যেন গেছে পরিবর্তিত হ'য়ে। কিন্তু এর ফলে ঐতিহাসিক এবং জীবনীকারগণ কিছুটা বিপন্ন বোধ করলেও, লোক সাধারণ এসব শুষ্ক তথ্যের ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামায় নি। তারা যেন সহজাত বুদ্ধির বশেই জানতে পারে, ভগিনী নিবেদিতার এই বাণীর সত্যতা—"পুরাণগুলি তো প্রকৃতপক্ষে মানবসমাজের রত্ন পেটিকা, যার মধ্যে প্রতি পুরুষেই সঞ্চিত হয় স্বপ্নের ঐশ্বর্য ও বিরহ প্রেমের উপঢৌকন, যা পরবর্তী পুরুষের অক্ষয় সম্পদ হ'য়ে দাঁড়ায়।"[১]

সেইজন্যে, পণ্ডিত আনন্দকল যে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তারই ভিত্তিতে লালেশ্বরীর একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়ে শুরু করাই ভাল। আমরা নিরাপদে ধ'রে নিতে পারি যে তিনি চতুর্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কেননা বিখ্যাত পারসীক সুফী-সাধক সৈয়দ আলি হম্‌দানী যখন ১৩৭৯—৮০ এবং ১৩৮৫—৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে এসেছিলেন তখন লালেশ্বরী জীবিত আছেন বলে শুনেছিলেন। এই সূত্রে এটা উল্লেখযোগ্য যে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বেশ কয়েকজন সাধক কবি, ধর্মোপদেষ্টা ও মরমী কবির আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা জনসাধারণের জীবন ও চিন্তা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁদের কালে তাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট জননায়ক এবং আজ পর্যন্তও তাঁদের প্রভাব আমাদের দেশে অত্যন্তই গভীর। পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক রামানন্দই এঁদের পুরোবর্তী বলে অনুমান করা হয়। তারপর আসেন—

---

১ দি ওয়েভ অব ইণ্ডিয়ান লাইফ।

উত্তর ভারতে তুলসীদাস, মীরাবাঈ, নানক ও কবীর; বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, এবং দক্ষিণ ভারতে বল্লভাচার্য। কিন্তু কাশ্মীরের বাইরে লালেশ্বরীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা তা না বলা গেলেও এটা নিশ্চিত যে, তিনি এঁদের সকলেরই পুরোবর্তিণী।

শ্রীনগরের চার মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত পণ্ড্রেনথান নামক স্থানে এক কাশ্মীরী পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লালেশ্বরী। তাঁর জন্মের সঙ্গে একটা অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে, যা নিতান্তই হিন্দু ধারণার পোষক। শোনা যায় তিনি তাঁর পূর্ব জন্মেও কাশ্মীরে জন্মেছিলেন এবং পণ্ড্রেনথানের অধিবাসী এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল। সেই জন্মে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল। যখন পুত্রজন্মের একাদশ দিনে কুল-পুরোহিত সিদ্ধ শ্রীকান্ত তাঁর জাতকর্মের জন্যে উপস্থিত হলেন, তখন লালেশ্বরী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই নবজাতকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?" পুরোহিত উত্তর দিলেন, "এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন? কেন, এ তোমার পুত্র।" মাতা অস্বীকার ক'রে বললেন, "না, তা নয়।" এর পর পুরোহিত যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে তাহলে ঐ সন্তান তাঁর কে, তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুকাল আসন্ন এবং এক বিশেষ গ্রামে তিনি বিশেষ কতকগুলি চিহ্নসহ এক ঘোটকীরূপে জন্মগ্রহণ করবেন, এবং তখনই তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। এই বলে সেই স্ত্রীলোকরূপী লালেশ্বরী মারা গেলেন, এবং যথাকালে নির্দিষ্ট স্থানে পুরোহিত ঘোটকীকে জিজ্ঞাসা করতে গেলেন। তিনি ঘোটকীর সাক্ষাৎ পেলেন, কিন্তু সেও তাঁকে একই উত্তর দিল। তার তখন মরণাপন্ন অবস্থা, এবং পরজন্মে সে কুকুরী হ'য়ে জন্মাবে বলে জানাল। পুরোহিত এরপর কুকুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু সেও একই উত্তর দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। এরপর পুরোহিত বিরক্ত হ'য়ে আর খোঁজ নেওয়া দরকার বোধ করলেন না। ছয়বার এইভাবে দ্রুত পরম্পরায় পশুজন্ম নিয়ে একই জীবাত্মা লালেশ্বরী রূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং সেই বালককেই বিবাহ করলেন, যাকে সাতজন্ম আগে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন। একই পুরোহিত বিবাহ দিতে এলেন, এবং লালেশ্বরী এই গোপন তথ্যটি তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বারো বছর। বালকটি একেবারে পূর্ণবয়স্ক।

এই আশ্চর্য জনশ্রুতির মধ্যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথম এতে মনে হয়, যে তিনি ছিলেন জাতিস্মর, যা সিদ্ধ-আত্মাদের পক্ষেই শুধু হওয়া সম্ভব। তাছাড়া হিন্দুদের চিন্তাধারা এবং লালেশ্বরীর পরবর্তী জীবনধারার কথা মনে রাখলে বোঝা যায়, ব্যাপারটার এক গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। এতে স্পষ্ট

বোঝা গেছে যে, 'সব জীবই এক' এই জ্ঞানবাক্য অভ্রান্ত, এবং দুর্জনেরা বিশ্বাস না করলেও এটা সত্য যে মানব-জগৎ এবং পশু জগৎ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সবশেষে এতে বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে জীবন যেমন সদাচঞ্চল সাংসারিক সম্পর্কগুলিরও তেমনি কোনো স্থির মূল্য নেই। "উত্তপ্ত লোহার উপরে জলবিন্দুর মতোই জীবন ক্ষণস্থায়ী।...... এবং একপাল পশুকে জলপান করানোর জন্যে জলপাত্রের কাছে একত্র করার মতোই মাতা-পিতা পুত্র ভ্রাতা স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে একত্রে থাকা; কিংবা নদীর উপরে ভাসমান কাঠের টুকরোগুলো যেমন স্রোতের টানে একত্র হয়, এও যেন সেই রকম।"[১] অতি বিচারশীল মনের বুদ্ধি গর্বে একে হয়তো অবজ্ঞা করা যেতে পারে। কিন্তু এই নিবন্ধ লেখকের মনে হয় যে, জনশ্রুতি হলেও লালেশ্বরীর মতো উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন নারীর জন্মের পূর্ব-ইতিহাস এরকম গভীর ও শাশ্বত মূল্যবোধের দ্বারা গৌরবান্বিত হবে, এটা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গ এই যে লালেশ্বরী এবং তাঁর স্বামী কখনো স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করেন নি। তাঁর পূর্ব জন্মের স্বামী এজন্মে হ'য়েছিলেন তাঁর শ্বশুর। তিনি আবার বিবাহ করেছিলেন, এবং এই নতুন গৃহিণীর অত্যন্ত দুর্ব্যবহারে তাঁর জীবন তিক্ত ও দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। অবশ্য তিনি ধৈর্য ও বিনয়ের দিক থেকে আদর্শই ছিলেন, এবং পরিবারের পুত্রবধূর মতোই নম্র ছিল তাঁর ব্যবহার। কাশ্মীরের পিতামহীরা আজো অক্লান্তভাবে যোগেশ্বরীর বিষয়ে কতো গল্প ও নীতি-কথা বলেন, এবং তাতে বোঝা যায় লালেশ্বরী কত নীরবে কী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁর দুরদৃষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন।

কখন ঠিক তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধান আরম্ভ হ'য়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, তাঁর জন্মগত প্রবণতাই ছিল ঈশ্বরের দিকে, এবং বিবাহ ও সংসারী জীবনের দিকে তাঁর যেটুকু আসক্তি ছিল, তাও স্বামীর ঔদাসীন্য এবং বিমাতা-শাশুড়ীর নির্দয় ব্যবহারে বালিকা বয়সেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'য়েছিল। একদিন তাঁর শ্বশুর যখন দেখলেন যে এক টুকরো পাথরের ওপর পাতলা ভাতের আস্তরণ দিয়ে লালেশ্বরীকে সামান্য আহার্য দেওয়া হ'য়েছে, তখন তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এতে সেই বিমাতা শাশুড়ীর রাগের মাত্রা বেড়েই গেল।

---

১ অধ্যাত্ম রামায়ণ। ২য় খণ্ড; ৪র্থ সর্গ; ২০, ২৩ শ্লোক।

শোনা যায় লালেশ্বরী বারো বছর স্বামীর ঘরে ছিলেন। যদি তাঁর বারো বছর বয়সে বিবাহ হ'য়ে থাকে, তবে নিজের জন্মগত সংস্কার ও শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচারে যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন তখনও তাঁর বয়স কমই ছিল। গৃহত্যাগ করে তিনি সেদবায়ু নামে একজন শৈব সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কোনো কোনো মতে, এই সাধু যাকে 'সেদ' বলা হ'য়েছে তিনি লালেশ্বরীর পূর্বজন্মের পরিচিত সেই পুরোহিত সিদ্ধ শ্রীকান্ত। তিনি পম্পুরে বাস করতেন, এবং শোনা যায় তিনি ছিলেন কাশ্মীরের আধুনিক শৈবধর্মের প্রবর্তক বসুগুপ্তের শিষ্য-বংশের উত্তর পুরুষ। লালেশ্বরী সাধনায় তাঁর গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এবং তর্ক যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু এই গুরুর প্রসাদেই তিনি একজন শৈব-যোগিনী হ'য়ে ওঠেন। তারপর প্রাচীন বৈদিক যুগের অবিস্মরণীয় ব্রহ্মবাদিনী যোগীর মতো কটিবাস মাত্র আচ্ছাদিতা হ'য়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে-ছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদের পরিচিত প্রথাকে তিনি স্বীকার করতেন না। এজন্যে যে তাঁকে বিদ্রূপ করা হত তাও তিনি জানতেন। কিন্তু সাংসারিক সমালোচনায় তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট হত না। পণ্ডিত কল এই প্রসঙ্গে একটা গল্পের অবতারণা করেছেন।—একদিন ছেলেরা যখন রোজকার মতো তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছিল, একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী তাদের খুব তিরস্কার করেন। লালেশ্বরী তখন বস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু কাপড় চেয়ে নিয়ে সেগুলো সমান ওজনের দুই ভাগে বিভক্ত করেন। তারপর দুই কাঁধের উপর সেগুলো নিয়ে তিনি চলতে শুরু করেন, এবং পথে নিন্দা ও প্রশংসা অনুসারে এক-একদিকের কাপড়ে গিঁঠ দিতে থাকেন। সন্ধ্যা বেলায় তিনি ফিরে এসে সেই বস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে দুই কাঁধের কাপড়গুলোর পৃথক পৃথক ওজন নিতে বললেন। বলা বাহুল্য, ওজন এক রকমই ছিল। তাই দেখিয়ে তিনি বোঝালেন যে নিন্দা-প্রশংসা সত্ত্বেও ওজন যেহেতু একই আছে, সেজন্যে নিন্দা-প্রশংসাকে দার্শনিক চিত্তসাম্যের সঙ্গে স্থির ভাবেই গ্রহণ করা উচিত।

এরপর থেকে তিনি ঐশী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে নৃত্যগীত সহকারে সারা দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর মহত্ত্বের বিষয়ে যে অজস্র গল্প এখনো প্রচলিত আছে তাই থেকেই অনুমান করা যায় যে কাশ্মীরীদের হৃদয়ে তাঁর জন্যে কতো বড় শ্রদ্ধার আসন তিনি অধিকার করে আছেন আজো। শোনা যায় তিনি শ্রীনগরের পঁচিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ব্রীজবিহার নামক স্থানে বেশ পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। পণ্ডিত কল লিখেছেন, তিনি যখন দেহত্যাগ করেন তখন তাঁর আত্মা "আলোক শিখার মতো ঊর্ধ্বাকাশে উঠে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়।"

লালেশ্বরী তাঁর সময়ের পূর্বে প্রচলিত এক প্রাচীন কাশ্মীরী ভাষায় ছাঁচে "লাল বাক্যানি" রচনা করেছিলেন। ভারতবর্ষে পণ্ডিত ব্যক্তিদের ভাষা সংস্কৃতের পাশাপাশি সাধারণ লোকেরও অন্য ভাষা ছিল। সেইজন্যে কাশ্মীরেও একটি স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব ছিল। লিপিটা দেবনাগরী লিপির অপভ্রংশ, এবং সংস্কৃত অক্ষরগুলির উচ্চারণে বিদেশী প্রভাবের ছাপ দেখা যায়। কাশ্মীরী সাহিত্য অবশ্য খুব বিপুল নয়, তবু লালেশ্বরীর বচনগুলি কেবল এই সাহিত্যেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেই, অন্য যে কোন ভাষার ভক্তিমূলক এবং দার্শনিক সাহিত্যের সঙ্গে অনায়াসেই আসন পেতে পারে।

লালেশ্বরী তাঁর উপদেশাবলী আরম্ভ করেন নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। তিনি বলেছেন—

> গভীর আবেগ ভরে আমার দু'চোখে তৃষ্ণা নিয়ে
> দিন রাত্রি কতোই না আমি অন্বেষণ করেছি।
> দেখ দেখ, সেই একেশ্বর পরম সত্যকে, সেই
> পরম প্রাজ্ঞকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমারই কুটিরে।

তাঁর বচনগুলি গভীর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে পূর্ণ, এবং তিনি যোগিনী বলে তাঁর বচনে যোগশাস্ত্রের সংজ্ঞাও ব্যবহৃত হ'য়েছে প্রচুর পরিমাণে। তিনি বলেন, পরমসত্তাকে কেবল যোগাভ্যাসের দ্বারাই পাওয়া যায় না; তবে যোগাভ্যাসের ফলে সত্যান্বেষী জানতে পারে যে এ জগৎ মায়া মাত্র। তারপর তিনি তাকে অতিক্রম করে যেতে সচেষ্ট হন। সাধনার ফলে দৃশ্যমান জগতের ইন্দ্রিয়বোধ ক্রমে লুপ্ত হ'য়ে যায় এবং মানবাত্মা পরম ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে। এ অবস্থায় সসীম আত্মবোধ অসীম সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মে বিলীন হ'য়ে যায়। তাই তিনি বলেছেন—

> সেখানে শিবও আর পরম সত্য নয়,
> তাঁর শক্তিরূপিণী মহেশ্বরীর স্থান নেই সেখানে।
> সেখানে অচিন্ত্য 'কী-এক-বোধ', স্বপ্নের মতো
> রহস্যের আবরণে চিরচঞ্চল॥

বহির্জগৎকে মায়াময় বলে ঘোষণা ক'রে তিনি তাঁর উলঙ্গতার সমর্থনে বলেছেন,

> নৃত্য কর, লালেশ্বরী, বাতাস হোক তোমার বসন,
> গান গাও, লালেশ্বরী, আকাশ হোক তোমার আচ্ছাদন,

আকাশ ও বাতাস—এর চেয়ে ভালো আর কোন পরিচ্ছদ?
লোকে বলবে—বস্ত্র! তাকে কি পবিত্র করে?

লালেশ্বরী মনে করেন যে দেহের প্রয়োজন যদিও মেটাতে হবে, তবু মন যেন আত্মবোধেই পূর্ণ থাকে। তিনি কামনাকে তুলনা করেছেন 'মহাজনে'র সঙ্গে, এবং বলেছেন যে কামনায় দাসখতে-লেখা কোনো খাতকই যমের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে না। কামনা যাকে ঋণ দিতে চায় না সেই আত্মতুষ্ট ব্যক্তিই সুখী।—

একমাত্র সেই সুখী আর শান্তিতে আছে,
মিথ্যা আশায় যে ঘোরে না, আর চলে যায়
কামনার কঠিন ঋণ যেখানে উধাও,
যেখানে ঋণ নেই, ধারও দেয় না কেউ যেখানে।

প্রকৃত দার্শনিকের মতো তিনি ঈশ্বরকে পাওয়ার পথে অলৌকিক ক্ষমতার যে সব প্রলোভন আসে সাধকের সামনে, তাঁকে তুচ্ছ মনে করেন। তিনি বলেন—

আগুন কেন নেভাও, যোগী, ঝরণা কেন থামাও?
শূন্যে তুলে দুপা কেন 'মাথার' পরে হাঁটো?
ষাঁড়ের কাছে দুধ খোঁজ? আর স্বপ্নে যাদু চাও?
তুচ্ছ এসব ভোজবাজিতে নিজেই হবে খাটো॥

সর্বভূতে ব্রহ্মের অস্তিত্বের মহিমায় এই স্তবকটি উপনিষদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্তঃ

তুমিই আকাশ, আর তুমিই পৃথিবী,
দিন, রাত্রি, বায়ু, সবই তুমি।
যা কিছু জন্মায় সবই তোমারই তো রূপ।—
এমন কি ফুলের অঞ্জলি।

অদ্বৈতবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে যে তিনি ভক্তিবাদকে অস্বীকার করতেন তা নয়। অথবা জ্ঞানমার্গের অনুশীলন করতেন বলে তাঁর ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভাবও কিছু কম ছিল না। প্রত্যক্ষ আবেগের সঙ্গেই তিনি গেয়েছেন—

কতো না চেষ্টা, কতো সংগ্রাম, দরজাটা ছিল বন্ধ।
ভেজানো দরজা, খিল তোলা, বাড়ে তৃষ্ণাই পলে পলে,
শুধু তাকে দেখা, যে তাঁর জীবনে মরণে নয়নানন্দ,
বন্ধ দরজা, তবু চেয়ে চেয়ে দুই চোখ ভরে জলে॥

যদিও মানুষকে চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ, তবু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের করুণা ছাড়া তাঁকে জানা অসম্ভব। তিনি তাই বলেন—

তবুও যখন বন্ধ দুয়ারে দাঁড়িয়েছিল সে একা,
হৃদয়ে কেবল তারই নাম, সেই ঈপ্সিত মন ভ'রে,
দেখ, দেখ, সে যে দরজা খুলেছে, নিজেই দিয়েছে দেখা,
সেখানে আপন হৃদয়ে দেখল তাকেই পূর্ণ ক'রে,
লালেশ্বরী তো মনের কলুষ পুড়িয়েছে সেই কবে,
দিকে দিকে ডাকে দ্রষ্টা-সাধিকা বলেছে কতো না গাঁয়ে
কামনাবিহীন মন নাকি তাঁর পূর্ণ মহানুভবে,
নতজানু, তবু নতজানু হ'য়ে বসল সে তারই পায়ে॥

পরম ব্রহ্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রাণের সাযুজ্যের বিষয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাবে গেয়েছেন।—

আমার আত্মার আত্মা, তুমি তো আমারই স্বরূপ,
আমার আত্মার আত্মা, আমি তো তোমারই স্বরূপ,
তুমি আর আমি যেখানে এক, সেখানে তো মৃত্যু নেই।
কী এসে যায় সে সব প্রশ্নে—সেই 'কেন' আর 'কেমন করে?'

তাঁর কয়েকটি সুপরিচিত 'বচনে' বস্তুবিশ্বের নশ্বরতার বিষয়ে বিশদ করে বলেছেন। যেমন—

যেমন ক্ষণস্থায়ী ফুলের জন্ম,
সবুজ ডালের ওপর কী উজ্জ্বলই না দেখায় তাকে।
যেমন ক্ষণস্থায়ী ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা
পত্ররিক্ত কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে যখন সে ব'য়ে চলে,

ফলের আশা না রেখে কর্ম ক'রে যাওয়াই গীতার শিক্ষা। লালেশ্বরীও তাঁর গানে সেই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা ক'রে গেয়েছেন।

নিজের কথা না ভেবে তবু যদি আমি কাজ করি,
আমার সব কাজ তবে নিবেদন করতে পারব সেই ব্রহ্মকে;
নিজের কথা না ভেবে যদি বিশ্বাস আর কর্তব্যকে স্থান দিই আগে,
আমার উন্নতির পথে তাহলে কোনো বাধাই তো বাধা নয়।

শ্রম মানেই প্রার্থনা, কিন্তু শ্রমকে নিবেদন করতে হবে পরমার্থের সেবায়। তিনি বলেছেন—

শ্রমের কাজ যা আমি করেছি,
চিন্তার বাক্য যা আমি বলেছি,
সে সবই আমার শরীরের নিহিত আরাধনা,
সে সবই আমার মস্তিষ্কের নিহিত আরাধনা।

কার্পাসের ঘরোয়া দৃষ্টান্ত দিয়ে লালেশ্বরী ঈশ্বরাধনায় ব্রতী সাধকের বাধা-গুলির বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন। প্রথমে এই কার্পাসকে ভালো ক'রে পরিষ্কার করে পাঁজ তৈরী করা হয়, তারপর সুতো কেটে নিয়ে তাঁতে বসানো হয়। যখন এ থেকে কাপড় তৈরী হয়, রজকেরা একে সাদা করার জন্যে পাটার ওপর আছাড় দিয়ে দিয়ে কেচে নেয়। তারপর দর্জি তাকে মাপ-অনুযায়ী ছেঁটে কেটে পোষাক বানায়। এই দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটি উপমার অর্থ কিছুটা অনিশ্চিত, কিন্তু এটা বোঝা যায় যে পরাজ্ঞান লাভের নানা স্তবকেই এখানে বিবৃত করা হ'য়েছে।—

প্রথমে আমি, লালেশ্বরী, ফুটেছি কার্পাসের মতো,
সানন্দে চলতে শুরু করেছি জীবনের পথে।
তারপর পেলাম বুকে ধুনুরীর কঠিন আঘাত,
পাঁজি তৈরী করা হল তারপর আমাকে পিঁজে পিঁজে।

সরু সুতোয় বুনল তখন আমাকে কোনো মেয়ে,
চরকার ওপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কতোই না শক্ত করল আমাকে
তারপর তাঁতে বসিয়ে বুনতে লাগল টানা পোড়েনে।
তাঁতীর পায়ের আঘাতে গড়ে উঠলাম আমি।

তৈরী হলাম কাপড়, এলাম ধোপার পাটায়,
কতোই না কাচল আমাকে ধোপারা দুহাতে আছড়ে আছড়ে
সাজি মাটি, হাড়ের গুড়ো আর চামড়া দিয়ে সাদা করল আমাকে,
কী পরিষ্কার হলাম আমি সাবানের ফেনার শুভ্রতায়।

দর্জিরা তারপর চালালো তাদের কাঁচি আমার বুকে,
টুকরো টুকরো কেটে গ্রন্থে গ্রন্থে তৈরী করল আমাকে,
তৈরী হলাম পরিচ্ছদ, ছাড়া পাওয়া প্রাণীর মতো
মুক্তি পেয়ে পেলাম আমার পরম সত্তাকে তখন।

পৃথিবীর আত্মার পথ কতোই না দুস্তর,
যাত্রাপথের শেষে পৌঁছাতে কষ্টের আর শেষ নেই,
প্রতি জন্মেই আত্মার পথ কতোই না দুস্তর,
পরমবন্ধুর হাত খুঁজে পেতে কষ্টের আর শেষ নেই।

জন্ম-জন্মান্তর ধরে জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হ'য়েছে নিচের এই কবিতাটিতে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অন্তরে নিশ্চয়ই এর প্রতিধ্বনি উঠবে।

আমার পিঠের উপর থেকে চিনির বস্তা সরিয়ে নাও,
বাঁধন আর গিঁঠে জ্বালা ধ'রে গেল আমার কাঁধে।
কতো না গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেল আমার দিনের কাজ,
হায়, কতো আর বইব একে? যতক্ষণ না পড়ি?

গুরুকে খুঁজে পেয়ে আমি শুনলাম তিনি বলছেন—
যে সত্যগুলি ক্ষতের মতো জ্বলছে আমার বুকে,
সেগুলি হারানো মায়ার যন্ত্রণা, কেননা আমি
কামনা করেছিলাম তাদের,
হায়, কতো আর বইব একে? যতক্ষণ না যাই?

চেতনার ধেনুগুলি সবই যেন হারিয়ে গেল আমার,
হারিয়ে গেল রাখালের ডাকের বাইরে, দূরে;
মুক্তির পাহাড় আমি পার হব কবে, বল কবে?
হায়, কতো আর বইব একে? যতক্ষণ না পড়ি?

অন্তরের ভিতর থেকে কতো না সন্ধান করেছি আমি,
তারপর পেলাম আমি জ্ঞানে পূর্ণচন্দ্রের বিভা।
কতো না সন্ধান করে পেলাম এই পূর্ণ সত্য—
যোগ্যের সঙ্গেই শুধু মিলিত হয় যোগ্য।

হে নারাণ[১] সর্বভূতে তোমারই স্বরূপ।
তোমাকেই, নারাণ, দেখি আমি সর্বভূতে।

---

১ 'নারাণ' শব্দটি নারায়ণেরই অন্য রূপ।

হে নারাণ, যে লীলা এখন তুমি দেখাও,
আমার চোখে তা মায়া ছাড়া কিছুই নয়।

আমি যে জেনেছি আমিই পূর্ণ-ব্রহ্ম,
আমি তাই বুঝেছি, কেন তুমি বিচ্ছিন্ন হও।
আমি সেই স্বপ্নের রহস্য ভেদ করে গেছি আজ,
দেখেছি আমরা দুজনে একই অঙ্গে এক।

এখানে সাংসারিক মায়ার বোঝাকে মিছরীর তালের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। বলা হ'য়েছে যে ফিরিওয়ালার বোঝা-বাঁধা দড়ি-দড়া ঢিলে হয়ে পীড়ন করছে তাঁকে। জগৎকে বলা হ'য়েছে স্বপ্ন, আর সৃষ্টি হল ঈশ্বরেরই লীলা।

যে পথই আমরা গ্রহণ করি না কেন, যে মতই আমরা অনুসরণ করি, মানবাত্মা ঈশ্বরানুভূতি লাভ করার আগে শেষ পর্যন্ত একই দুঃখযন্ত্রণা পার হ'তে বাধ্য হয়।

শক্তি ও বিশ্বাসের অভাবে সব সাধকেরই হতাশ দৃষ্টিতে লক্ষ্যস্থলের সামনে পর্বত প্রমাণ বাধা এসে দেখা দেয়। লালেশ্বরী শেষের দিকে যে সিদ্ধির আনন্দের কথা বলেছেন, আমাদের অনেকেরই তা আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু তীব্রভাবেই বুঝতে পারি, "হারানো মায়ার যন্ত্রণা, কেননা আমি কামনা করেছিলাম, তাদের" এবং সেই বেদনা যা, "ক্ষতের মতো জ্বলছে আমার বুকে"—এগুলি ঐ মহা-পথের নিত্যসঙ্গী। কাজেই সেই সাধক যাদের পদক্ষেপ স্খলিত হ'য়ে এসেছে, চোখের দৃষ্টি হ'য়েছে অস্বচ্ছ এবং লক্ষ্য যাদের দূরে সরে গেছে, তাঁদের কাছে লালেশ্বরীর বাণী উৎসাহ বহন করে আনবে। জ্ঞানীদের জন্যে তিনি তাঁর বাণী রেখে যান নি। লৌকিক 'বচনে'র মাধ্যমে তাঁর ধর্মোপলব্ধিকে তিনি রেখে গেছেন লোক-সাধারণের জন্যেই। বর্তমান কালে স্যার, আর, সি, টেম্পল যে কেবল শৈবমত নয় ভারতের দার্শনিক চিন্তার সম্পূর্ণ আলোচনায় ব্রতী হ'য়েছিলেন, সেটা সম্ভব হ'য়েছিল, তিনি লালেশ্বরীর গীতিমালায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলেই। তাঁর গ্রন্থ তিনি এক সুদীর্ঘ ভাষণে উৎসর্গ করেছিলেন লালেশ্বরীর উদ্দেশ্যে। তার মুখবন্ধে আছে এই কবিতাটি—

লালেশ্বরী, তুমি ছিলে অনন্যমনা সাধিকা,
তোমার কালের সত্যের দুহিতা ছিলে তুমি,
তোমার গান বন্ধন করেছে আমাকে,
আমি দূরবিদেশের এক সন্তান॥

এই স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা নিবেদনেই প্রমাণিত হয় সেই আপ্ত বাক্যটি—হৃদয়ই হৃদয়কে কাছে টানে। লালেশ্বরীর বাণী দেশকালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নয়। যাঁরাই সেগুলো জানবেন, তাঁরাই সাদরে গ্রহণ করবেন তাদের। কেননা সেই বাণী-গুলির আন্তরিক শুভ কামনা এখনো তেমনি অম্লান হ'য়ে আছে, যেমন ছিল ছ'শ' বছর আগে।

মীরাবাঈ

উত্তর ভারতে মীরাবাঈয়ের নাম ঘরে ঘরেই শোনা যায়। তিনি ছিলেন এমন একজন কবি যাঁকে, সকলেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধকদের অন্যতম বলে মেনে নিয়েছেন। তাঁর জীবনেতিহাসের ঘটনাগুলি এখনো রহস্যাবৃত হ'য়ে আছে। ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্ম-সময়, বিবাহ, মৃত্যু, এমনকি তাঁর স্বামীর নামের বিষয়েও একমত নন। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করেন যে তিনি মেরতার রাঠোর বংশের একজন রাজকুমারী ছিলেন। বর্তমান কালে অবশ্য কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি মীরার বিষয়ে নানা কাহিনীকে একসূত্রে গেঁথে একটা জীবনী দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন।

এই বিবরণ অনুসারে জানা যায় মীরাবাঈ রাজস্থানের মেরতা জেলার চৌকরি গ্রামে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা রতন সিংহ ছিলেন যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধাজি রাঠোরের এক বংশধর রাও দুধাজির দ্বিতীয় পুত্র। দশ বৎসর বয়সে মীরা মাতৃহীনা হন। তারপর তিনি চলে এলেন মেরতাতে তাঁর পিতামহের কাছে। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে দুধাজির দেহান্তরের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রম দেও উত্তরাধিকারী হ'য়ে চিতোরের রাণা সঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ভোজরাজের সহিত তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রী মীরার বিবাহ দেন। এই বিবাহে মীরার সামাজিক মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কারণ চিতোরের রাণা তখন ছিলেন হিন্দু রাজাদের নেতৃস্থানীয়। কিন্তু অদৃষ্ট মীরার অনুকূল ছিল না। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি তাঁর পিতা, স্বামী এবং শ্বশুরকে হারান।

অন্য কোনো রাণী তাঁর অবস্থাতে পরবর্তী জীবন দুঃখের সমুদ্রে বিপদমগ্ন হ'য়ে কাটাতেন, কিংবা সেকালের প্রথা অনুসারে ভবিষ্যৎ দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বাসনায় স্বামীর সহমরণে গিয়ে সতী হতেন। কিন্তু মীরা বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বলে এই শোকগুলিকে স্থির চিত্তেই গ্রহণ করলেন। শোনা যায় তিনি সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বারকায় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন।

এই ভক্ত তাপসীর আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম-জীবনের বিষয়ে আলোচনার আগে

তাঁর সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থার বিষয়ে জেনে নেওয়া ভাল। কারণ এগুলিই মীরার আধ্যাত্মিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

মীরার জন্মের সময়ে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। আফগান (পাঠান) সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যাওয়ায় মুসলমান আমীর-ওমরাহগণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে নিজেদের জন্যে ছোট ছোট রাজ্য সংগ্রহ করার আশায় পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হ'য়েছিলেন। রাজপুতগণও উত্তর ভারতে আবার আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁদের মধ্যে কোনো একতাবোধ ছিল না এবং সর্বদাই তাঁরা অন্তর্কলহে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। এই সময়ে মোগল রাজা বাবর ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের আশায় দেশ আক্রমণ শুরু করেন। মানুষের জীবনের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা সবই তখন অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে। মীরা দেখলেন চারি দিকে কেবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম—রাজপুতদের মধ্যে, রাজপুত আর মুসলমান আমীরদের মধ্যে, আর আত্মীয়-বন্ধুসহ সকলেরই ঘরে ঘরে কেবল মৃত্যু আর হাহাকার। এই দেখে মীরার চিত্ত ব্যথিত হ'য়ে উঠল। তিনি তাঁর সেই অল্প বয়সেই সংসারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন না,—এই ধ্বংস আর ঘৃণায় কি লাভ; আর কেনই বা ব্যক্তিগত উচ্চাশার পায়ে কর্তব্যবুদ্ধি, শান্তি এবং প্রেমকে বলি দিয়ে মানুষের জীবনকে এমন মূল্যহীন করে ফেলা হচ্ছে। তিনি তাই তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে থেকেও আগন্তুকের মতো অসহায় বোধ করতে লাগলেন, এবং প্রেম ও শান্তিপূর্ণ কোনো আশ্রয়ের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। এই আশ্রয় তিনি পেলেন বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে।

আফগান শাসনের প্রথম দিকে হিন্দুদের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'য়েছিল এবং যেসব অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁদের জীবনধারণ করতে হ'য়েছিল তাতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে ওঠে। তাঁদের সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে তাঁরা স্বকীয় ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক বিধির বাইরে থেকেও বহু অন্ধবিশ্বাস ও কু-প্রথার আমদানী করেছিলেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হ'য়েছিল। কিন্তু এইসব বিধি-নিষেধ ও অবমাননা সত্ত্বেও হিন্দুদের আত্মিক তেজ যে একেবারে পরাজয় স্বীকার করেছিল তাও নয়। হিন্দু-প্রতিভা স্তম্ভিত ও খর্বিত হ'য়ে নতুন তেজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠল। একে একে রামানন্দ, চৈতন্যদেব, বল্লভাচার্য, কবীর, নানক, এবং অন্যান্য ধর্মসংস্কারক ও সাধকগণ আবির্ভূত হ'য়ে হিন্দুদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বন্ধ্যা হ'য়ে যায়

নি। তাঁরা জনসাধারণকে এই বোধে সঞ্জীবিত করলেন যে, ঈশ্বর এক এবং তিনি সর্বশক্তিমান ও শরণাগতের রক্ষক হ'লেও, দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণের জন্যে যুগে যুগেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সাযুজ্য লাভের উপায় হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি দ্বারা সাধনা। এই সংস্কারকগণ হিন্দুদের আরো উপদেশ দিলেন যে, ধর্মবর্ণ-অভেদে সমস্ত মানুষের জীবনের প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধাই ঈশ্বর লাভের প্রাথমিক শর্ত। বৈষ্ণব-উপদেশের এই বিশেষ শিক্ষাটির ফলে হিন্দুদের মনে মুসলমান এবং অস্পৃশ্য হিন্দুদের প্রতিও প্রীতির ভাব এনে দিল, এবং এরপর থেকে তাঁরা উভয় শ্রেণীর সঙ্গেই মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে সচেষ্ট হলেন।

এইসব বৈষ্ণব শিক্ষার মধ্যেই মীরাবাঈ তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলেন। তিনি প্রেম ও করুণার প্রতিরূপ ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন ক'রে কৃষ্ণরূপে তাঁকে আরাধনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণের অনেক নাম, কিন্তু মীরা তাঁকে ভালবাসলেন 'গিরিধর নাগর' নামে। এই বিশ্ববন্দিত ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেম এতোই মহৎ হ'য়ে উঠেছিল যে সর্বসময়ই তিনি তাঁর 'ভজন' গান ক'রে এবং নানা আরাধনা ক'রে অতিবাহিত করতেন। যখন তাঁর জননী তাঁকে স্বাভাবিক সাংসারী জীবন-যাপন ক'রে রাজপরিবারের রীতি মেনে চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন মীরা বলেছিলেন—

"মাগো, গিরিধর গোপাল আমাকে স্বপ্নে বিবাহ করেছেন। আমি লাল-হলুদ ওড়না পরেছিলাম। আমার হাত আলতায় রাঙানো। যমুনার কূলে বাঁশি বাজাতেন এই রাখালরাজা, এঁর জন্যে আমার প্রেম সেই ছেলেবেলা থেকে। এ প্রেম কি ত্যাগ করা যায়। এযে শাশ্বত!"

কুমার ভোজরাজের সঙ্গে বিবাহের পর কৃষ্ণের প্রতি মীরার প্রেম না কমে বেড়েই গিয়েছিল। উপাসনাতেই তিনি তাঁর বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করতেন। তিনি সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতেন, এবং তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। এতে তাঁর শ্বশুর এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে উঠতেন। তাঁকে তাঁর পথ বদলে রাজপরিবারের প্রথা মেনে চলতে আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু সে কথায় তিনি কর্ণপাত করলেন না। তখন রাণা তাঁর চলাফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলেন এবং সাবধান হ'তে বলে দিলেন। মীরা ব্যাপারটা এইভাবে বিবৃত করেছেন : "এই গৃহের সমস্ত প্রিয়জনই আমার সাধুসঙ্গ লাভে এবং উপাসনায় বাধা দিচ্ছে। শৈশব থেকেই মীরা গিরিধর নাগরকে তাঁর বন্ধু করেছে; এই সম্পর্ক চিরঅক্ষয় থেকে দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

যখন মীরা বিধবা হলেন তাঁর শ্বশুর রাণা সঙ্গ ভাবলেন মীরাকে শেষ ক'রে দেওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। তাই তিনি তাঁকে 'সতী' হ'তে বলে পাঠালেন। কিন্তু সাধিকা মীরা পরমাত্মার সঙ্গে স্বেচ্ছা বিবাহে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন; তাঁর অখণ্ডত্ব এবং সর্বব্যাপিত্বে এতই স্থির-বিশ্বাস পোষণ করতেন যে শ্বশুরকে বলে পাঠালেন যে,

"মীরা হরির রঙে নিজেকে রঞ্জিত করেছে। আর সমস্ত রঙ্-ভালবাসাই সে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আমি গিরিধরের গুণগান করব এবং 'সতী' হব না। কারণ হরিতেই আমার চিত্ত ভরে আছে। জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সম্পর্ক এখন আর নেই। রাণা, এখন শুধু আমি তোমার প্রজা, এবং তুমি আমাদের রাজা।"

তাঁর শ্বশুর রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর কুমার রতন সিংহ রাণা হলেন। কিন্তু তিনিও অকালে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর পর কুমার বিক্রমাদিত্য চিতোরের রাণা হলেন। তিনি মীরাকে সাধু সঙ্গ থেকে নিবৃত্ত হ'তে এবং কৃষ্ণের মূর্তির সামনে নৃত্যগীত বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। এই বিধিনিষেধগুলি এতোই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হ'য়েছিল যে মীরার পক্ষে রাজপ্রাসাদে আরাধনা করা অত্যন্তই কঠিন হ'য়ে উঠল। ফলে তিনি সাধারণের জন্যে নির্দিষ্ট মন্দিরে গিয়ে তাঁর ভক্তি নিবেদন করতে লাগলেন। তাঁর দিব্যানন্দের সময়ে তিনি আত্মবোধ লুপ্ত হ'য়ে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন। এই অবস্থায় তিনি কৃষ্ণের মূর্তির সামনে নৃত্যগীত করতেন। মাঝে মাঝেই তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে যেতেন। মেবারের লোকেরা এই রাণী তাপসীকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতে লাগল, এবং ক্রমে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পণ্ডিত ও সাধুব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এতে রাণা, তাঁর ভ্রাতা ও আত্মীয়গণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। কেননা তাঁরা রক্তাক্ত সংগ্রাম, দুর্দশা ও স্বল্পস্থায়ী শান্তি ছাড়া আর কিছুই বুঝতেন না। কাজেই রাণা মীরাকে অশেষ-ভাবে নির্যাতন করতে লাগলেন। তাঁকে তাঁর নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ ক'রে রেখে কাঁটার বিছানায় শুতে দেওয়া হত। তাঁকে ঝুড়ির ভিতর সাপ লুকিয়ে রেখে উপহার পাঠান হত। তাঁকে বিষ প্রয়োগ করা হল। সংক্ষেপে, এমন অত্যাচারই নেই যা এই তরুণী তাপসীর উপর প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু ঈশ্বর যাঁদের রক্ষা করেন, কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে পারে না। রাণা যে সব নারী-পুরুষকে মীরার উপর অত্যাচার চালানোর জন্যে পাঠিয়েছিলেন, তাদের সকলেরই হৃদয়ে পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের বশে এনে ফেললেন মীরা। এতই বিরাট ছিল তাঁর আত্মিক ক্ষমতা। রাণার কাছ থেকে যে সব দুর্ব্যবহার

পেয়েছিলেন সে বিষয়ে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন তিনি। একটি এই রকম—"মীরা কৃষ্ণের আরাধনা ক'রে অত্যন্ত আনন্দিত। রাণা সর্পপূর্ণ পেটিকা পাঠিয়েছিলেন। মীরা স্নান-ধ্যান ক'রে সেই পেটিকা খুলে দেখল, কৃষ্ণ নিজেই বসে আছেন ভিতরে। রাণা একপাত্র বিষ পাঠিয়ে দিলেন; স্নান-ধ্যান ক'রে মীরা তা পান করল, কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় তা হ'য়ে গেল অমৃত। রাণা মীরার শয়নের জন্যে কণ্টক শয্যা পাঠালেন, তবু সন্ধ্যাকালে মীরা যখন তাতে শয়ন করল তখন তা হ'য়ে গেল পুষ্পশয্যা। মীরার প্রভু সব বিপদ থেকেই তাঁকে রক্ষা করলেন, কেননা তিনি পরম কারুণিক সংরক্ষক। মীরা সানন্দ ভক্তিতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে যে প্রভুর কাছেই সঁপে দিয়েছে নিজেকে।"

ঈশ্বর মীরাকে রক্ষা করেছিলেন, তাই তিনি সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন। কিন্তু মীরার চিত্তে সুখ ছিল না। ভক্তজীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় যে চিত্তসৌম্য এবং শান্তি তাই থেকেই বঞ্চিত ছিলেন তিনি। তাছাড়া দীর্ঘকাল অত্যাচারে তিনি ক্লান্তও হ'য়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি চিতোর ত্যাগ ক'রে তাঁর পিতৃব্যের রাজ্য মেরতায় যাবেন বলে স্থির করলেন। যাবার আগে তিনি স্পষ্ট দৃঢ় ভাষায় রাণার গৃহের লোকজনদের জানালেন;

"রাণা যদি রুষ্ট হন, কী আর তিনি আমার করতে পারবেন? বন্ধু, আমি গোবিন্দের গুণগানই করতে থাকব। রাণা যদি রুষ্ট হন, আমি তাঁর রাজ্যে স্থান পাবো, কিন্তু ঈশ্বর বিরূপ হ'লে কোথায় যাব বন্ধু? আমি সংসারের নিয়মকানুন মানি না, এইবার স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে দেব। ঈশ্বর-নামের বৈঠা বেয়ে আমি সংসারের মায়া-সমুদ্র পার হ'য়ে যাব। মীরা সর্বশক্তিমান গিরিধরের শরণ নিয়েছে, তাঁরই চরণকমল আঁকড়ে ধরে থাকবে, বন্ধু।"

এরপর মীরা মেরতায় চলে এলেন। তাঁর পিতৃব্য ভক্ত-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্যের রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের পর মীরাকে রাজপুতনা ত্যাগ ক'রে চলে যেতে হল। তিনি বৃন্দাবন, মথুরা ইত্যাদি স্থানে তীর্থভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন। শেষে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত দ্বারকায় গিয়ে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করলেন। পরবর্তী জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি কৃষ্ণের মন্দিরে অতিবাহিত ক'রে, প্রভুর চরণেই দেহত্যাগ করেন।

প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্তের মতোই মীরাবাঈ সর্বান্তঃকরণে এবং পবিত্র মনে ঈশ্বরকে ভজনা করতেন। তিনি নিজেকে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী বৃন্দাবনের গোপী বলে মনে করতেন। সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

জীবনে তাঁর একটি মাত্র কামনা ছিল, তিনি যে প্রিয়তম ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁরই প্রীতিসাধন করা। অন্তর তাঁর সর্বদাই প্রভুর সঙ্গে মিলনের কামনায় ব্যাকুল হ'তে থাকত। ফলে তাঁর রচনায় সেই সব গানই বেশী দেখা যায় যেখানে তিনি তাঁর প্রিয়তমের গুণগান ক'রে নিজের বিরহ যন্ত্রণার কথা বলেছেন। নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

"ওগো, প্রিয়তম, ওগো প্রভু, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না। তুমি জগতের ঈশ্বর, আর আমি শক্তিহীনা নারী। তুমিই আমার জীবনের মুকুট। আমি গুণহীনা, আর তুমি জগতের ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান। একবার তোমার শরণ নিয়ে আর কোথায় আমি যাব? তুমিই আমার অন্তরের দীপ্তি। মীরা বলে, প্রভু, আর আমার কেউ নেই। এই একবার শুধু আমাকে রক্ষা কর।"

এবং ঃ

"মাগো, হরি-বিনে কী করে আমি বাঁচি? আমি যে ঘুণে-ধরা কাঠের মতো হ'য়েছি, আমি পাগল হ'য়ে গেছি। লতাপাতা ঔষধে আমার আর কাজ দেয় না, কেননা আমি হরির প্রেমে পাগল হ'য়ে গেছি।"

আর তারপর ঃ

"তোমার কারণে আমি সব সুখ ছেড়েছি। কেন তুমি আমাকে বসিয়ে রাখো। বিরহের আগুন বুকের মধ্যে জ্বলছে আমার, এস তুমি, তা নিভিয়ে দাও। এখন তো তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। দয়া করে তবে ডেকে পাঠাও, প্রভু।"

"স্বামীন্, মীরা সারাজীবন তোমারই দাসী ছিল। এবার তাকে তোমার নিজের মধ্যে টেনে নাও।"

পরিশেষে মীরার অন্তরে কৃষ্ণের মিলনের কামনা শান্ত হ'য়ে এলো। কেন না ভক্তজনের বাঞ্ছিত সেই ঈশ্বরে মিলনোপলব্ধির পর বিরহ যন্ত্রণা দূর হ'য়ে তাঁর অন্তরে শান্তি নেমে এসেছিল। তারপর থেকে ভিন্ন সুরে গান ধরেছিলেন তিনি। যেমন ঃ

"ওগো সর্বব্যাপী এক, তোমারই রঙে রঞ্জিত করেছি আমি নিজেকে। অন্য নারীদের প্রেমিকেরা যখন বিদেশে থাকে, চিঠির পর চিঠি লেখে তারা। কিন্তু আমার প্রিয়তম আছেন আমার হৃদয়ে। তাই আমি দিনরাত আনন্দে গান গাই।"

যখন মীরা সিদ্ধিলাভ করলেন এবং তাঁর নাম-খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন তাঁর স্বজন ও আত্মীয়েরা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—

"আমি প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী আছি। কেন আমি এতে লজ্জা পাব যে আমার

প্রিয়তমের জন্যে আমি প্রকাশ্যে নৃত্য করেছি। আমি দিনের ক্ষুধা, রাত্রি বিশ্রাম ও ঘুম হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন প্রেমের সেই তীক্ষ্ন বাণ আমাকে বিদ্ধ করে বেরিয়ে গেছে, তাই আমি সেই পরমজ্ঞানের মহিমা পান করি। আর তাই আমার পরিবার-পরিজনেরা মধুর আশায় ভ্রমরের মতো আমাকে ঘিরে ধরেছে। গিরিধরের দাসী মীরা আর উপহাসের পাত্রী নয় এখন।”

মীরা অঁর মাতৃভাষা মাড়ওয়ারী হিন্দীতেই তাঁর গানগুলি রচনা করেছিলেন, কিন্তু কোনো কোনো রচনায় প্রচুর গুজরাতী ও পাঞ্জাবী শব্দ দেখা যায়। সরল ও অকপট ভঙ্গিতে রচিত এই গানগুলি আবেগ ও প্রাণস্পন্দনে ভাস্বর। তাঁর সৎচিন্তা ও ঐশী ভালোবাসা যে রকম স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তিনি প্রকাশ করেছেন তাতেই যেন এর সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। মীরা ছাড়া আর কে এই ঈশ্বরানুরাগকে এতো সহজে প্রকাশ করতে পারতেন ?

“হে হরি, তুমি আমার জীবন ও প্রাণের আশ্রয়। তুমি ছাড়া এ ত্রিভুবনে আর কেউই নেই আমার। সারা পৃথিবী খুঁজেছি আমি, তুমি ছাড়া আর কেউই আমার কাম্য নয়। মীরা বলে, আমি তোমার দাসী। আমাকে ভুলো না, এই শুধু অনুরোধ।”

মীরা ছিলেন জন্ম-কবি এবং তিনি তাঁর এই কবিত্ব শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেমের কাব্যরূপায়নের কাজে। নিচে তাঁর ঈশ্বর-বিরহের বিষয়ে একটি হৃদয়স্পর্শী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল—

“ওগো বন্ধু, প্রেমে আমি পাগল হ’য়ে গেছি, কেউ আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারবে না। কেবল যে আহত হ’য়েছে কিংবা যে আঘাত দিয়েছে সেই আহতের বেদনা বুঝতে পারে। জহুরীই কেবল অন্য জহুরীর কষ্ট বুঝতে পারে, কিংবা সেই পারে যার জহরৎ আছে। ক্ষুরের ওপর আমার শয্যা পাতা হ’য়েছে; কী ক’রে ঘুমাব আমি? আমার শয্যা আছে স্বর্গে; আমার কি সৌভাগ্য হবে তাঁকে দেখার? ব্যথাতুর হৃদয়ে বন থেকে বনে আমি ঘুরে বেড়াই। কোনো চিকিৎসকের সাক্ষাতই আমি পেলাম না। মীরার ব্যথা যন্ত্রণা উবে যাবে তখনি যখন প্রিয়তম নিজে হবে তার চিকিৎসক।”

সংসারে মীরার জীবনের লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে তিনি সুন্দর ভাবে বলেছেন—

“গিরিধর গোপাল আমারই, আর কারো নয়। সেই শিখিচূড়াধারীই আমার প্রভু। পিতামাতা, ভ্রাতা, স্বজন এরা কেউই আমার নয়। আমি পরিবারের গর্ব দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি, কে আমার কী করবে? সর্বদা সাধুসঙ্গ ক’রে আমি সংসারের

লাজ-লজ্জা অতিক্রম ক'রে গেছি। আমি আমার নানা রঙের ওড়না ছিঁড়ে কম্বলে শরীর ঢেকেছি। মুক্তা প্রবাল ফেলে দিয়ে আমি বনফুলের মালা পরেছি। আমার চোখের জলে আমি প্রেমের লতা অভিসিঞ্চিত করেছি। এখন যখন সে লতা ছড়িয়ে গিয়েছে চারিদিকে, তার ফল হবে আনন্দের আধার। পরম প্রেমে আমি দুধকে ঘেঁটে ঘেঁটে ননী তুলে নিয়েছি, যে চায় সে বাকী যা পড়ে রইল তা নিয়ে যেতে পারে। ভক্তির জন্যেই আমি জন্মেছিলাম, কিন্তু এ জগৎ তার রূপে আমাকে বন্দী করে ফেলেছিল। দাসী মীরা বলে, হে প্রভু গিরিধর, আমাকে এখন রক্ষা কর।"

মীরার গিরিধর গোপাল হচ্ছেন চিরন্তন সুন্দর নৃত্য-শিল্পী, যিনি ধার্মিকদের সুখ দেন এবং ভক্তদের রক্ষা করেন। মীরা সরল ভাষায় সুন্দরভাবে তাঁর বর্ণনা করেছেন—

"হে নন্দনন্দন, আমার চোখে ধরা দাও তুমিঃ মোহন তোমার রূপ, কালো তোমার রঙ্, চোখ দুটি কী বিশাল! আর কী সুন্দরই না দেখায় তোমার মধুক্ষরা ঠোঁটে ঐ বাঁশী। বুকে দোলে তোমার বৈজয়ন্তী মালা। কোমরে তোমার ঘুঙুর আর পায়ে বাজে নূপুর। মীরার প্রভু সাধুদের দেন সুখ, আর ভক্তদের দেন আশ্রয়।"

বিভিন্ন রাগে-বাঁধা কয়েক শ' গান আছে মীরার। এ ছাড়াও শোনা যায় তিনি "গীত গোবিন্দ" এবং "রাগগোবিন্দে"র ভাষ্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ গুলির কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

মীরার মতো এতো খ্যাতি আর কোনো কবিই লাভ করেন নি। তাঁর গানগুলির জনপ্রিয়তা অনন্যসাধারণ, এবং আজ পর্যন্তও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই সেগুলি গেয়ে থাকেন।

এমনি ছিলেন মীরা, যিনি রাজরাণী হওয়া সত্ত্বেও এ সংসারের সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করে তাঁর দেবদয়িতের গুণগান করেই জীবন কাটিয়ে গেছেন। ভারতবর্ষের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নারী তাপসী, এবং চিরদিন তিনি স্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন।

অষ্টম অধ্যায়

মহারাষ্ট্রীয় তাপসীগণ

'নবনীতা' নামে মারাঠী পদ সংগ্রহে কেবল তিনজন মহারাষ্ট্রীয় তাপসীর নাম উল্লিখিত হ'য়েছে—জনাবাঈ, রাজাঈ এবং গণাঈ। জনাবাঈ তাঁর গুরু বিখ্যাত সাধক নামদেবের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বেশী বিখ্যাত। এই তিনজন তাপসীর জীবনীই বিশদভাবে মহীপতি রচিত "ভক্তবিজয়ে" বিবৃত হ'য়েছে। কিন্তু বর্তমান পাঠকেরা তাঁদের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন।

জনাবাঈ বিখ্যাত হ'য়েছিলেন পন্ধরপুরের তাপসী হিসাবে, এবং তাঁর আরাধনার ঈশ্বর ছিলেন "প্রভু বিট্‌ঠল"। গোদাবরী তীরে গঙ্গাখেদা নামে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর পিতা দামাজি বিট্‌ঠলের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন শূদ্র। কিন্তু তাঁর ঈশ্বরানুরাগ ছিল খুব প্রবল এবং প্রতি বছরই তিনি তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পন্ধরপুরে যেতেন। জনাবাঈয়ের মাতার নাম ছিল করুণ্ড। ছয় বছর বয়সে জনাবাঈয়ের পিতা তাঁকে নামদেবের পিতার কাছে নিয়ে যান, এবং সারাজীবন তিনি সেই বাড়ীতেই পরিচারিকার কাজ ক'রে কাটান। সেই জন্যেই তিনি নিজেকে বলতেন "দাসী জনী"। নামদেবের পিতা দামাশেটি ছিলেন দর্জি এবং তিনিও পন্ধরপুরের শ্রীবিট্‌ঠলের একজন ভক্ত ছিলেন। প্রতি বছর পন্ধরপুরের তীর্থযাত্রার সময় তিনি জনাবাঈকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। জনাবাঈয়ের বিষয়ে অনেক দৈব ঘটনার কথা শোনা যায়। যেমন এই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তিনি নিরক্ষরা থাকা সত্ত্বেও প্রভু বিট্‌ঠলের ওপর এতোগুলো শ্লোক রচনা করেছেন। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—"ঈশ্বর শুধু তোমার অন্তরতম মনোভাবের দিকেই লক্ষ্য রাখেন, এবং তোমার একাগ্র সাধনার টানে তিনি স্বর্গ ছেড়ে এসেও তোমাকে দর্শন দেবেন। তিনি পুণ্ডলিককে দর্শন দিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বসার জন্যে পুণ্ডলিক তাঁকে একখানা ইঁট এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বসলেন না। তিনি আনন্দের সমুদ্র। যাঁকে তিনি করুণা করেন তাঁর কাছে সমস্ত জগৎ সংসারই করুণার আধার। এসব ব্যক্তিরা কোনো প্রতিদান আশা করেন না। এঁদের ওপর যে সব দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে, ঈশ্বর নিজেই সেগুলো সহ্য করেন, এবং সর্বদা তাঁদের কাছে থেকে সব রকম বিপদ ও যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। তিনি জাতিভেদের দ্বারা বিচালিত হন না। 'চোখ মেলা' ছিলেন

পতিত শ্রেণীর লোক, কিন্তু হৃদয়ে তাঁর ভক্তি ছিল, তাই ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞাবহ হ'য়ে একত্রে আহার করতে লাগলেন। 'জনী'র হাসি পায় এই ভেবে যে, 'চোখ মেলা' ঈশ্বরকেও 'পতিত' করে ফেলেছিলেন।" অনুমান করা হয়, জনাবাঈ তিন শ' কবিতা রচনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীঅজগাওঙ্কর মনে করেন, এর মধ্যে মাত্র পঁচিশটি জনাবাঈয়ের রচনা। জনাবাঈ যে কেবল একজন অন্ধ ভক্তই ছিলেন তা নয়, ব্যক্তি আত্মার সঙ্গে বিশ্ব-আত্মার সম্পর্ক এবং এ সংসারের মায়ার বিষয়েও সচেতন ছিলেন তিনি।

শ্রীঅজগাওঙ্করের গ্রন্থে রাজাঈ এবং গণাঈকে তাপসী বলে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু 'নবনীতা'য় তাঁদের কিছু সংখ্যক কবিতা দেখা যায়।

রাজাঈ ছিলেন নামদেবের পত্নী এবং গণাঈ ছিলেন তাঁর জননী। ঈশ্বর ছাড়া এ জীবনে নামদেবের আর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন বলেই ঐ দুই নারী তাপসী বলে পরিচিত হ'য়েছিলেন। নামদেব পন্ধরপুরের বিট্‌ঠল প্রভুর একজন বড় ভক্ত ছিলেন। রাজাঈ এবং গণাঈয়ের নামে প্রচলিত কয়েকটি গদ্য কবিতা ইতস্তত ভাবে চোখে পড়ে। সংসারের কর্ত্রী এবং বধূ হ'লে যা হয়, এই দুই নারী নামদেবকে সংসারকর্মে অবহেলায় যথাসাধ্য বাধা দিতেন। মনে হয় নামদেব পাঞ্জাব সহ সারা ভারতেই ভ্রমণ করেছিলেন, প্রথম জীবনে তিনি খুব উচ্ছৃংখল প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে পন্ধরপুর মন্দিরে আগত জ্ঞানেশ্বর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে এসে নিজেকে সংশোধন ক'রে সাধক হয়ে ওঠেন।

মহারাষ্ট্রের সাধকবৃন্দের প্রথম পুরুষ ছিলেন মহাসাধক জ্ঞানেশ্বর। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভগবদ্‌গীতার ওপর 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে একখানি ভাষ্য রচনা করেন। 'জ্ঞানেশ্বরী'র আগেও মারাঠীতে প্রচুর পরিমাণে 'মহানুভাব' সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু 'মহানুভাব' সম্প্রদায় ছিল গুহ্যরীতির সাধক, এ জন্যে এবং অন্যান্য কারণে এদের সাহিত্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করতে পারে নি।

অজগাওঙ্করের মতে মহারাষ্ট্রে প্রথম নারী সাধিকা ছিলেন মহদাইসা, বা মহদম্বা, এবং তিনি ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বর্তমান-ছিলেন। 'মহানুভাব' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা চক্রধরের নানা রকম দৈবশক্তি ছিল। মহাদাইসা ছিলেন তাঁরই শিষ্যা। তাঁর কবিতা বর্তমান মারাঠী পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু এর টীকা আছে।

পরবর্তী সাধিকা হলেন জ্ঞানেশ্বরের ভগ্নী মুক্তাবাঈ। তিনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন, এবং অনেকগুলি কবিতা রচনা ক'রে গেছেন। মারাঠী সাধক-

বৃন্দের মধ্যে নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, সোপান এবং মুক্তাবাঈ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেশ্বরের কনিষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন বলেই মুক্তাবাঈ সাধিকা হ'য়ে ওঠেন। তিনি বেদান্ত খুব ভালোভাবেই পাঠ করেছিলেন, আর তাঁর রচনাতেও বৈদান্তিক আলোচনার প্রাচুর্য রয়েছে। মনে হয় তিনি যোগশাস্ত্রেও বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। এবং তিনি ক্রমান্বয়ে জ্ঞানেশ্বরের মতোই মচেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, গৈহিননাথ, এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবৃত্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মুক্তাবাঈ এবং তাঁর তিন ভাইয়ের জীবনী সংক্ষিপ্ত হলেও, ঘটনাবহুল ছিল। পৈঠানের কাছে আপেগাঁও নামক স্থানে ত্র্যম্বকপন্ড্ বলে একজন লোক বাস করতেন। তিনি যৌবনে নামজাদা যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু পরে সাধু গোরক্ষনাথের ভক্ত হন। ত্র্যম্বকনাথের গোবিন্দ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁর স্ত্রী নিরাবাঈয়ের গর্ভে বিট্ঠল নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল থেকেই বিট্ঠলের ধর্মজীবন এবং ব্রত উপবাসাদির দিকে ঝোঁক ছিল। একবার তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে তিনি পুণার নিকটে আলন্দীতে আসেন। সেখানে সিধোপন্ত নামে এক ভদ্র-লোকের কন্যা রুক্মিণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরেও তিনি ধর্মসাধনায় ব্যাপৃত থাকতেন। ফলে রুক্মিণী সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন যাতে স্বাভাবিক সংসারী জীবনের দিকে স্বামীর কিছুটা লক্ষ্য আসে। এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ বিট্ঠলপন্ত আলন্দী ত্যাগ ক'রে কাশীতে চলে এলেন। এবং সেখানে এসে মহাসাধু রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে জানালেন, তিনি একা মানুষ, তাঁর স্ত্রীও নেই, সন্তানাদিও নেই। ফলে রামানন্দ তাঁকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত ক'রে নতুন নামকরণ করলেন চৈতন্যাশ্রম। কালক্রমে এ খবর তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন রুক্মিণী, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের চরণে মতি রেখে আশা ছাড়লেন না। বারো তেরো বছর পরে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে রামানন্দ স্বয়ং আলন্দীতে এসে মন্দিরের মধ্যে রুক্মিণীর কাছ থেকে তাঁর স্বামীর সংসার ত্যাগের কথা জানতে পেলেন। রামানন্দ এতে অত্যন্তই ব্যথিত বোধ করলেন। তারপর কাশীতে ফিরে এসে তিনি চৈতন্যকে স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে আদেশ দিলেন, কেন না মিথ্যা কথা বলে সন্ন্যাস পেয়েছেন তিনি। তাছাড়া স্ত্রী থাকা কালে সন্ন্যাসে কোনো অধিকারও ছিল না তাঁর। কাজেই চৈতন্য আলন্দীতে ফিরে এলেন। কিন্তু আলন্দীর ব্রাহ্মণেরা তাঁর এই সন্ন্যাস ছেড়ে সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবেশকে মোটেই সহ্য করতে পারলেন না। ফলে বিট্ঠল তাঁর স্ত্রী এবং তিন পুত্র, নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব ও সোপান এবং কন্যা মুক্তাবাঈকে নিয়ে সমাজচ্যুত হলেন। তারপর, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণদের অভিলাষ পূর্ণ করতেই বোধহয়,

বিট্‌ঠল ছেলে-মেয়েদের রেখে এসে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করলেন। ব্রাহ্মণদের মতে বিট্‌ঠলের মহাপাতকের এই ছিল প্রায়শ্চিত্ত। কাজেই পিতৃমাতৃহীন নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, সোপান এবং মুক্তাবাঈ নির্বান্ধব অবস্থায় সমাজচ্যুত হলেন। এই সময় নিবৃত্তির বয়স ছিল দশ, জ্ঞানদেবের আট, সোপানের ছয় এবং মুক্তাবাঈয়ের চার বৎসর। কালক্রমে জ্ঞানদেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, মেধা এবং ঐশী ক্ষমতায় ব্রাহ্মণগণ কিছুটা শান্ত হ'য়ে তাঁদের আলন্দীতে বাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখনও তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ-সমাজের বাহিরে, অর্থাৎ কারো সঙ্গে তাঁদের কোনো সংস্রব ছিল না, বিবাহ সম্পর্কও ছিল না। কাজেই তাঁরা আলন্দী ছেড়ে আমেদনগর জেলার নিউয়েজ নামক স্থানে চলে গেলেন। নিবৃত্তি সম্ভবত গৈহিননাথের কাছ থেকে নাথপন্থে দীক্ষা নেন। তিনি জ্ঞানদেবকে দীক্ষা দেন, এবং সোপান ও মুক্তাবাঈ সাধক বলে পরিচিত হন জ্ঞানদেবের সঙ্গে তাঁদের একান্ত মেলামেশার ফলে। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সেই মুক্তাবাঈ অনেকগুলি পদ রচনা করেছিলেন। জ্ঞানদেব চূড়ান্ত ঈশ্বরোপলব্ধির অবস্থায় জীবন্ত সমাধি লাভ করেন। এখনো লোকে আলন্দীতে তীর্থ ভ্রমণে এসে এই সমাধিস্থল দর্শন করেন।

মুক্তাবাঈয়ের পদাবলীর সাক্ষ্যে অনুমান করা যায় তিনি বেদান্ত দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, “একমাত্র তিনিই সাধু, যাঁর দয়া ও ক্ষমা আছে এবং যাঁর মনে লোভ ও অহঙ্কারের স্থান নেই। এমন ব্যক্তি আছেন যাঁরা সত্যই সর্বত্যাগী। তাঁরাই কেবল ইহকালে এবং পরকালে সুখী হতে পারেন।” তিনি আরো উপদেশ দিয়েছেন, “যাঁর হৃদয় পবিত্র, ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকেন না।” অন্য একটি পদে তিনি বলেছেন, “বাজারে তাঁকে পাওয়া যায় না, টাকা দিয়ে তাঁকে কেনা যায় না। এই হ'ল সৎজীবন-যাপনের ব্যাপার। কে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ বলে দিতে পারে? ঈশ্বরকে নিজেই খুঁজে নিতে হয়।”

মুক্তাবাঈ ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভেরুলের নিকট মনগাঁও নামক স্থানে পূর্ণ সমাধি লাভ করেন।

শ্রীঅজগওঙ্কর পরবর্তী যে সাধকের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন জনী, যাঁর কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তিনি ছিলেন শ্রীবিট্‌ঠলের ভক্ত।

এরপর উল্লিখিত হ'য়েছে তাপসী সয়রাবাঈয়ের নাম। তিনি মহর নামে এক অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কন্যা ছিলেন। বিখ্যাত সাধক চোখমেলা ছিলেন তাঁর স্বামী। তিনিও একজন বড় ভক্ত সাধিকা ছিলেন। স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ

ক'রে তিনিও সিদ্ধিলাভ করেন। গদ্য কবিতায় তিনি তাঁর উপলব্ধির কথা প্রকাশ করে গেছেন। অস্পৃশ্য সাধু চোখমেলার নাম এখনো যথেষ্ট ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। সয়রাবাঈ অনেকগুলি পদ রচনা করে গেলেও মাত্র বাষট্টিটিই এখন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন "শরীরই কেবল অপবিত্র বা কলুষিত হতে পারে, কিন্তু আত্মা পবিত্র জ্ঞানের মতো সদানির্মল। মালিন্যের মধ্যেই শরীরের জন্ম, কাজেই পবিত্রদেহের কথা কে বড়াই করবে? শরীরে অনেক দোষ আছে। কিন্তু শরীরের দোষ শরীরেই থাকে। আত্মা এর দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। চোখ মেলার মহরী স্ত্রী এই কথাই বলে।"

তিনি বাৎসরিক তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে নিয়মিত পন্ধরপুরে যেতেন। তাঁর এবং তাঁর স্বামীর ওপর অনেক নির্যাতন করা হত। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস বা মনের শান্তি নষ্ট হ'তে দেন নি। ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণের অত্যাচারের ওপর তাঁরাই জয়ী হলেন। মঙ্গলবেদাতে চোখমেলার সমাধিস্থানটির সংস্কার করা হচ্ছে এখন।

চোখমেলার কনিষ্ঠ ভগ্নী নির্মলার নাম এর পরে উল্লেখ করা হ'য়েছে। চোখমেলার সঙ্গে সাহচর্য ছিল বলে সয়রা যেমন সাধিকা হন, সেই রকম অতি স্বাভাবিক ভাবেই নির্মলাও সাধিকা হন। সেই কালে যে মহর সম্প্রদায়ের লোকও সাধু বলে স্বীকৃত হতেন, তাতে তখনকার সমাজে সহিষ্ণুতার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়। আগেই মঙ্গলবেদায় চোখমেলার সমাধির কথা বলা হ'য়েছে। সেইখানেই তিনি জন্মগ্রহণও করেছিলেন।

এর পর সাধিকা কাহ্নেপাত্রার নাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি, এবং তাঁর মা ছিলেন একজন নর্তকী। তিনি এতোই রূপবতী ছিলেন যে লোকেরা তাঁকে সেকালের মোগল সম্রাটের মহিষী হ'তে বলেছিল। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নি। এবং অসহায় অবস্থায় পন্ধরপুরে চলে আসেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন দয়ার ঈশ্বর বিঠোবা তাঁকে ভক্ত হিসেবে গ্রহণ করবেন কি না। তাঁকে বলা হ'য়েছিল যে, বিঠোবা নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রহণ করবেন, কারণ বিঠোবা অত্যন্ত দয়াবান এবং পতিতের বন্ধু। তিনি মানুষের ভগবান—সাধারণ মানুষের ভগবান, পতিতের ভগবান। অস্পৃশ্য সহ সকল শ্রেণীর মানুষের সামনেই তাঁর মন্দিরের দরজা অবারিত। শোনা যায় যে, সেখানে সম্রাটের অনুচরেরা তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছিল। কিন্তু কাহ্নোপাত্রা বলেছিলেন যে, তিনি আগে মন্দিরে যেতে চান; এবং মন্দিরে ঢুকে তিনি প্রভু বিঠোবার প্রতিমার চরণতলে দেহত্যাগ করেন।

তারপর প্রেমবতীর কথা। তিনি ছিলেন বিধবা এবং সাধিকার চেয়ে কবি হিসেবেই তিনি বেশী প্রসিদ্ধ। অনেকগুলি ভক্তিমূলক পদ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানা গেলেও, তাঁর রচিত কিছু কিছু পদ এখনো টিঁকে আছে।

এরপর বহিনাবাঈ। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে[১] দেহত্যাগ করেছিলেন। অনেকগুলি পদ রচনা করে-ছিলেন তিনি।

বহিনাবাঈয়ের পর আমরা পাই বেনাবাঈয়ের নাম। তিনি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর মহাসাধক রামদাসের শিষ্যা। তিনি বেনাস্বামী রামদাসী নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি রামদাসের এতোই অনুরাগিণী ছিলেন যে স্বামীগৃহে এবং পিতৃগৃহে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করে সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সম্ভবত তিনি ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মে ছিলেন। "রামদাসী অনুসন্ধান বিষয়ে বৃত্তিপ্রাপ্ত" পন্ডিত শ্রীশঙ্কর শিকৃষ্ণদেব তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি মহাসাধক রামদাসের একনিষ্ঠা অনু-রাগিণী ছিলেন। রামদাস ছিলেন "দাসবোধ" এবং অন্যান্য গ্রন্থের রচয়িতা।

এরপর আরো একজন নারী সাধিকা বৈয়াবাঈ বা বয়ারাঈ রামদাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি চুরাশী বছর জীবিত ছিলেন এবং তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। গিরিধর নামে তাঁর একজন শিষ্য ছিল। তিনি মারাঠীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দুও জানতেন, এবং ঈশ্বরের গুণগান করে অনেকগুলি উর্দু কবিতা রচনা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

---

[১] বিস্তারিত বিবরণের জন্যে পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বহিনাবাঈ

তিন শতাব্দীরও বেশী কাল দূরে পেছিয়ে গেলে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সময়ের যবনিকা তুলে আমরা দেখতে পাব বহিনাবাঈয়ের জীবনেতিহাস। বিখ্যাত এলোরা গুহাগুলির অবস্থান ভূমি ভেরুলার নিকটে দেবগাঁও নামক শহর ছিল তাঁর জন্মস্থান। নামেও যেমন, দেবগাঁও সত্যিই ছিল তেমনি দেবস্থান। পাশেই বয়ে চলেছে শিবনদী। তাই স্নানক্ষেত্র হিসেবে স্থানটি একেবারে অতুলনীয়। এর যে লক্ষতীর্থ বলে নাম হ'য়েছিল তা অত্যন্তই সার্থক। প্রাচীন আর্যদের নেতা অগস্ত্য মুনি আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে কেউ যদি এই তীর্থে স্নান করে ক্রিয়াকর্মাদি করে তবে তাঁর মনোবাসনা সিদ্ধ হবে।

শহরের তহশীলদার ছিলেন আউজি কুলকারণী নামে একজন ব্রাহ্মণ। তিনি খুব ভাগ্যবান ও সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জানকীবাঈ যোগ্যতার সঙ্গে সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। তাঁদের কোনো সন্তানাদি ছিল না। তাঁরা লক্ষতীর্থে ক্রিয়াকর্ম ক'রে সন্তান লাভের জন্যে বর প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনবার একই স্বপ্ন দেখলেন আউজি যে, একজন শুদ্ধশীল ব্রাহ্মণ তাঁকে বর দিচ্ছেন—তাঁর একটি কন্যা এবং দুটি পুত্রসন্তান হবে। এক বছরের মধ্যে, ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি কন্যা হল তাঁর। নাম রাখলেন তাঁর বহিনা।

হিন্দু প্রথা অনুযায়ী একজন ভালো ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী কন্যার কোষ্ঠী তৈরী করলেন। তাতে দেখা গেল মেয়েটি বেশ যশস্বিনী হবে।

চার বছর বয়সের সময় বহিনাবাঈ কুলকারণী পরিবারের আত্মীয় শিবপুর-বাসী গঙ্গাধর পাঠকের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হলেন। গঙ্গাধরের বয়স তখন তিরিশ বছর।

কিন্তু বছর চারেক শান্তিপূর্ণভাবে কেটে যাবার পর বহিনার পিতা সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে দুর্দশাগ্রস্ত ও কপর্দকশূন্য হ'য়ে পড়লেন। গঙ্গাধর তখন তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তিনি সমস্ত অবস্থা ভালভাবে পর্যালোচনা ক'রে বুঝতে পারলেন যে স্থানত্যাগ করা ছাড়া আউজির আর কোনো উপায় নেই। ফলে একদিন গভীর রাত্রে আউজি সপরিবারে দেবগাঁও ত্যাগ করে গেলেন। রাস্তায় তাঁদের যথেষ্ট কষ্ট হ'য়েছিল, এমনকি ভিক্ষাও

করতে হয়েছিল। সৎপথে থাকার পথ কোনোকালেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। পথে আউজিরা অনেক তীর্থস্থান ও নদী অতিক্রম করলেন। যখনই এই সব তীর্থ ক্ষেত্রে আসতেন, বহিনার হৃদয়ে গভীর ভক্তিভাব জেগে উঠত। মহারাষ্ট্রের বারাণসী বলে পরিচিত পন্ধরপুরে তাঁরা পাঁচদিন অবস্থান করলেন। পাণ্ডুরঙ্গের বিগ্রহ দেখে বহিনা খুবই আনন্দ পেলেন হৃদয়ে। সেখান থেকে তাঁরা মহাদেও বনে গেলেন। এই স্থানটি শঙ্কর মহাপ্রভুর নামের সঙ্গে জড়িত। জাতিতে ব্রাহ্মণ বলে তাঁরা ভিক্ষার সময় কেবল তণ্ডুলই গ্রহণ করতেন। এরপর এখান থেকে তাঁরা রহিমৎপুরে এলেন, এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। সৌভাগ্যক্রমে এখানে গঙ্গাধর শহরের স্থায়ী পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে পুরোহিতের কাজ পেয়ে গেলেন।

বহিনার বয়স হল এগারো। কিন্তু তাঁর মনে সাধুসঙ্গ লাভ ও ভগবদ্ কথা শোনার আগ্রহই প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগল। পাড়ার মেয়েরা যখন তাঁর সঙ্গে খেলতে আসত, তখন তিনি ঈশ্বর চিন্তাতেই বিভোর থাকতেন। পূর্বজন্মের অপূর্ব বাসনা যেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত। ভগবানের প্রতি অনুরাগই ছিল তাঁর একমাত্র খেলা।

স্থায়ী পুরোহিত বারাণসী থেকে ফিরে আসার পর গঙ্গাধরের কাজ চলে গেল। কাজেই তাঁদের আর কোনো উপার্জনের রাস্তা খোলা রইল না। সপরিবারে তাঁরা তখন অতি পুণ্যস্থান কোলাপুরে চলে এলেন। এইখানেই বহিনার জীবন কাব্যের প্রকৃত সূচনা বলা চলে।

কোলাপুরে বহিরামভট নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি ছিলেন বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আউজির পরিবারকে তিনি আশ্রয় দিলেন। তাঁর গৃহে আউজিরা পুরাণপাঠ হরিকীর্তন শুনতে পেতেন। শহরে জয়রাম স্বামী ব'লে আরো এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ভগবদ্ পুরাণের কাহিনী শোনাতেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে বহিনা যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে যেতেন।

কোনো এক পর্ব-উপলক্ষে বহিরাম ভট একটি কালো গরু দান হিসাবে পেলেন। গরুটির শিং দুটি সোনায় মুড়ে, ক্ষুর রুপোয় বাঁধিয়ে, সারা শরীর পীতবর্ণের রেশমী বস্ত্রে ঢেকে দেওয়া হ'য়েছিল। কেননা সেকালে বিশিষ্ট ধরণের দানে এই ছিল রীতি। কালক্রমে গরুটির একটি কালো বাছুর হল। জন্মের দশদিন পরে এই বাছুরটিকে বহিরামভট গঙ্গাধরকে দান করলেন। পরিবারের সকলেই এই দানে অত্যন্ত আনন্দলাভ করলেন। বাছুরটি ধীরে ধীরে বহিনার খুব অনুগত হ'য়ে উঠল। একদণ্ড তাঁর কাছ ছাড়ত না সে।

বহিনার হাত থেকে ছাড়া আর কারো কাছে থেকে খাদ্য বা জল গ্রহণ করত না। যখন বহিনা কুয়ো থেকে জল তুলতে যেত তখন হাম্বারবে পুচ্ছ তুলে তাঁর পিছু পিছু ছুটত। শিশু যেমন তার পোষা প্রাণীর ভাষা বোঝে বহিনাও তেমনি বাছুরটির সব আচরণ বুঝতে পারতেন। মনে ভালোবাসা থাকলে পশুদেরও সব কিছু স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। বাছুরটিকে দেখে বহিনার কীর্তনের কথা মনে পড়ত, কেননা কীর্তনের সময় বাছুরটি তাঁর সঙ্গেই যেত। এবং কোনো গোলমাল না করে মন দিয়ে ধর্মালোচনা শুনত। বহিনা এবং অন্যান্যদের মনে হত বাছুরটি নিশ্চয়ই কোনো যোগভ্রষ্ট আত্মা।

কোলাপুরে জয়রাম স্বামীর কীর্তন খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। বহিনা সুযোগ পেলেই কীর্তনের আসরে উপস্থিত হতেন। ফলে তিনি এবং তাঁর বাছুর সারা শহরেই পরিচিত হ'য়ে উঠলেন। বহিনার স্বামী ধর্মপ্রাণ ভিক্ষাজীবী হলেও রাগী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যে এইভাবে জনসাধারণের আলোচনার বিষয় হ'য়ে উঠবেন তা তিনি চাইতেন না। একদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে তিনি বাড়ী ছুটে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরে মারতে শুরু করে দিলেন। বহিনা যে কী ভীষণ কষ্ট পেলেন তা বলা যায় না। গরু ও তার বাছুরটিও তাঁর দুঃখে ডাকতে শুরু করে দিল। তখন বহিনার বয়স এগারো, স্বামীর বয়স সাঁইত্রিশ, কীইবা করতে পারতেন তিনি। কিন্তু স্বামীর প্রতি কোন্ কর্তব্যে তিনি অবহেলা করেছেন? বহিনার পিতামাতাও গঙ্গাধরকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তাঁরা তাঁর এই পশুবৎ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঈর্ষাতুর স্বামী উত্তর দিলেন, "জয়রাম স্বামীর মধ্যে বহিনা এমন কি মহত্ত্ব দেখতে পেয়েছে? চুলোয় যাক হরি কীর্তন। আর যদি কখনো সে যায় আমি আবার তাকে মারব।" এবং এরপর থেকে তিনি বহিনাকে প্রায়ই মারধর করতে শুরু করলেন।

অবশেষে এই অত্যাচার অসহ্য হ'য়ে ওঠায় একদিন পরিবারের কর্তা হিসাবে বহিরামভট গঙ্গাধরকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বললেন। এরপর কিছু দিন ভালোই কাটল। এক পক্ষকাল শান্তিতে অতিবাহিত হ'য়ে গেল। হঠাৎ বাছুরটির হল অসুখ। রোগটা এত কঠিন যে সকলেই তার জীবনের আশা ছেড়ে দিল। চেষ্টার অবশ্য কোনো ত্রুটি ছিল না। তারপর তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। বহিনা তাকে এতো ভালবসতেন যে তিনি যেন বিদায়বাণী শুনতে পেলেন। তাঁর শিশুমনে মনে হল সে যেন পরমেশ্বরের কাছে শেষ প্রার্থনা জানাচ্ছে। পরদিন বাছুরটি মারা গেল। এই ঘটনায় বহিনা এতোই শোকাহত হ'য়ে পড়লেন

যে তিনদিন তিনি সংজ্ঞাহারা হ'য়ে রইলেন। চতুর্থ দিনে তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন যেন এক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলছেন, "বহিনা, জাগো! ভাবতে শুরু কর! মনকে জাগ্রত কর!"

তখন জেগে উঠে তিনি দেখলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। রাত তখন গভীর। তাঁর চারপাশে তাঁর পিতামাতা, স্বামী এবং ভাই গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছেন। স্বপ্নের ব্রাহ্মণটি ছিল অনেকটা পন্ধরপুরের পাণ্ডুরঙ্গ বিগ্রহের মতো দেখতে। জ্ঞান হওয়ার পর তাঁর মন কেবল দেবতা ও সাধুসন্ন্যাসীর মূর্তি, তাঁদের পবিত্র কাহিনী ও পদাবলীতে পূর্ণ হ'য়ে রইল। তিনি তুকারামের দর্শন-কামনা করলেন। কেননা তুকারামের নাম তখন সমগ্র মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। বহিনা তুকারামকেই তাঁর গুরু বলে ঘোষণা করলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁর নির্দেশ কামনা করতে লাগলেন।

বহিনার মনে পড়ল, কী ভাবে একবার তুকারাম এক ব্রাহ্মণকে খুশী করার জন্যে তাঁর কবিতাবলীর পুঁথি নদীতে নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং তেরদিন পরে কী ভাবে অক্ষত অবস্থায় সেগুলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কী করে সাধুদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সাধারণ মানুষের জন্যে মারাঠী ভাষায় বেদান্তের সারমর্ম প্রচার করেছিলেন। এই ভাবে নিবিষ্টচিত্তে তুকারামের কথা ধ্যান করতে করতে তিনি সংজ্ঞাহারা হ'য়ে পড়েন এবং বাছুরটির মৃত্যুর সতের দিন পরে স্বপ্নে তুকারামের দর্শন পেয়ে তাঁর কাছ থেকে সান্ত্বনা ও মন্ত্র লাভ করেন। এই মন্ত্র হল—"রামা-কৃষ্ণ-হরি"।

তুকারামের কাছ থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করেন। তিনি যখন এইরকম অবস্থায় ছিলেন জয়রাম স্বামী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। বহিনার শয্যার পাশে বসে তিনি কিছু ক্ষণের জন্যে ধ্যানস্থ হ'য়ে যান। কিন্তু বহিনা তাঁর গলায় স্পষ্ট তুকারামের কণ্ঠ শুনতে পেলেন—"আমি জয়রামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে এসেছি। কিন্তু আমি তোমার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করলাম। এখানে আর বেশী দিন থেকো না। আত্মজ্ঞান ও বোধির জন্যে তপস্যা কর।" এরপর থেকে তিনি বারবার তুকারামের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের কাছেই তিনি উন্মাদ বলে বিবেচিত হলেন। দলে দলে লোকেরা তাঁর খবর নিতে আসতে লাগল। কেউ কেউ তাঁর দেবীভাব লক্ষ্য করল। গঙ্গাধর অবশ্য নিষ্ঠুর এবং ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়েই রইলেন। লোকেরা যে ভিড় ক'রে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে আসত তা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি পছন্দ করতেন না যে তুকারামের মতো একজন শূদ্রকে তাঁর স্ত্রীর মতো একজন ব্রাহ্মণ

পত্নী গুরু বলে গ্রহণ করবেন। তাঁর মনে হ'ল তাঁর পারিবারিক জীবনের ভিত্তিই তুকারামের জন্যে ধ্বংস হ'তে বসেছে। তাছাড়া বহিনার জনপ্রিয়তার জন্যে ঈর্ষা এবং তাঁর নিজের দুর্নামের জন্যে ভয়ও অবশ্য তাঁর মনে ছিল। তাঁর পুরুষোচিত অহঙ্কারবোধ একজন নারীর মহিমার কাছে হার মানতেও রাজী ছিল না। কাজেই যে বাড়ীতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নেই, সেখানে থাকাও ক্রমে তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠছিল।

একদিন তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে তাঁর শ্বশুরকে বললেন, "আপনার কন্যা, অর্থাৎ আমার স্ত্রী এখন অন্তঃসত্ত্বা। যাই হোক, আমি তাকে আপনার কাছে রেখে তীর্থ ভ্রমণে যাব মনস্থ করেছি। তাঁর যখন ঈশ্বরের প্রতি এতোই অনুরাগ এবং গুরু তুকারামের ওপর এত অদ্ভুত ভক্তি তখন আমার সঙ্গে তার দেখা না হলেও চলবে। স্ত্রীর কাছে অপমান সইবে কে বলুন?"

কিন্তু বাড়ী থেকে যাওয়ার দিন হঠাৎ গঙ্গাধর গুরুতর ভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। সাতদিন ধরে প্রবল জ্বরে তিনি শয্যাগত রইলেন। ঔষধপথ্য ত্যাগ করলেন তিনি। বহিনা দিবারাত্র তাঁর শয্যা পার্শ্বে বসে রইলেন। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল গঙ্গাধর। অবশেষে তাঁর মনে অনুতাপ এল এবং ভগবান পাণ্ডুরঙ্গ ও তাঁর সেবক তুকারামকে অসম্মান করার জন্যেই যে এই যন্ত্রণা ভোগ তাও বুঝতে পারলেন। এই রকম অবস্থায় কেউ যেন—হয়তো তাঁর বিবেক—তাঁকে বলল, "মৃত্যু কামনা করছ কেন? বাঁচতে যদি চাও তো তোমার স্ত্রীকে গ্রহণ করো। তোমার কাছে সে কী অপরাধ করেছে? সে একজন প্রকৃত হরিভক্ত, এবং তোমারও উচিত তার সঙ্গে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া।" এই কথাবার্তা বহিনার সাক্ষাতেই ঘটেছিল। তারপরে, তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর স্বামী সেরে উঠতে লাগলেন। গঙ্গাধর যেন পুনর্জন্ম লাভ করলেন। তিনি একান্ত ভাবে হরির সেবাতেই আত্মনিয়োগ করবেন বলে স্থির করলেন। তিনি তাঁর শ্বশুরকে দেবগাঁওয়ে ফিরে যেতে বললেন এবং নিজে যাতে সস্ত্রীক বনে গিয়ে তপশ্চর্যায় রত হ'তে পারেন সেজন্যে অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

বহিনার পরিবার পরিজন এরপর পুণ্যস্থান দিহুতে গিয়ে তুকারামের চরণ-বন্দনা করবেন বলে মনস্থ করলেন। গরুটিও তাঁদের সঙ্গে চলল। পবিত্র নদী ইন্দ্রযানীতে স্নান করে তাঁরা মন্দিরে গিয়ে ধ্যানরত তুকারামের চরণবন্দনা করলেন। কোলাপুরে যাঁর দিব্য মূর্তি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিলেন সেই সাধু পুরুষের সান্নিধ্য লাভ ক'রে বহিনা আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁকে দেখা মাত্রই বহিনার মনের মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হল। সবকিছুই যেন বদলে

যেতে লাগল। তাঁর মন থেকে দ্বৈত-বোধ লোপ পেয়ে গেল। তাঁর মন ধ্যানস্থ হ'ল, চক্ষু স্থির হল, জিহ্বা বাক্‌শূন্য হ'য়ে পড়ল এবং হৃদয় আবেগশূন্য হ'য়ে গেল। এই মুহূর্তের কথা মনে ক'রে তিনি বলেছেন, "আমার অহঙ্কার এবং সাংসারিক জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা তুকারামকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হ'য়ে গেল।"

দিহুতে কোণ্ডাজি নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁদের খেতে দেবেন বললেন, কিন্তু আশ্রয় দিতে পারবেন বলে ভরসা দিলেন না। মাসবাজি স্বামীর বাড়ী ছিল পাশেই। আর বাড়ীতে জায়গাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু যখন গঙ্গাধর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তিনি লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। এরপর তাঁরা মন্দিরের ধর্মশালায় অবস্থান করতে লাগলেন। এখানে তাঁরা তুকারামের হরিকীর্তন শুনে শান্তিতেই সময় কাটাতে লাগলেন।

মাসবাজি ছিলেন উগ্রস্বভাব, ঈর্ষাতুর এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক। তিনি নিজেকে দিহুর একজন বিশিষ্ট নাগরিক বলে মনে করতেন। তুকারাম কোনো রকম বিজ্ঞানের সাধনা করতেন না, অথচ লোকেরা দলে দলে তাঁর কাছেই যেত, এতে মাসবাজির মন বিদ্বেষে পূর্ণ হ'য়ে উঠত। তিনি গঙ্গাধর ও বহিনাকে তাঁর নিজের শিষ্য হ'তে বললেন। কিন্তু তাঁরা যখন জানালেন যে তুকারামকেই তাঁরা গুরু বলে গ্রহণ করেছেন, তখন মাসবাজি রাগে চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, "ব্রাহ্মণ হ'য়ে তোমরা তুকারামের মতো একজন শূদ্রকে কী ক'রে গুরু বলে গ্রহণ করলে? শূদ্ররা কি জ্ঞানলাভ ক'রতে পারে? মনে রেখো, তোমরা সমাজচ্যুত হবে।" এরপর গঙ্গাধরেরা তাঁর কুনজরে পড়লেন। সুযোগ পেলেই তিনি গঙ্গাধরদের অপমান করতেন ও অসুবিধা ঘটাতেন। বহিনা বলতেন, "ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষা করার জন্যে কতো ভাবেই না দুঃখের মধ্যে ফেলেন।" তিনি ঠিকই বলতেন; সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই সাধুরা পরীক্ষা ও দুঃখের মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হন। তুকারামও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না।

শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও তুকারামের এই অভ্যুদয় মাসবাজির পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠল। তিনি পুণার আম্পাজি স্বামীকে লিখলেন, শূদ্র তুকারামের এত স্পর্ধা যে তিনি মন্দিরের মধ্যে কীর্তন-অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেও প্রণাম গ্রহণ করেন। চিঠিতে তিনি বহিনা এবং গঙ্গাধরের নামও উল্লেখ করেছিলেন এবং তুকারামকে যাতে শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্যেও অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একজন শূদ্র যে ব্রাহ্মণের গুরু হ'য়েছেন এই অশ্রুতপূর্ব সংবাদ শুনে আম্পাজি স্বামী যারপরনাই ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। বহিনার পরিবারকে

তিনি জাতিচ্যুত করার ভয় দেখালেন। মাসবাজিও ক্রমাগত শত্রুতা চালাতে লাগলেন এবং বহিনার পরিবারকে স্থানত্যাগ করতে আদেশ দিলেন।

মাসবাজি বহিনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্যে একদিন তাঁদের গরুটি চুরি করে এনে নিজের বাড়ীর এক গোপন স্থানে শক্ত করে বেঁধে রাখলেন। তিনদিন তাকে খাদ্য বা জল কিছুই দেওয়া হল না। উপরন্তু তিনি তাঁর রাগ দেখাবার জন্যে গরুটিকে মারধরও করতে লাগলেন। বহিনা একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠলেন এবং গঙ্গাধর গরুটিকে খুঁজে বাহির করার জন্যে কোনো চেষ্টারই ত্রুটি রাখলেন না। অবশেষে গরুটি তুকারামকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে মুক্তি প্রার্থনা করল। আর যেহেতু তুকারাম সর্ব আত্মায় অভেদ অনুভব করতেন, তাই গরুটিকে যখনই প্রহার করা হত তখনই তাঁর শরীরে দাগ ফুটে উঠত।

এর মধ্যে অকস্মাৎ একদিন মাসবাজির বাড়ীতে আগুন লেগে গেল। লোকজন ছুটে গিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলল। তারা দেখল গরুটি অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে ডাকাডাকি করছে। আগুন থেকে তারা তাকে উদ্ধার করে আনল। তার পিঠের ওপর প্রহারের দাগ ছিল, এবং সবিস্ময়ে সকলে লক্ষ্য করল যে, তুকারামের পিঠের ওপরও সেই রকম প্রহারের দাগ। তারা তুকারামকে সর্বভূতের ঈশ্বর পান্ডুরঙ্গের সঙ্গে এক বলে চিনতে পারল।

এই সময় বহিনা একটি কন্যার জন্ম দিলেন। তিনি তাঁর নাম রাখলেন কাশীবাঈ। তাঁর মনে হল বাছুরটিই যেন তাঁর কাছে পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছে। মেয়েদের কাছে সন্তানের জন্ম আনন্দের ব্যাপারই, কিন্তু বহিনার স্বভাবই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ থাকা। তাঁর মনে হত, নারী হ'য়ে জন্মেছেন বলেই সাংসারিক জীবন পরিহার করে তাঁর চিরবাঞ্ছিত আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করতে পারছেন না। তিনি এমন সব আত্মীয় বন্ধুর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে আছেন যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি বিরূপ। তাঁর স্বামী একজন বৈদান্তিক হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রকৃত প্রেমভক্তি ছিল না। এই গ্লানিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনায় বহিনা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। প্রাণ তাঁর মুক্তির জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। তিনি ভাবলেন, তাঁর মানসিক কষ্টের অবসান ঘটতে পারে শুধু আত্মহত্যার ফলেই। তাঁর মনে হতে লাগল হয় তিনি আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, না হয় জলে ডুবে মরেন। মনের এই রকম ক্রমবর্ধমান অশান্তির অবস্থায় তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন—"তুমি আমার স্বামীকে দিয়ে কষ্ট দিচ্ছ। তবু মৃত্যু হয়, সেও ভাল, আমি তোমার আরাধনা ছাড়ব না। হে প্রভু, আত্মজ্ঞানের চক্ষু দিয়ে যাতে তোমার বিশ্বরূপ

দর্শন করি সেই করুণা কর শুধু আমাকে। যন্ত্রণা না সইতে পেরে আমি যদি আত্মহত্যা করি তাহলে দোষ হবে কিন্তু তোমারই। তোমার সন্তানকে রক্ষা কর প্রভু!”

বহিনা মনস্থ করলেন, তিনি তিন দিনের জন্যে ধ্যানে বসবেন। কিন্তু কেবল একদিন, যখন তাঁর স্বামী কোনো কাজের জন্যে পুণায় গিয়েছিলেন, তখন ছাড়া আর কোনো সময় পেলেন না। সেইদিন তিনি সম্মুখে বিঠোবার মূর্তি রেখে হৃদয়ে রামচন্দ্রের ধ্যান করতে করতে চার ঘণ্টা অতিবাহিত করার সুযোগ পেলেন। ধ্যানস্তিমিত নয়নে নিদ্রায় বা জাগ্রত অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন তুকারাম তাঁকে অপূর্ব কাব্যময় ভাষায় আশীর্বাদ জানিয়ে বলছেন যে, এই তাঁর ত্রয়োদশ ও সর্বশেষ জন্ম, কেন না তিনি তাঁর সমস্ত বাসনার সমাপ্তি ঘটিয়ে কর্মফলের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করে ফেলেছেন। তাঁর নতুন যে একটি পুত্র সন্তান হবে সে তাঁরই পূর্ব-জন্মের সঙ্গী। তিনি মহাপুরুষ তুকারামের স্পর্শও যেন অনুভব করতে পারলেন। এবং তাঁর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে গেল। তখন তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন। মনের এই রকম অবস্থায় অত্যন্ত হর্ষাপ্লুত হ'য়ে তিনি ইন্দ্রযানী নদীতে স্নান ক'রে মন্দিরে গিয়ে বিঠোবা বিগ্রহের পূজা করলেন। আর অকস্মাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর মনে কবিত্বের প্রেরণা এসে গেছে। তিনি পাঁচটি পদ-রচনা করে মন্দিরের বিঠোবা বিগ্রহকে উৎসর্গ করলেন। এই তাঁর প্রথম কবিতা।

এরপর বহিনার পরিবার দিহু ত্যাগ ক'রে শিউরে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করল। জীবনের এই অধ্যায়ে বহিনা মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে থাকতে লাগলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে তিনি এতোই মগ্ন হ'য়ে থাকতেন যে সাংসারিক কাজ-কর্মে তাঁর কোনো আসক্তিই ছিল না। কোনো বিশেষ ঘটনা যে ঘটেছিল তা নয়, জীবন মোটামুটি স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলছিল। এর মধ্যে কবে যে তাঁর স্বামী ও পিতামাতার মৃত্যু ঘটেছিল তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তুকারাম স্বর্গারোহণ করলেন। এ সংবাদ পেয়ে বহিনা গুরুবিহীনা হ'য়ে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হলেন। তিনি দিহুতে এসে আঠারো দিন ধরে উপবাস করলেন। তারপর তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হল—তুকারাম তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন।

তখন মহারাষ্ট্রের গৌরবের দিন। শিবাজীর সুনাম তখন ক্রমবর্ধমান। মারাঠা-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তিনি তুকারাম ও রামদাসের মতো ধর্মগুরুর সাহায্য পাচ্ছিলেন অকুণ্ঠভাবে। বহিনা তখন সাধুসঙ্গের প্রয়োজন অনুভব করলেন।

রামদাসের দিকে তাঁর মন আকৃষ্ট হল। তিনি রামদাসের কাছে গিয়ে প্রণাম জানালেন। কিন্তু ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে রামদাসও ইহধাম ত্যাগ করলেন। তখন বহিনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবার শিউরে ফিরে এলেন। তাঁর শেষ জীবনের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে মানসিক অশান্তি ও যন্ত্রণা তাঁকে চিরদিনই তীব্রভাবে পীড়িত করেছে।

ক্রমে বহিনার বয়স হল বাহাত্তর বৎসর। মৃত্যুর দূরাগত পদধ্বনি শুনতে পেলেন তিনি। তাঁর পুত্র বিঠোবা তাঁর মৃতা স্ত্রী রুক্মিণীর পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্যে গোদাবরীতীরে শুক্লেশ্বর নামক স্থানে গিয়েছিল। সেখানে সে তাঁর মায়ের কাছ থেকে সত্বর বাড়ী চলে আসার জন্যে চিঠি পেল। বহিনা লিখেছিলেন, "আজ থেকে পাঁচদিন পরে আমার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু আমি ধীর ভাবেই তার জন্যে প্রতীক্ষা করছি।" এই চিঠি পেয়ে বিঠোবা গোদাবরীর একটি স্থান মাতার সমাধির জন্যে নির্বাচিত ক'রে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এল। সে তাঁর মাকে বলল যে সেও তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছে, এবং তাঁর চিঠি পেয়ে প্রায় উড়ে চলে এসেছে। বহিনা কিন্তু তাঁর ছেলেকে বললেন, তিনি তাঁর সমাধিস্থান হিসাবে কোনো নদীর সঙ্গমস্থলকে বেশী পছন্দ করেন। তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, "বাছা শোন, আমার আগের বারোটি জন্মে এক সঙ্গেই ধর্মাচরণ করেছি। তের বারের বার তুমি আমার ছেলে হ'য়ে জন্মেছ। এই আমার শেষ জন্ম, কারণ যে বাসনার ফলে পুনর্জন্ম হয়, তার অবসান ঘটেছে।" বিঠোবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত মাতার এই কথা শুনে হতভম্ব হ'য়ে গেল। বহিনার তখনো বেশ জ্ঞান ছিল। কাজেই বিঠোবা তাঁর কথা অবিশ্বাস করতে পারল না, কেন না সারা জীবনে একটিও মিথ্যা কথা তিনি বলেন নি।

সে বলল, "মা, আমার কিন্তু একটা ব্যাপারে সন্দেহ আছে।"

"কি বিষয়ে, বাছা?"

"তুমি আমাদের পূর্ব জন্মের কথা বলেছ, কিন্তু সে জন্মগুলির বিষয়ে বিশদ কিছু বলতে পার?"

"পারি বাছা। যদিও একথা আমি আর কাউকেই বলতে পারি না, তবু তোমাকে আমি বলব।" এই বলে বহিনা ছেলেকে তাঁদের পূর্ববর্তী বারোটি জন্মের কথা বলে কীভাবে এই ত্রয়োদশ বার জন্মগ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে জানালেন।

ক্রমে মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে বহিনা ছেলেকে ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করাতে বললেন। আকাশ-বাতাস ধ্বনিত ক'রে বেদগান তাঁর কানে আসতে

লাগল। তারপর তাঁর মৃত্যুকালের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দেহ সংকারের বিষয়ে যথাবিহিত উপদেশ দিলেন।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে এই পুণ্যবতী নারী বাহাত্তর বৎসর বয়সে তেরো জন্ম কর্মভোগের পর মুক্তিলাভ করলেন।

বহিনার কবিত্ব শক্তি ছিল খুবই উঁচুদরের। তাঁর আত্মজীবনীখানি খুবই কবিত্বপূর্ণ। তাঁর রচনা খুবই প্রাঞ্জল। কিন্তু তাঁর গুরু তুকারামের 'অভঙ্গ-ছন্দে'র অনুসরণে তাঁর কবিতায় ছন্দ এক ধারাবাহিক রীতিতে প্রবাহিত। আবেগের স্বতোৎসারিতাই এ রীতির বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু খুবই ব্যাপক, যেমন—আত্মার বিষয়ে দর্শনোচিত আলোচনা, জীবন, ধর্ম, সদ্‌গুরু, সাধুত্ব, ব্রাহ্মণত্ব, ভক্তি ইত্যাদি। তাছাড়া এতে নৈতিক ও সাংসারিক জীবনের বিষয়েও উপদেশ আছে, যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই উৎসাহজনক। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি এবং সাংসারিক ব্যাপারে ত্যাগের মনোভাব থাকা সত্ত্বেও এই পুণ্যবতী নারীর গার্হস্থ্য জীবনের বিষয়ে জ্ঞানও ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে স্ত্রীর কর্তব্যের বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারা খুবই উল্লেখযোগ্য। কেন না যে সময়ে স্বামী ছাড়া নারীর আর কোনো সত্তা ছিল না সেই তিনশ বছর আগে ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা বিষয়ে জানতে পারা যায় বলেই এগুলি বেশী মূল্যবান। বহিনা বলছেন,—"কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রী তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব এবং ধর্মকর্মের কর্তব্য একই সঙ্গে পালন করে থাকেন। এই রকম স্ত্রী যেন আকাশকেও নিজের হাতে বহন করেন। তিনিই কর্তব্য-পরায়ণ স্ত্রী যিনি অন্তরে ক্রোধ বা ঘৃণা পোষণ করেন না, যিনি বিদ্যার গর্ব থেকে মুক্ত, যিনি অন্যায়কে পরিহার করেন, বিনয়ী, জিতেন্দ্রিয়, সাধু সেবিকা, এবং যিনি বিনা প্রশ্নে স্বামীর আজ্ঞা পালন করেন। এরকম স্ত্রী ইহজীবনে জয়যুক্ত হন এবং পরকালে স্বর্গ লাভ করেন। স্ত্রীর পক্ষে উচিত হচ্ছে অন্তঃকরণে মহত্ত্ব রেখে স্বামীর ইচ্ছাকে গ্রহণ করে গার্হস্থ্য জীবন সুখময় করে তোলা, এবং প্রাণ গেলেও স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত নয়। ধন্য সেই নারী, তার জাতি, তার কুল।"

বিংশ শতাব্দীর নারীরা নিজের বন্ধনমুক্তি ও পুরুষের সঙ্গে সমাধিকার প্রতিষ্ঠার বিতর্কে এতোই মত্ত যে এসব কথা শুনে হয়তো ওষ্ঠ বিকৃত করবেন। কিন্তু বহিনাবাঈ বেদান্তের শিক্ষাকে সামনে রেখে সেকালের সামাজিক পট-ভূমিকায় চরিত্র গঠন ও মানবতার আদর্শকেই প্রচার করতে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন।

সেই জন্যে তার জীবনী ধর্ম ও জীবন এই দুই দিক দিয়েই শিক্ষাপ্রদ।

গৌরীবাঈ

ভারতবর্ষে সাধু কিম্বা মহাপুরুষদের জীবনী রচনার প্রথা প্রচলিত ছিল না। সভা কবিরা রাজা ও রাজপুত্রদের গুণ, অর্থ ও শক্তির বন্দনা ক'রে শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করতেন। কিন্তু যেহেতু এসব-রচনার লক্ষ্য থাকত মোটা রকমের পারিশ্রমিকের দিকে, সেই জন্যে এগুলিতে এতো অতিশয়োক্তি থাকত যে রাজাদের বা তাঁদের রাজত্বের প্রকৃত চিত্র এতে পাওয়া যেত না। মুসলমান শাসনের সময়ে মুস্‌লিম লেখকগণ কিছু কিছু ঐতিহাসিক জীবনী রচনা করেছিলেন, তাতে সমসাময়িক জীবন ও রাজকর্মের উপরে আলোকপাত করা হ'য়েছে। কিন্তু সাধুদের জীবনী রচনার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয় কিংবদন্তী ও পুরুষ-পরম্পরাগত জনশ্রুতি থেকে।

আমাদের সৌভাগ্য যে গুজরাটের কবি-তাপসী গৌরীবাঈয়ের কাল থেকে আমরা এত দূরে নই যে তাঁর জীবন ও কর্মের বিষয়ে নিশ্চিত উপকরণ সংগ্রহ করা কঠিন হ'য়ে উঠেছে। গত শতাব্দীতে যখন তাঁর জীবনী রচিত হয় তখনো তাঁর পরিবারের দুজন বংশধর জীবিত ছিলেন এবং তাঁদের ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা-প্রপিতামহীর বিষয়ে কিছু খোঁজ খবর দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য সর্বদেশের সাধুব্যক্তিদের মতোই এক্ষেত্রেও প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কিংবদন্তী এমনভাবে মিশে গেছে যে নির্ভুল জীবনচিত্র আঁকা খুবই দুরূহ।

গৌরীবাঈ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট ও রাজপুতনার সীমান্তে বগদ-অঞ্চলের গিরিপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। গিরিপুরের আরেক নাম হল ডুঙ্গরপুর। যে সম্প্রদায়ে তিনি জন্মেছিলেন সেটা "বাড়নগর নাগর গৃহস্থ" নামে পরিচিত। ছোট এই সম্প্রদায়টি গুজরাটে খুবই মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে এবং এর বিশেষ গৌরব এই যে কয়েক শ বছর ধরেই এ সম্প্রদায়ের পুরুষ তো বটেই এমনকি মেয়েরাও শতকরা একশ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'য়ে আসছেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকজন ফারসীতে সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে খ্যাতনামা হ'য়েছিলেন। ফলে একদা হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে এঁরাই উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হতেন।

গৌরীবাঈয়ের পিতামাতার বিষয়ে সামান্যই জানা যায়, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে চম্পু নামে তাঁর একজন ভগ্নী ছিল এবং এই ভগ্নীর ফুলশঙ্কর নামে এক পুত্র এবং চাতুরী ও যমুনা নামে দুই কন্যা ছিল। এই দুই কন্যার মধ্যে চাতুরী বিবাহের এক বৎসর পরেই বিধবা হন। যমুনার বিবাহ হয় বেলশঙ্কর নামে

এক ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁদের প্রভাশঙ্কর ও রূপশঙ্কর নামে দুই পুত্র এবং তুলজা নামে এক কন্যা ছিল। এঁদের বিষয়ে জানা যায় যে প্রভাশঙ্করের বিবাহ হয় মঞ্জুকম্ভের-এর সঙ্গে, এবং তাঁর ব্রিজলাল ও কৃষ্ণলাল নামে দুই পুত্র ছিল, যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কখনো গুজরাট এবং কখনো বারাণসীতে বসবাস করতেন। তাঁরা গৌরীবাঈয়ের জীবনীকারকে তাঁর জীবনী ও কর্ম জীবনের বিষয়ে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ ক'রে দেন।

সেকালের প্রথা অনুসারে গৌরীবাঈ পাঁচ ছয় বৎসর বয়সেই বাগ্‌দত্তা হন। বিবাহের চার বছর আগে তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত হন। কাজেই চোখ বাঁধা অবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু আরো দুর্ভাগ্য তার জন্যে তোলা ছিল। বিবাহের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর স্বামী মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। সারা অঞ্চলই এতে শোকনিমগ্ন হ'য়ে পড়ল পরিবারের দুঃখের তো অবধিই রইল না। কিন্তু অল্পবয়স্কা হলেও গৌরী দুঃখ নিয়ে বিলাপ করতে বসলেন না। যখনই কেউ তাঁর স্বামীর মৃত্যু নিয়ে করুণা প্রকাশ করত, তখনই তিনি নির্বিকার ভাবে উত্তর দিতেন, "ঈশ্বরই আমার প্রভু, তাঁর কাছেই আমি জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি।" তাঁদের সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে তিনি তাঁর পিতামাতার সঙ্গেই বাস করতে লাগলেন।

গৌরীবাঈ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। সেকালে মেয়েদের জন্যে কোনো বিদ্যালয় ছিল না। তবু বাড়ীতেই তিনি অতি দ্রুত লেখাপড়া শিখে ফেললেন। বালবিধবাদের পক্ষে তখন যা ভালো বলে বিবেচনা করা হত সেইভাবেই তিনি পূজা অর্চনা ও গৃহকর্ম ক'রে, ভক্তিমূলক গান গেয়ে ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে সময় কাটাতেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি ঈশ্বরের স্তব ক'রে শ্লোক রচনা করতে লাগলেন মাঝে মাঝে।

হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণের বিধবাদের পক্ষে দ্বিতীয় বিবাহ সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় না। তাঁরা পবিত্র ধর্মজীবন যাপন করবেন এইটেই আশা করা হয়। তের বছর বয়সেই গৌরীবাঈ বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে ধর্ম-কর্মে আত্মনিয়োগ করাই তাঁর পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ। তিনি তাই বাড়ীতেই ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে এবং ঈশ্বরারধনায় মনঃসংযোগ ক'রে সময় কাটাতে লাগলেন।

সে সময়ে গিরিপুরের অধীশ্বর ছিলেন রাজা শিবসিংহজি নামে একজন ধর্মপ্রাণ, শিক্ষিত এবং কর্তব্যপরায়ণ নৃপতি। তিনি সর্ব প্রকারের অন্যায় রাজকর রহিত ক'রে দিয়েছিলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, বণিকেরা

নানা রকমের ওজনে বাটখারা ব্যবহার করছে বলে জনসাধারণ প্রতারিত হচ্ছে তখন এ সব বন্ধ ক'রে 'শিবসই তোল' বলে এক—আকারের ওজন প্রবর্তন করেন তাঁর রাজ্যের সর্বত্র। এই 'শিবসই তোল' এখনও প্রচলিত আছে। তিনি কূপ পুষ্করিণী, বিনা মূল্যের সরাইখানা, মন্দির ইত্যাদির জন্যে অজস্র অর্থব্যয় করতেন। এই সব দাতব্য কর্মানুষ্ঠানের জন্যে তাঁর নাম এখনো স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

এই রাজা গৌরীবাঈয়ের পবিত্র জীবনের কথা শুনে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর দর্শন প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি গৌরীবাঈয়ের সঙ্গে ধর্মালোচনা ক'রে তাঁর পুণ্য কাহিনীর বিষয়ে জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হলেন।

গৌরীবাঈয়ের পবিত্রতা ও ভক্তির দ্বারা রাজা এতোই প্রভাবিত হ'য়েছিলেন যে, তাঁর সম্মানার্থে অতি সুন্দর একটি মন্দির নির্মাণ ক'রে তার পাশে একটি ইঁদারা খনন করিয়ে দিলেন। গৌরীবাঈ তাঁর গৃহদেবতার বিগ্রহগুলি এই মন্দিরে স্থানান্তরিত করলেন। তারপর মহাসমারোহে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার উৎসব অনুষ্ঠিত হল।

ঘর সংসার ত্যাগ করে চিরদিনের জন্যে গৌরীবাঈ মন্দিরে বাস করতে চলে এলেন। ঈশ্বরের আরাধনাই হল তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। তাঁর বিধবা ভগ্নীকন্যা চতুরীও তাঁর সঙ্গে মন্দিরে বাস করতে চলে এলেন। কিছুকাল পরে অন্য ভগ্নীকন্যা যমুনা এবং আরেকজন বৃদ্ধা আত্মীয়া হরিয়ণও মন্দিরে বাস করতে এল।

মন্দিরটিকে পরিচ্ছন্ন ও চিত্তাকর্ষকভাবে সজ্জিত রাখতে চেষ্টা করতেন গৌরীবাঈ। ফলে চারিদিকে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তীর্থযাত্রী, সাধু-সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা দলে দলে মন্দির দর্শনে আসতে শুরু করলেন। সেখানে অনেক ধর্মালোচনা হত। তার ফলে গৌরীবাঈয়ের ধর্ম সাহিত্যের জ্ঞান অনেক বেড়ে যেতে লাগল। কাব্য রচনার দিকে তাঁর যে স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তা এই পরিবেশে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করল, এবং তিনি ধর্মসঙ্গীত রচনা করতে শুরু করলেন।

রাজা শিবসিংহজি ভিক্ষাজীবী ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্যে মন্দিরের আঙিনায় একটি সদাব্রত (অর্থাৎ দাতব্য ভোজনশালা) স্থাপিত করেছিলেন। এখানে শত শত ব্যক্তি আহারের জন্যে আসত। একবার একজন সুপণ্ডিত সাধুপুরুষ এসে গৌরীবাঈয়ের ভক্তি ও ধর্ম কাহিনীতে জ্ঞান দেখে বলেছিলেন, "তুমি তাপসী মীরাবাঈয়েরই প্রতিমার মতো। অত্যন্ত ভক্তিমতী হলেও সাধুনারীর যতদূর

জ্ঞান থাকা দরকার মীরাবাঈয়ের তা ছিল না। সেই গ্রন্থটির সংশোধনের জন্যেই যেন তোমার জন্ম হ'য়েছে। আমি তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্যে এসেছি। অতিরিক্ত জ্ঞান যা তোমার দরকার আমিই তা তোমাকে দেব।" এই বলে তিনি গৌরীবাঈকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও 'আত্মজ্ঞান'-এর বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি তাঁকে তাপসী নারীর পক্ষে যে পথ সঠিক তার নির্দেশ দিলেন এবং অন্তরের আশীর্বাদ জানালেন। পরিশেষে তিনি বালমুকুন্দের একটি ছোট বিগ্রহ উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন।

গৌরীবাঈয়ের জ্ঞান যেমন বেড়ে গেল, তেমনি সাংসারিক ব্যাপোরে উদাসীনতাও বেড়ে গেল। শোনা যায় তিনি একাদিক্রমে পনের দিন পর্যন্ত নিরম্বু উপবাস করে সমাধিমগ্ন হ'য়ে থাকতেন। তাঁর ধ্যান এতোই গভীর হতো যে তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হ'য়ে বন্ধ ঘরে স্থিরভাবে বসে থাকতেন।

এ বিষয়ে প্রমাণ আছে যে, বৃদ্ধা হরিয়ণ মনে করতেন, এই সমাধিস্থ অবস্থা একটা ছলনা মাত্র, আসল অতীন্দ্রিয় চেতনা নয়। তিনি গৌরীবাঈয়ের সঙ্গেই থাকতেন। একদিন পরীক্ষার জন্যে তিনি গৌরীবাঈয়ের সমাধিস্থ অবস্থায় গোপনে ঘরে ঢুকে তাঁর গায়ে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন। গৌরীবাঈ একচুলও নড়লেন না। শরীরের ছুঁচগুলি সেইভাবেই রেখে হরিয়ণ পালিয়ে গেলেন। 'সমাধি' শেষ হওয়ার পর গৌরীবাঈকে স্নান করানোর সময় চাতুরী তাঁর গায়ে আবিষ্কার করলেন ছুঁচগুলি। দোষী কে সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু হল, কিন্তু কেউই দোষ স্বীকার করল না। কিছুকাল পরে হরিয়ণ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন, এবং জীবনীকার বলছেন, এইটেই তাঁর উপযুক্ত শাস্তি হ'য়েছিল। তিনি গৌরীবাঈয়ের পায়ে পড়ে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তাপসী গৌরীবাঈ অত্যন্ত সদয়চিত্ত নারী ছিলেন। তিনি দোষীকে বললেন যে, শুধু সাদা দাগ থাকবে, কুষ্ঠের ঘা সব শুকিয়ে যাবে।

গৌরীবাঈ ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দিতে পারতেন। তাঁর ভক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তিও বেড়ে যেতে লাগল। শোনা যায়, তিনি হাজার হাজার ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও স্তোত্র রচনা করেছিলেন।

দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও তাঁর চরিত্রের মধ্যে আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। তিনি সমস্ত রকম আনন্দ-উল্লাস ছেড়ে পূজা-অর্চনা ও জ্ঞানান্বেষণে সময় কাটাতে লাগলেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবতী, জ্ঞানী এবং সদয়হৃদয়া নারী, এবং উত্তেজনার কারণ যতোই প্রবল হোক না কেন তিনি কখনো ক্রোধে বিচলিত হতেন না। ভক্তজনের পক্ষে যা স্বাভাবিক, তিনি সেইভাবেই নতনেত্রে বসে থাকতেন। কিন্তু

যখনই তাঁর চোখ তুলে তাকাবার দরকার হতো দর্শকেরা সেই চোখ দুটির অসামান্য দীপ্তিতে স্তম্ভিত হ'য়ে যেত। তিনি সাদা থান কাপড় পরতেন, এবং তাঁর একমাত্র অলঙ্কার ছিল তুলসীর মালা। সমাধিলাভ করার পর থেকে তিনি দুধ ছাড়া আর কোনো আহার্যই গ্রহণ করতেন না।

এইভাবে তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তারপর তিনি পবিত্র ব্রজভূমিতে (অর্থাৎ গোকুল ও বৃন্দাবনে) গিয়ে শেষ জীবন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি স্বয়ং মন্দিরে এসে গৌরীবাঈকে এই ইচ্ছা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'য়ে গিরিপুরেই বাস করতে অনুরোধ করলেন। এমন কি তিনি বহু মূল্য উপঢৌকনও দিতে চাইলেন। কিন্তু গৌরী-বাঈ এসব পার্থিব সম্পদের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না। কাজেই নিজের সিদ্ধান্তে তিনি অটল রইলেন। তিনি একজন যোগ্য সাধুর উপর মন্দিরের প্রধান বিগ্রহের পূজার ভার দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত দেববিগ্রহ এবং ভগ্নী কন্যাদের নিয়ে বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন।

দলটি যখন জয়পুরের কাছে এল তখন সেখানকার রাজা স্বয়ং তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। রাজা আগেই তাপসী গৌরীবাঈয়ের খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। রাজ অতিথির মতো বিশেষ সমাদর পেলেন গৌরীবাঈ। মহারাণী নিজে তাঁকে দর্শন করতে এসে পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে প্রণাম করলেন। কিন্তু গৌরীবাঈ এই মূল্যবান দান ফিরিয়ে দিয়ে জানালেন, তিনি সংসারত্যাগী তাপসী, এসব পার্থিব সম্পদে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। রাজদম্পতি তা সত্ত্বেও যখন তাঁকে এই দান্ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন, তখন গৌরীবাঈ তাঁর একজন অনুচরের হাতে সেই মুদ্রাগুলি দিয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে বললেন।

জয়পুরের মহারাজা গৌরীবাঈয়ের সংযত আচরণ ও বিদ্যাবত্তায় অত্যন্ত মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। কিন্তু গৌরীবাঈ ঈশ্বর দর্শন করেছেন এ বিষয়ে অনেক কাহিনী শুনেছিলেন বলে মহারাজা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। শোনা যায় তিনি তাঁর পুরোহিতকে রাজপ্রাসাদের মন্দিরে গোবিন্দ বিগ্রহকে প্রচুরভাবে সজ্জিত করে দরজা বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন। তারপর তিনি গৌরীবাঈকে আমন্ত্রণ করে এনে মন্দিরের বাইরের চত্বরে ভাগবত পাঠ শোনার জন্যে বসিয়েছিলেন। এটা ছিল রাজার একটি ছলনা। পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি গৌরীবাঈকে জানালেন যে গৌরীবাঈয়ের ক্ষমতা কতদূর তাই তিনি পরীক্ষা করতে চান: এবং বন্ধ দরজার ওপাশে বিগ্রহটির বেশভূষা ও অলঙ্কারের বিবরণ কী তাই

জানতে চাইলেন। গৌরীবাঈ রাজার এই ব্যবহারে আহত হ'য়ে বললেন যে তিনিও রাজা ও অন্যান্য সকলের মতো নশ্বর মানুষ এবং তাঁর কোনো দৈবশক্তি আছে বলে তিনি দাবী করেন না। তবু ঈশ্বর যেহেতু ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, সেই জন্যে বর্তমান ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তিনি সাহায্য করবেন। তারপর তিনি ধ্যানস্থ হ'য়ে স্তব-রচনা করে গান করতে লাগলেন। শোনা যায় তখন তিনি বিগ্রহটির বেশ-ভূষা ও অলঙ্কারের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, "একটা মাত্র ত্রুটি এই যে মাথায় কোনো মুকুট নেই।" রাজা এবং অন্যান্যরা সকলেই এতে খুব বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে মুকুট নেই এমন কখনো হয় না। তখন মন্দিরের দরজা খুলে দেখা গেল গৌরীবাঈ যা বলেছেন তাই সত্য। মুকুটটি পুরোহিত ভালো করে পরায়নি বলে মাথা থেকে খসে পড়ে গেছে। রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বলাই বাহুল্য গৌরীবাঈয়ের হৃদয়ে বিদ্বেষের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি রাজাকে ক্ষমা করলেন।

রাজা গৌরীবাঈকে তাঁর স্থায়ী অতিথি হিসেবে জয়পুরে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। গৌরীবাঈ যে প্রাসাদে ছিলেন সেটা তিনি দান হিসেবে দিয়ে সর্বপ্রকার খরচের দায়িত্ব নিতে চাইলেন। কিন্তু তাপসী নারী আগেকার মতোই এবারও এ দান প্রত্যাখ্যান ক'রে বৃন্দাবনে যাওয়ার ইচ্ছা জানালেন। রাজা তবু যখন তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন গৌরীবাঈ তাঁর পূজার বিগ্রহটি প্রাসাদে রেখে তাঁর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করতে বললেন রাজাকে। রাজা এতে সম্মত হলেন।

এরপর মথুরা, গোকুল ও বৃন্দাবনে কিছুকাল অতিবাহিত করে গৌরীবাঈ ভগ্নীকন্যাদের নিয়ে কাশীতে চলে এলেন। বারাণসীর রাজা সুন্দরসিংহও গৌরীবাঈয়ের ধর্মপ্রাণতার বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তিনি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজাও ভক্তিসঙ্গীত রচনায় অনুরাগী ছিলেন। তিনি এবং গৌরীবাঈ একত্রে বসে মুখে মুখে পদরচনা করে ধর্মালোচনা করতে লাগলেন। গৌরীবাঈ রাজাকে ধ্যানের প্রণালী শিক্ষা দিলেন। রাজা তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করলেন। রাজা সুন্দরসিংহ বিশেষ অনুরোধ ক'রে গৌরীবাঈকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান হিসেবে গ্রহণ করতে বললেন। এর মধ্যে কুড়ি হাজার টাকা গৌরীবাঈ বারাণসীতে বসবাসকারী নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে বিসম্বাদ মিটানোর জন্যে ব্যয় করলেন। বাকী টাকা তিনি পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে গিয়ে দাতব্য কর্মে নিঃশেষ করলেন।

পুরী থেকে ফিরে এসে গৌরীবাঈ কাশীতেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। একবার তিনি সাতদিন সমাধিস্থ হ'য়ে রইলেন। তারপর তিনি ভগ্নী কন্যাদের জানালেন যে তাঁর শেষ সময়ের আর বেশীদিন দেরী নেই। তিনি যমুনাতীরে দেহত্যাগ করতে বাসনা করলেন। পুরাণে কথিত আছে যে, বালক ধ্রুব সেখানেই মহাতপস্যায় রত হয়েছিলেন। তিনি বললেন, রামনবমীর দিন তাঁর মৃত্যু ঘটবে। রাজা সুন্দরসিংহ গৌরীবাঈয়ের ইচ্ছানুসারে যাওয়ার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। যমুনাতীরে এসে কয়েক দিন সমাধি মগ্ন থেকে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি চিরশান্তি লাভ করলেন।

গৌরীবাঈয়ের দৈবশক্তি ছিল একথা হয়তো অনেকে বিশ্বাস করতে চাইবেন না, কিন্তু তাঁর সরলতা, ভক্তি ও জ্ঞান যে অতি অসাধারণ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও করুণায় তাঁর অবিচল আস্থা ছিল। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল মহৎ; ঘৃণা বা ঈর্ষা কী বস্তু তা তিনি জানতেন না। তাঁর নামে প্রচলিত ভক্তি-সঙ্গীতগুলিই তাঁর চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। সাংসারিক বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং ঐশ্বরিক চিন্তায় আসক্তিই তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য।

তাঁর বেশীর ভাগ কবিতাই গুজরাটীতে লিখিত। কিন্তু তিনি রাজস্থানের সন্নিহিত অঞ্চলে জন্মে ছিলেন বলে কিছু কিছু রাজস্থানী শব্দও তাতে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া দীর্ঘকাল বৃন্দাবন, গোকুল এবং বারাণসীতে থাকার ফলে তিনি কিছু কিছু হিন্দী কবিতাও রচনা করেছিলেন।

গৌরীবাঈয়ের একজন শিষ্য ঠিক কথাই বলেছেন যে. তিনি ছিলেন গঙ্গার মতো; যে তাঁর শরণ নিয়েছে সেই পবিত্র হ'য়ে গেছে।

একাদশ অধ্যায়

কেরালার ধর্মসাধিকাবৃন্দ

যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ ধর্ম ও দর্শন নিয়েই ব্যাপৃত থেকেছে। মানব সভ্যতায় তার বিশেষ অবদান হল ধর্মের প্রবুদ্ধ আদর্শকে জীবন্ত করে তোলা। প্রাক্ ঐতিহাসিক বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্মনেতার অভ্যুদয় ঘটেছে, যাঁরা ভাস্বর চিন্তাধারা ও আদর্শের দ্বারা সারা পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছেন। অনেকের মধ্যে যদি মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখ করতে হয়, তবে বলা যায় যে, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণদেব ধর্ম ও দর্শনের জগতে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

প্রাচীনতম কাল থেকেই পুরুষদের মতো নারীরাও এক্ষেত্রে সমানই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন। ঋগ্বেদের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্তোত্রের রচয়িত্রী বিশ্ববারা[১] উপনিষদ-খ্যাতা ব্রহ্মচারিণী গার্গী, যিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান ক'রে তাঁদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন; বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রধান ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী, যিনি স্বামীর প্রদত্ত পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ ক'রে অমরত্ব লাভের জ্ঞান বেশী মূল্যবান বলে মনে করেছিলেন; এবং মীরাবাঈ, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্যে মহিষীর রাজসম্মান পদদলিত করে এসেছিলেন—এ'রা প্রত্যেকেই ভক্তজনের অকপট শ্রদ্ধার পাত্রী হ'য়ে থাকবেন।

এই দিক দিয়ে দক্ষিণ ভারত যে পশ্চাদ্‌পদ অবস্থায় আছে তা নয়। শ্রীআন্ডাল, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বধূ হতে চেয়েছিলেন, এবং কৃষ্ণের দেহে বিলীন হ'য়ে গিয়েছিলেন, তিনি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর কোনো কোনো প্রাণবন্ত সঙ্গীত শ্রীঅরবিন্দের মতো একজন মহান্ মরমী কবি ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন।

কেরালাতেও নারী-পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই ধর্মনেতার উদ্ভব ঘটেছিল। রামানুজন্ এঝুত্তাচ্ছান, যিনি মালয়ালাম ভাষায় উৎকৃষ্ট ধর্মসাহিত্য রচনা করেছিলেন; ভক্ত-কবি নারায়ণ ভট্টাতিরি, যিনি 'নারায়ণীয়' নামে ভাগবতের এক ভক্তিমূলক সার সংকলন রচনা ক'রে ভক্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করেছিলেন; এবং পুন্তনম, যাঁর 'ভক্তি' নামক উৎকৃষ্ট রচনা ভগবান নিজেই সমসাময়িক পণ্ডিত নারায়ণ ভট্টাতিরির রচনার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বলে ঘোষণা করেছিলেন—এ'দের নাম কেরালার ঘরে ঘরে শোনা যাবে।

---

১ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পদটীকা দ্রষ্টব্য।

কেরালার ধর্মপ্রাণা নারীদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরোপলব্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ'রা হলেন চংক্রোত্তু আম্মা, বাড়াক্কেরাত্তু নঙ্গ পেন্নু, এবং কুরূরে আম্মা। তাঁদের জীবন সম্বন্ধে জনশ্রুতি থেকে খন্ড খন্ড ঘটনাই শুধু জানা যায়। কিন্তু তাঁদের গভীর ভক্তিভাব ও ঈশ্বরোম্মাদনার বিষয়ে তাতেই যথেষ্ট আলোকপাত ঘটে।

এ'দের প্রথম জন যে বাড়ীতে থাকতেন সেটি এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করে 'চংক্রোত্তু ভবন' নামে পরিচিত হ'য়ে আছে। দক্ষিণ ভারতের মহান্ বৈষ্ণব আঝওয়ারগণের দ্বারা বন্দিত তিরুভেল্লার বিখ্যাত শ্রীবল্লভ মন্দিরের একেবারে পশ্চিমেই এই বাড়ীটি অবস্থিত। মন্দিরটি যেহেতু তাঁর কালেই তৈরী হ'য়েছিল এবং নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলে স্থিরীকৃত নম্মাঝওয়ার দ্বারা এই মন্দিরের নাম যেহেতু উল্লিখিত হ'য়েছিল, সেজন্যে স্পষ্টই মনে হয় চংক্রোত্তু আম্মা অষ্টম শতাব্দীতে জন্মেছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং বিষ্ণুর পূজা অর্চনাতেই সময় কাটাতেন। শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী তিথিতে ভক্তগণ চিরকালই উপবাস পালন করে ধন্য হন। চংক্রোত্তু উপবাস করতেন নিরম্বুভাবে। দ্বাদশীর দিন স্নান করে পূজা অর্চনার পর স্বহস্তে রন্ধন ক'রে একজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করিয়ে তবে তিনি নিজে পারণ করতেন। এইভাবে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে বহু বৎসর উপবাস ব্রত পালন করেছিলেন। একবার এমন হল যে তিনি দ্বাদশীর দিন ভোজন করানোর জন্যে ব্রাহ্মণ পেলেন না। তাঁর ভক্ত মনে খুবই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল এবং তিনি স্থির করলেন যে বারেকের জন্যেও যখন যথোপযুক্ত উপায়ে উপবাসের ব্রত পালন করতে অপারগ হ'য়েছেন, তখন তিনি উপবাস করেই প্রাণ বিসর্জন করবেন। অকস্মাৎ ভক্তজনের বিপদবারণ বিষ্ণু ব্রহ্মচারীর বেশে তাঁকে দর্শন দিলেন। তিনি আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে বাদাম পাতায় বিষ্ণুর জন্যে অন্ন বেড়ে দিলেন। চংক্রোত্তুর সরল অথচ গভীর ভক্তিভাব লক্ষ্য করে ভগবান বিষ্ণু পরম প্রীত হ'য়ে তাঁর খুদ কুঁড়ার অন্ন পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলেন। তারপর অন্তর্ধান করার আগে বিষ্ণু তাঁকে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে পরম মুক্তির আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন। স্থানীয় লোকেরা এই অসাধারণ ঘটনার কথা জানতে পেরে সেই স্থানে একটি বিষ্ণু মন্দির তৈরী করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলেন। এই হল তিরুভেল্লার বিখ্যাত শ্রীবল্লভ মন্দিরের প্রতিষ্ঠার বিষয়ে জনশ্রুতি। আর ঐ আশ্চর্য অন্ন গ্রহণের স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখার জন্যে এখনো সেখানে বাদাম পাতাতেই প্রভুর অন্নভোগ দেওয়া হয়। চংক্রোত্তুর

নিজের কোনো বংশধর ছিল না বলে তাঁর সম্পত্তি তিনি মন্দিরের সেবায় উৎসর্গ করে দেন।

চংক্রোত্তু আম্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বৃদ্ধ বয়সে। কিন্তু নঙ্গপেন্নুর ঈশ্বর দর্শন ঘটেছিল কুমারী অবস্থাতেই। কোচিনের রাজ পরিবারের বাসস্থান তৃপ্পুনিত্তুরের 'বড়ক্কেডত্তু ইল্লম' নামে এক বিখ্যাত মলয়ালি ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম হয়।[১] সেখানে মন্দিরে যে বিষ্ণু মূর্তি ছিল তাই দেখে শৈশব থেকেই বিষ্ণুর প্রতি তাঁর হৃদয়ে অসীম ভক্তি ভাব জাগে। প্রতিদিন তিনি মন্দিরে গিয়ে হৃদয়ের ভক্তি ঢেলে বিষ্ণুর স্তব পাঠ করতেন, কিন্তু তাতেও যেন তাঁর সাধ মিটত না। বাড়ী এসেও তিনি সেই কথাই ভাবতেন। সারা দিন তিনি ভক্তিভরে বিষ্ণুর নাম জপ করেই কাটাতেন। পরিবারের অন্যান্য লোকেরা তাঁকে ভুল বুঝতেন। তাঁরা ভাবতেন, নঙ্গপেন্নুর বুঝি সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে বর চাইছেন। কিন্তু এসব স্বার্থবোধের অনেক ঊর্ধে ছিলেন তিনি। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল পবিত্র এবং নিষ্কাম।

বিবাহযোগ্য বয়স হলে তাঁর পিতামাতা তাঁর বিবাহ স্থির করলেন। যাঁর সঙ্গে বিবাহ স্থির হল, সেই যুবকটি যেমন ছিল সুপুরুষ তেমনি ধনশালী। বিবাহের দিন সাড়ম্বরে কন্যার বাড়ীতে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে এল; বরকে যথারীতি বাদ্যভান্ড বাজিয়ে বরযাত্রীদের সঙ্গে বিবাহসভায় নিয়ে আসা হল। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হলে নঙ্গপেন্নু মন্দিরে গিয়ে প্রভুর কাছে বিদায়প্রার্থনা করলেন। মনে তাঁর এই ভেবে খুব বেদনা উপস্থিত হ'য়েছিল যে, চিরতরে স্বামীর ঘরে বাস করার ফলে এখন থেকে তিনি আর প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে প্রাণভরে দেব-দর্শন করতে পারবেন না। একথা ভাবতে চোখে তাঁর জল ভরে এল। অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ী ফেরার কথা ভুলে ভাবতে লাগলেন—"কাল থেকে আমি এই দেবদর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব। কিন্তু প্রভুকে না দেখে আমি বাঁচব কী করে? ইহকালে বা পরকালে প্রভুর দর্শনছাড়া আর কোনো বাসনা আমার নাই। হে প্রভু, আমাকে তোমারই মধ্যে গ্রহণ কর, এখনই গ্রহণ কর।" এমন কাতর প্রার্থনায় ঈশ্বর সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তরুণী পেন্নু দেখলেন, প্রভু তাঁর মূর্তি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরলেন, তারপর তাঁকে নিয়ে মূর্তির মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করলেন। এই

১ তাঁর জন্মসময়ের বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় না।

আশ্চর্য ঘটনা অচিরাৎ সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা যে কতদূর বিস্মিত ও হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিবাহের বর অত্যন্ত লজ্জায় কাউকে কিছু না জানিয়ে এক রকম পালিয়ে চলে গেলেন। কন্যার পিতামাতা স্তম্ভিত হ'য়ে রইলেন। এই ঘটনার স্মৃতি আজ পর্যন্তও ভোলেনি কেউ। প্রতিবছর এই মন্দিরে নঙ্গপেন্নু উৎসব পালন ক'রে সকলেই এই দিনটিকে স্মরণ করে। এই উৎসবের সব থেকে বড় অঙ্গ হল, শোভাযাত্রা সহকারে বিষ্ণুর বিগ্রহকে নঙ্গপেন্নুর পিতৃভবনে নিয়ে গিয়ে ভোগ দেওয়া, এবং মন্দিরের পক্ষ থেকে নঙ্গপেন্নুর বংশধরদের বস্ত্র ও অন্যান্য উপঢৌকনাদি বিতরণ করা।

উপরের উল্লিখিত দুজন ভক্ত নারী ঈশ্বরদর্শন লাভ ক'রে তখনই সংসারের বন্ধন ছিন্ন ক'রে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন। এই নিবন্ধের তৃতীয় আলোচ্য যিনি, সেই কুরূর আম্মা কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই তাঁর ইষ্টদেবতা বালকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে দীর্ঘদিন ইহধামেই জীবিত ছিলেন। যখনই তিনি বাসনা করতেন তখনই তিনি ঈশ্বরের দর্শন পেতেন।

কুরূর ইল্লমের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। এই গ্রামটি টিকে আছে এখনো পর্যন্ত। কোচিনরাজ্যের প্রসিদ্ধ শহর ত্রিচুর থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রাম। কুরূর আম্মা তাঁর সমসাময়িক দুজন ব্যক্তি নারায়ণ ভট্টাতিরি ও পুন্তনমের চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন। এঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। কাজেই কুরূর আম্মার জন্মকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে হওয়া সম্ভব। পুন্তনমের যে গভীর ঈশ্বরভক্তি ছিল তার চেয়েও এই ভক্তনারীর সরল ঈশ্বরবিশ্বাস অনেকগুণে বেশী গভীর ছিল, এটা বিশেষভাবেই লক্ষ্য করার বিষয়। তাঁর ভক্তি এমন এক মহাপ্রেমের স্তরে এসে পোঁছেছিল যেখানে প্রেমিকা, প্রেমাস্পদ ও প্রেম একাকার হ'য়ে যায়। সেই প্রেমের শক্তি-বলেই ঈশ্বর তাঁর বাঞ্ছাকল্পতরু হ'য়ে উঠেছিলেন।

কুরূর আম্মার অসীম ভক্তির সমর্থনে তাঁর পবিত্র নামকে ঘিরে বহু কাহিনী প্রচলিত হ'য়ে আছে। একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর গৃহে অন্নার্থী হ'য়ে দর্শন দিলেন। বাড়ীতে সেসময়ে কোনো পুরুষব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না, এবং সেকালে প্রাচীনপন্থী নারীরা পর্দাপ্রথা মেনে চলতেন। কাজেই কুরূর আম্মা অতিথিকে বলে পাঠালেন যে খাদ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু স্বহস্তে তা পরিবেশন করে নিতে হবে তাঁকে। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ এক বালকব্রহ্মচারী এসে সেই অপরিচিত অতিথিকে পরিবেশন করে দিলেন। অতিথি বৃদ্ধটি ছিলেন একজন মহাভক্ত পুরুষ।

তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বালককে শ্রীকৃষ্ণ বলে চিনতে পারলেন। সকলে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। আরেকবার, একজন সাধুপুরুষ, যিনি ঈশ্বরকে কায়মনে ধ্যান করলেই তাঁর দর্শন পেতেন, অনেকক্ষণ ধরে তাঁর ইষ্ট দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেও তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। তারপর বহু সাধ্যসাধনা ক'রে তবে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সেই সাধুপুরুষকে জানালেন, কুরুর আম্মার পবিত্র ভক্তির বন্ধনে এতক্ষণ বাঁধা ছিলেন তিনি, আম্মা তাঁকে মুক্তি দিলে তবে সাধুকে দর্শন দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

নারায়ণ ভট্টতিরির মৃত্যুশয্যায় কুরুর আম্মা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। আম্মাকে দেখে তিনি খুবই আনন্দলাভ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "দিদি, আমার শেষ সময় উপস্থিত হ'য়েছে। অচিরেই আমার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটবে। আমি প্রার্থনা করছি যে তুমি আমার শেষ সময়ে আমার কাছে থাকো।" তাপসী নারী উত্তর দিলেন, "না, নারায়ণ, অত ব্যস্ত হয়ো না। আজ আমাকে বাড়ী ফিরতে হবে। কিন্তু তোমার ইচ্ছামত আমি তোমার শেষ সময়ে এখানেই থাকব।" নারায়ণ ভট্টতিরি তবু অনুনয় করে বললেন, "মনে হয়, আজই আমার শেষ সময় উপস্থিত হবে। কাজেই তুমি যদি চলে যাও, আমার মনস্কামনা বোধহয় পূর্ণ হবে না।" কিন্তু কুরুর আম্মা নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন, "ঠিক সময়ে আমি তোমার পাশেই থাকব। আমার স্থির বিশ্বাস আছে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না।" তবু নারায়ণ ভট্টতিরি মনে সান্ত্বনা পেলেন না, যদিও আম্মার যাওয়ার পথে আর কোনো বাধা দিলেন না তিনি। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে আম্মা বাড়ী এলেন। তৃতীয় দিন সকালে আবার ফিরে এলেন তিনি। ভট্টতিরির অবস্থা যদিও খুব মুমূর্ষু হ'য়ে পড়েছিল তবু প্রাণ ছিল তাঁর দেহে। আম্মা তাঁকে ডেকে বললেন, "নারায়ণ, কাল উপস্থিত হ'য়েছে, প্রস্তুত হও। নারায়ণের নাম স্মরণ কর। তিনি তোমাকে আশ্রয় দেবেন।" এই কথা শুনে সেই ভক্ত-পুরুষ তিনবার নারায়ণের নাম নিয়ে শান্তিতে ইহধাম ত্যাগ করলেন। তাঁর পাশে তখন করুণার প্রতিমূর্তি কুরুর আম্মা উপস্থিত। শোনা যায় এর কিছু-দিনের মধ্যেই আম্মাও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে স্বর্গলাভ করেছিলেন।

জনপ্রবাদ এই যে, কুরুর আম্মা বিল্বমঙ্গল স্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। বিল্বমঙ্গলের ভক্তজীবনলাভের ঘটনা অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ একখানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন। একবার ঋতুমতী অবস্থায় কুরুর আম্মা নারায়ণের নাম জপ করেছিলেন। এই সময়ে বিল্বমঙ্গল স্বামী

সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁর শারীরিক অশুচি অবস্থায় আম্মার পক্ষে ভগবানের নাম জপ করা উচিত হচ্ছে কিনা। আম্মার শান্ত উত্তরে স্বামীজী সম্পূর্ণ তৃপ্ত হ'য়েছিলেন। আম্মা বলেছিলেন, "কেউ কি নিশ্চিত বলতে পারে যে শারীরিক অশুচিতার অবস্থাতেই কারো মৃত্যু হবে কিনা!"

কৃষ্ণের প্রতি কুরূর আম্মার ভালোবাসা ছিল বাৎসল্যপ্রধান। শোনা যায়, তিনি যখন পূজা করতেন তখন কৃষ্ণ কখনো তাঁর কোলে বসে কখনো পিঠে ঝাঁপিয়ে খেলা করতেন।

যে স্তবকটি তিনি জপ করতেন তা এই—

কোমলং কূজয়ন বেনুম্
শ্যামলোয়াং কুমারকঃ
বেদ বেদ্যম্ পরম ব্রহ্ম,
ভাসতাম পুরতো মম।

অর্থাৎ, এই শ্যামবর্ণ কুমার, যিনি বেদে পরম ব্রহ্ম বলে জ্ঞাত হ'য়েছেন, আমার সামনে কোমল বংশীধ্বনি ক'রে উপস্থিত হন।

তরিগোণ্ড বেঙ্কমাম্বা

বেঙ্কমাম্বার জীবন ছিল সরলতা ও কৃষ্ণভক্তির আধার। তিনি ছিলেন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার অন্যতম সুন্দর শতদল। ভারতীয় সাধকদের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তিনি তাঁর কোনো আত্মজীবনী রেখে যাননি। তাঁর কোনো জীবনী-গ্রন্থও পাওয়া যায় না। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে যে সব বিক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায় তার সঙ্গে জনশ্রুতিকে গেঁথে তবেই আমরা মোটামুটি তাঁর একটা জীবন-পঞ্জী রচনা করতে পারি।

এই নারী তাপসী বেঙ্কমাম্বার চেয়ে বেঙ্কম্মা নামেই বেশী পরিচিতা ছিলেন, এবং তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক। স্যার পি. সি. ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত ইংরাজী-তেলেগু অভিধানে লিখেছেন, বেঙ্কম্মা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি নন্দবরীক শ্রেণীর আচারপরায়ণ এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণায়ার কন্যা ছিলেন। এঁরা বশিষ্ঠ গোত্রে কনলি প্রবরের সন্তান। বেঙ্কম্মার মাতার নাম ছিল মঙ্গমাম্বা। এঁদের বাসস্থান ছিল দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের চিত্তুর জেলায় বৈলপাড়ু নামক স্থানের চার মাইল উত্তরে তরিগোণ্ড বা তরিকুণ্ড বলে একটি গ্রামে।

তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রথা অনুযায়ী বেঙ্কম্মা যে বয়সে বাগ্‌দত্তা হ'য়েছিলেন, তখন বিবাহ কী বস্তু তা তিনি কিছু বুঝতেন না। তিনি স্ত্রী হিসাবে খুবই পতিব্রতা ছিলেন। তাঁর সুললিত কাব্যগ্রন্থ 'ভাগবদ্‌-পুরাণে'র শেষে তিনি লিখেছেন যে, শ্রীবৎস গোত্র ও নুঞ্জেটি প্রবরের তিনয়্যের পুত্র বেঙ্কটাচলপতির চরণ ধ্যান করেই তিনি গ্রন্থখানি লিখেছেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই বেঙ্কটাচল-পতি ছিল তাঁর স্বামীরই নাম। তাঁর বিবাহের কিছুকাল পরে তার স্বামীর লোকান্তর ঘটেছিল।

বেঙ্কম্মা খুব সাহসী এবং স্বাধীনচেতা রমণী ছিলেন। তিনি অর্থহীন আচারবিচারের কাছে নতিস্বীকার করতেন না। যেমন, বিধবা হিসাবে তাঁর চুল কেটে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেছিলেন। গ্রাম-বাসীরা তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে এ নিয়ে চাপ দিতে লাগল। তখন পিতাকে তিনি বললেন, "বাবা, সংসারী লোকের মতামত বা আবোল-তাবোল কথায় কান দিও না। কাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই চুলকাটা? এই ঈশ্বরদত্ত চুলকে কেটে ফেলে কী লাভ হবে, আর রাখলেই বা অন্যায় কোথায়? যতোক্ষণ আমাদের

মন পবিত্র থাকবে ততক্ষণ কর্ণাময় ঈশ্বর সাংসারিক আচার-বিচার না মানলেও কুপিত হবেন না। আর মনের গতি যদি অপবিত্র হয় তাহলে যতোইনা কেন আমরা প্রাণপনে আচারবিচার মেনে চলি ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন না। কাজেই আমি যেমন আছি তেমনি থাকতে দাও আমাকে।" কৃষ্ণায়া কন্যার আন্তরিক পবিত্রতার বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেজন্যে আর কিছ্ব বললেন না তিনি।

এই সময়ে প্বষ্পগিরি পীঠের প্রধান প্বরোহিত তরিগোণ্ডে এলেন। গ্রাম-বাসীরা তাঁর কাছে বেঙ্কম্মার আচরণের বিষয়ে তীব্র অভিযোগ জানিয়ে অন্বরোধ করল, তিনি যাতে বেঙ্কম্মাকে চুল কাটার জন্যে আদেশ দেন। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কী সোরগোলই না করল তারা! একজন নিরপরাধ বিধবার চুল নিয়ে আন্দোলনের আর শেষ নেই। প্রধান প্বরোহিত বেঙ্কম্মার পিতাকে ডাকিয়ে জাতিচ্যুত করার ভয় দেখিয়ে তাঁর কন্যার চুল কাটাতে বললেন। করজোড়ে কৃষ্ণায়া স্ববিচার প্রার্থনা করে বললেন, "বাবা, দোষ আমার নয়। আপনি প্রভু দয়া করে আমার কন্যাকে ব্বঝিয়ে বল্বন।"

বেঙ্কম্মাকে সেখানে নিয়ে আসা হল। প্রধান প্বরোহিত তাঁর বিধানের কথা তাঁকে জানালেন। বেঙ্কম্মা সশ্রদ্ধ ভাবে বললেন, "স্বামীজি, আপনি জগদ্‌গ্বর্। আপনার তুলনায় আমি কীই বা জানি। দয়াকরে আমাকে বল্বন তো, কোন্ বেদে এবিধান দেওয়া হ'য়েছে যে, বিধবারা চুল রাখতে পারবে না? কেন একজন মেয়েকে মাথা মর্ড়িয়ে এমন কুৎসিৎ সাজতে হবে? আমাদের শাস্ত্রে কি একথাই বলেনি যে, যেখানে মেয়েদের কোনো সম্মান নেই, সেখানে সবরকম কর্ম আর উদ্যোগই শ্বন্যে মিলিয়ে যায়? যদি একজন বিধবার মন পবিত্র থাকে, তাহলে তার চুল রাখতে, এমন কি গহনা পরতেই বা দোষ কী? এই চুল, যা আজন্ম ঈশ্বরের দান হিসাবে পেয়েছি, তা কামিয়ে ফেললে আবার গজাবে না? যদি প্রভু, আপনার এমন ক্ষমতা থাকে যে চুল বাড়া বন্ধ করতে পারেন, তাহলে এখনই আমার মাথা কামিয়ে দিতে পারেন। আমি কিন্তু ঈশ্বরের দানকে অবহেলা করা অন্যায় বলেই মনে করি।" বেঙ্কম্মার প্রতিবাদ ছিল প্বরোহিত তন্ত্রের বিরব্দ্ধে নারীজাতি এবং মানবতার প্রতিবাদ। কিন্তু তাঁর উত্তরে ক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রধান প্বরোহিত তখনই একজন নাপিত ডাকিয়ে জোর ক'রে বেঙ্কম্মার মাথা কামিয়ে দিলেন। বেঙ্কম্মার মনে লজ্জা বা দঃব্খ হল না। তিনি ভক্তিভরে নিকটস্থ নদীতে ডুব দিলেন। আর, কী আশ্চর্য, যখন তিনি জলের ওপরে মাথা তুললেন, তাঁর মাথায় আবার দেখা দিল সেই স্বন্দর লম্বা চুলের রাশি। প্রধান প্বরোহিত এবং উপস্থিত সকলে ঘটনার এই অত্যাশ্চর্য পরিণতিতে হতবাক্ হ'য়ে গেলেন।

তাঁরা বাক্‌রুদ্ধ অবস্থায় অস্পষ্টভাবে ক্ষমা চাইতে লাগলেন বারবার ক'রে। কর্তৃত্ব ও পাণ্ডিত্যের দম্ভ এই ভাবেই বিনয় ও প্রাজ্ঞতার কাছে নতিস্বীকার করল।

বেঙ্কম্মার যা বলার কথা তা অতি আশ্চর্যভাবে ভাষা পেয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতে। তিনি বলেছেন, "মেয়েদের প্রথমে শিক্ষিত কর, তারপর তাদের নিজের ওপর ছেড়ে দাও। তখন তারাই বলে দেবে, কী কী সংস্কার তাদের দরকার। তাদের ব্যাপারে তোমাদের কী দরকার?

"স্বাধীনতা না পেলে কেউই বেড়ে উঠতে পারে না। এটা অন্যায়, হাজারবার অন্যায়, যদি তোমরা কেউ বল, আমি এই নারী বা শিশুটির মুক্তির পথ করে দেব। আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে, বিধবাদের সমস্যা বা নারীদের সমস্যার বিষয়ে আমার মত কী। শেষবারের মতো আমি এই উত্তর দিচ্ছি, আমি কি বিধবা যে আমাকে ঐ আজগুবি প্রশ্ন করছ? আমি কি মেয়ে যে আমাকে বারবার ঐ এককথা জিজ্ঞাসা কর? মেয়েদের সমস্যার সমাধান করার তুমি কে? তুমি কি ভগবান যে তুমি প্রত্যেক বিধবা বা নারীর ওপর আধিপত্য করবে? রক্ষা কর! তাদের সমস্যার তারা নিজেরাই সমাধান খুঁজে নেবে।"

তথাকথিত পণ্ডিত আর পুরোহিতদের এই যে নারীদের অধিকারে রূঢ় হস্তক্ষেপ, এর কারণ খুব অস্পষ্ট নয়। ভারতেতিহাসের পরন্ত আমলে নারীজাতি ও সাধারণ মানুষের প্রতি সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানগুলির উদ্ভব ঘটেছিল। কিন্তু বেদ ও উপনিষদের যুগে অবস্থা ছিল একেবারেই অন্যরকম। সে সময়ে নারীদের সামাজিক ও ধর্মীয় মর্যাদা পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল না। বৈদিক ঋষিদের মধ্যে বিশ্ববারা অপলা, লোপামুদ্রা এবং ঘোষার মতো মহীয়সী নারীরও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তৈত্তরীয় উপনিষদে আচার্য তাঁর শিষ্যের স্নাতকত্বলাভের সময়ের উপদেশে প্রথমেই বলেছেন, "জননীকে ঈশ্বর জ্ঞান করবে।" এবং চণ্ডীতে বলা হয়েছে, "সেই আদ্যাশক্তি তুষ্ট হলেই তিনি পুরুষদের উন্নতি ও মোক্ষের কারণস্বরূপা হন।"

যাই হোক, বেঙ্কম্মার কোমল হৃদয় গ্রামবাসী ও প্রধান পুরোহিতের আচরণে অত্যন্ত আহত হ'য়েছিল। তাঁর ঈশ্বরান্বেষণের আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। তিনি চিত্তুর জেলার মদনপল্লীর অধিবাসী রূপাবতারম্ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কাছে আধ্যাত্মিক মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বেঙ্কম্মা তাঁর অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্যে গুরুর প্রতি এই বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—"আমি আমার গুরু সুব্রহ্মণ্যের চরণ-কমলে প্রণাম জানাই। তিনি জ্ঞানকেই

ব্রহ্ম বলে মনে করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন।" তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে একটি নির্জন স্থান অন্বেষণ ক'রে তিনি গ্রামের নৃসিংহ মন্দিরে গিয়ে হনুমন্তের মূর্তির পিছনে ব'সে ধ্যান করতে শুরু করলেন। সেই অবস্থায় তিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃকপাত না ক'রে দিনের পর দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে তিনি ধ্যানের অবকাশে প্রসাদ গ্রহণ করতেন। একদিন মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে দেখতে পেয়ে অজস্র গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। বেঙ্কম্মা ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে একটাও প্রতিবাদ করলেন না। গৃহ তিনি আগেই ত্যাগ করেছিলেন। এবার গ্রামও ত্যাগ করলেন। তারপর তিরুপতিতে গিয়ে কলিযুগের শরণ বেঙ্কটেশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর রচিত 'বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য' গ্রন্থে তিনি এই শহরের স্বর্ণচূড়া শোভিত মন্দির, রথ, শ্রমণগৃহ, উদ্যান, হস্তি, ময়ূর, চন্দনা ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। এই শহরটি সপ্তচূড়া বিশিষ্ট এক পর্বতের উপর রচিত। প্রকৃতির মহান সৌন্দর্যের সঙ্গে সভ্যতার কলাকৌশল মিশে অপূর্ব শোভা সৃষ্টি করেছে এখানে।

তিরুপতির নাম ছিল তখন বেঙ্কটাচলম্। এর পর্বতচূড়ার ওপর মন্দির-গুলি যেন আত্মার তীর্থযাত্রার শেষে ঈশ্বরে মোক্ষলাভ করারই প্রতীকের মতো। সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিদিন শতশত তীর্থযাত্রী তিরুপতিতে দেবদর্শনে আসে।

এখানে পৌঁছে বেঙ্কম্মা মন্দিরের দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন। স্থানীয় লোক এবং মন্দিরের কর্তৃপক্ষ তাঁর ধর্মনিষ্ঠায় প্রীত হ'য়ে ছোট একটি কুটির এবং দৈনিক কিছু তণ্ডুলের বরাদ্দ করে দিলেন। তাছাড়া তিনি মন্দিরে গিয়ে কয়েকটি বিশেষ উপাসনারও অনুমতি লাভ করলেন। এগুলি এখনো তাঁর নামে প্রচলিত আছে। কিন্তু কালক্রমে তাঁর সুনামই তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়াল। কয়েকজন ঈর্ষাতুর পুরোহিত তাঁকে নানাভাবে বিব্রত করতে লাগল। কিন্তু তাঁর প্রেম ও ভক্তির গুণে তিনি এসব বাধা অতিক্রম করতে সমর্থ হলেন। তাঁর মনে আবার নির্জন-তার বাসনা জেগে উঠল। তখন সুরম্য তুমুলুরুকোণ উপত্যকায় একটি মনোমত নির্জন স্থান বেছে নিয়ে তিনি ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করে দিলেন। চারিদিকে অভ্রভেদী পর্বতচূড়া, উপত্যকা ও সানুদেশে ফলবান বৃক্ষ ও সুগন্ধ পুষ্প, সূর্য চন্দ্র তারার আলোকে উদ্ভাসিত গগনতল বেঙ্কম্মার রুচিবান মনে গভীর শিল্পা-নুভূতির আনন্দ এনে দিত। তাই তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনায় এগুলির বিস্ময়কর

প্রভাব ছত্রে ছত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছিল। এখানে ছয় বৎসর তপশ্চর্যা ক'রে তিনি বহুবার ঈশ্বরদর্শনের সৌভাগ্য এবং চরম আত্মোপলব্ধি লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তারপর এখান থেকে তিনি স্বামী পুষ্করিণী নামক হ্রদের উত্তর দিকে এক চটিতে গিয়ে তাঁর আত্মোপলব্ধির ফলশ্রুতি কাব্যের আকারে সর্ব-সাধারণের মধ্যে বিতরণ করতে শুরু করলেন।

বেঙ্কম্মা লক্ষ্য করলেন যে তাঁর মাতৃভূমি অন্ধ্রদেশের নারীপুরুষের আত্মোন্নতির জন্যে নৈতিক, ধর্মসম্বন্ধীয় এবং দার্শনিক শিক্ষাগুলিকে অত্যন্ত সরলভাষায় প্রচার করাই বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। সেকালে গ্রন্থ লেখা হত এমন একটি জটিল রীতিতে যে, সাধারণ মানুষের উপকারের চেয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তবিনোদনই হত তার লক্ষ। সম্মান ও দক্ষিণা লাভের আশায় এসব গ্রন্থ উৎসর্গও করা হত প্রায় রাজা বা জমিদারদের নামে। কিন্তু বেঙ্কম্মার সঙ্কল্প ছিল মানুষের সেবা ক'রে ভগবানেরই সেবা করা। তিনি তাঁর সমস্ত রচনা তাই তাঁর ইষ্টদেবতাকেই উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর "বাশিষ্ঠ-রামায়ণে"র প্রতি সর্গের শেষে তিনি বলেছেন, "হে প্রভু বেঙ্কটেশ্বর, তুমি তরিগোণ্ডে নৃসিংহরূপে বিরাজ করছ, তোমারই চরণকমলে আমি এই কাব্য উৎসর্গ করলাম। নারী বা পুরুষ যে কেউ কায়মনে এই কাব্যের অনুলিপি গ্রহণ করবে, পাঠ করবে অথবা পাঠ শুনবে, সেই সর্বদুঃখময় সংসার-সমুদ্র পার হ'য়ে নির্বাণ লাভ করবে।"

বেঙ্কম্মার সমস্ত রচনাই কাব্যাকারে রচিত। এর মধ্যে মহাকাব্য, গীতিকবিতা, গাথা, গান ও কাব্যনাট্য ইত্যাদি সমস্তই আছে। "ভাগবদ্-পুরাণের" শেষে তিনি তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিয়েছেন, কিন্তু মনেহয় তার পরেও তিনি অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে সংস্কৃত মূল-অনুসরণে-রচিত 'বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্য', রাজযোগ সার, বাশিষ্ঠ-রামায়ণ, বর্তমান কালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে।

বাশিষ্ঠ-রামায়ণ সংস্কৃতে রচিত মহাকাব্য। এটি বিরাটকায় গ্রন্থ, কয়েক হাজার পৃষ্ঠা আছে এতে। মূল বিষয় হল শ্রীরামকে বশিষ্ঠের উপদেশ। এই গ্রন্থ যে কেবল ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের উল্লেখযোগ্য সংযোজন তাই নয় পৃথিবীর জ্ঞানরাজ্যেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বেঙ্কম্মা এই গ্রন্থের উপদেশগুলিকে তাঁর রচিত 'বাশিষ্ঠ-রামায়ণে' কাব্যাকারে সংকলিত করে জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছেন। মূলগ্রন্থের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দুরূহ দার্শনিক বিতর্ক। এগুলিকে পরিহার করে বেঙ্কম্মা তাঁর কাব্যে কতকগুলি

উপাখ্যানের সাহায্যে ঘরোয়াভাবে মহৎ সত্যগুলির দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। তিনি ভালোই জানতেন যে সুললিত ছন্দোময় ভাষায় উপযুক্ত উপমার সাহায্যে রূপায়িত হলে বক্তব্যবিষয় পাঠকের মনের মধ্যে গিয়ে প্রতিধ্বনি তোলে; এবং জলের ওপর এক ফোঁটা তেল ফেললে যেমন হয়, ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তৃত হ'তে থাকে। জুঁইফুল দেখতে খুব জাঁকজমকপূর্ণ নয়, তার রঙও তেমন ঐশ্বর্যশালী নয়, কিন্তু গন্ধটি বড় সুমিষ্ট, তেমনি বেঙ্কম্মার রচনারীতিও তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই সরল, কিন্তু মাধুর্যময় এবং অব্যর্থ। কিন্তু সর্বদা তাঁর লক্ষ্য ভাষার কারুকার্যের চেয়ে ভাবের প্রগাঢ়তার দিকেই বেশী নিবদ্ধ ছিল। কাব্য তাঁর কাছে ছিল দর্শনেরই সেবাদাসী। তিনি মনে করতেন ছন্দোবিন্যাসের নিয়ম কবির অধীন, কবি ছন্দোবিন্যাসের নিয়মের ক্রীতদাস নন। মাঝে মাঝে তাই দেখা যায় তিনি ব্যাকরণ ও ছন্দোলঙ্কারের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে গেছেন। যেখানেই প্রয়োজন বুঝেছেন, সচ্ছন্দে তিনি চলতিভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনেক রচনায় দেখা যায় তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুরূপ 'দ্বিপদ' ছন্দ ব্যবহার করেছেন। পালকুরিকি সোমনাথের মতো প্রথিতযশা কবিরা এই ছন্দের উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

বেঙ্কম্মার রচিত অনেক গানই লোকগীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বীরেন্দ্রকালিঙ্গম পন্তলু এবং প্রভাকর শাস্ত্রীর মতো বিখ্যাত কবি ও সমালোচকগণ তাঁর রচনার অশেষ প্রশংসা করেছেন।

বেঙ্কম্মা ছিলেন আবেগসমৃদ্ধ কবি। যদি বলা হয় "হৃদয়ে ভাবের পূর্ণতা এসে মুখে ভাষা ফোটে" তাহলে বলতে হবে, প্রেম ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়েই তিনি কাব্যময় ভাষায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছিলেন। কথাটা যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, কাব্য ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরেরই দান। তাঁর বেঙ্কটাচল-মাহাত্ম্যে তিনি বলেছেন, "বাল্যকালে কোনো শিক্ষকের কাছে আমার বর্ণপরিচয়ও ঘটেনি। আমি ছন্দের 'অ আ ক খ'-ও জানতাম না, কোনো সাহিত্য গ্রন্থও কখনো পড়িনি। যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মতো আমি বেজে উঠি। ঈশ্বর অসীম করুণায় আমার জিহ্বায় বসতি স্থাপন করে যেমন ভাবে আমাকে গান করান—তিনি ছাড়া আর কার এমন সাধ্য—আমি তেমনি ভাবে গেয়ে উঠি! মৌলিকতার দাবী আমার কিছু মাত্রও নেই।

"আমি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কাছে চির কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ, তিনি একদিন পুণ্য দ্বিপ্রহরে আমার সম্মুখে দর্শন দিয়ে জগতের আদি পুরুষকে আমার গুরু বলে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন।......যখন আমি ক্লান্তিভারে

পীড়িত হ'য়ে উঠেছিলাম, তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে আমাকে উজ্জ্বল অক্ষরের রূপে দর্শন দিয়েছিলেন।......

"আমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি, তিনি তাঁর মোহনরূপে আমার কাছে দর্শন দিয়ে তাঁর প্রেমলীলার বিষয়ে রসঘন রূপক ভাষায় কাব্যরচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং আমি আমার অক্ষমতা-জ্ঞাপন করায় তিনি ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর আমি তাঁর চরণে প্রণত হ'লে তিনি নিজেই এই কথাগুলি লিখে দিয়েছিলেন।"

মহাপুরুষেরা নীতিকথার চেয়ে নিজের জীবনের দৃষ্টান্তেই বেশী ভালোভাবে শিক্ষাদান করেন। শিল্পকলার কাজ পরোক্ষভাবেই যেমন প্রভাব বিস্তার করে, প্রকৃত উপদেশ বলেই মনে হয় না। রাজারা অনুশাসন দেন এবং আদেশ করেন, বন্ধুরা বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং উপদেশ দেন, কিন্তু প্রেমিকা প্রেমিকের অজ্ঞাতসারেই মধুরভাবে ইচ্ছানুযায়ী তাকে চালিত করেন। বেংকম্মার নাটকাবলী, গান ও কবিতাগুলি প্রেমিকার অর্ধস্ফুট ইচ্ছার মতো। এগুলি, এবং বিশেষভাবে তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তিনি তাঁর ভাবধারা ও আদর্শগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা এবং সিদ্ধির ভিত্তিভূমি হল নৈতিক শৃংখলা। বেংকম্মা যদি কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, তবে সেটা তাঁর তাপসী জীবনেরই ফলশ্রুতি। সাধুত্বের পরীক্ষা অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটনের দ্বারা পাওয়া যায় না, চরিত্রের নির্মলতাই প্রধান পরীক্ষা। একজন ঐন্দ্রজালিক অনেক অত্যাশ্চর্য ভোজবাজী দেখাতে পারে, কিন্তু তার মানেই সে যে সাধুপুরুষ তা নয়। এই সত্য বেংকম্মা নিম্নোক্তভাবে রূপায়িত করেছেন—

"কেউ কেউ নানারকম ছোট ছোট সিদ্ধি পাওয়ার জন্যে মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ইত্যাদি যোগাভ্যাস করে অজ্ঞলোকের কাছে তাদের ভোজবাজী দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এগুলো আসলে তুচ্ছ যোগ এবং সেই যোগীরাও বাজে লোক। ব্রহ্মজ্ঞানী সাধুপুরুষেরা রোগ, জরা ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে লালায়িত হন না।"

—(রাজযোগসার)

"যাঁরা জড়স্বভাব ও নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ ক'রে শুভচিন্তা সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, সৌম্যভাব এবং সর্বজীবে করুণায় স্থিতধী তাঁরাই সাধু এবং ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি।"

—(বেংকটাচল-মাহাত্ম্য)

"যোগাভ্যাস করা উচিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে। নিয়ত ধ্যানের অভাবে মন কাম ক্রোধ ইত্যাদির রিপুর অধীন হয়।"

"যিনি সুবিবেচনা, ত্যাগ, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-সংযম, সহিষ্ণুতা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ থেকে ব্রহ্মচর্য ও প্রসন্নতার চর্চা এবং শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে আস্থা রাখেন; যিনি পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখেন এবং পরদ্রব্যে লোভ করেন না;......যিনি ঈশ্বরের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন......তিনি ইহজীবনেই ঈশ্বরোপলব্ধি ও মোক্ষলাভ করেন।"

—(রাজযোগসার)

"মুক্তির প্রাসাদে প্রহরী হল এই চারটি গুণ—সৌম্যভাব, প্রসন্নতা, জ্ঞানীসঙ্গ এবং আত্মচিন্তা।"

—(বাশিষ্ঠ-রামায়ণ)

"যোগ-বাশিষ্ঠ", কিম্বা নামান্তরে বাশিষ্ঠ রামায়ণের মতো অন্য কোনো হিন্দু-দর্শনগ্রন্থে মানবিক প্রচেষ্টার উপর এতো বেশী জোর দেওয়া হয়নি। বেঙ্কম্মা অত্যন্ত সক্ষমভাবে "যোগ-বাশিষ্ঠের" কেন্দ্রগত শিক্ষাকে তাঁর সংকলন গ্রন্থে রূপ দান করেছেন। এতে মনে পড়ে ইংরেজ কবি-নাট্যকার বোমণ্ট এণ্ড ফ্লেচারের কথা—

> "মানুষই তার ভাগ্য তারা; যে মানুষ সৎ ও সম্পূর্ণ, তিনি সর্বজ্ঞান, সর্বপ্রভাব এবং সর্ব নিয়তির নিয়ন্তা, তাঁর কাছে কিছুই আগে বা পরে ঘটে না; আমাদের কর্মই আমাদের রক্ষাকর্তা, ভালো বা মন্দ যাই হোক; কর্মে পতন হলেই ধ্বংস।"

বেঙ্কম্মা তাঁর সংকলন গ্রন্থে কোন কর্ম করণীয় এবং প্রকৃত ত্যাগ কী, তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল ও উপযোগী ভাষায় "চূড়ালা ও শিখিধ্বজের" উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কী ভাবে রাণী কর্মব্যস্ত সাংসারিক জীবন যাপন ক'রে রাজ্যশাসনের কর্তব্য পালন করেও মুক্তিলাভ করেছিলেন; এবং রাজা তাঁর গৃহ সংসার ও রাজ্য ত্যাগ করা সত্ত্বেও মুক্তি পাননি; তারপর কীভাবেই বা রাণী রাজার বন্ধু ও উপদেষ্টা হ'য়ে তাঁকে মুক্তির পথে চালিত করেছিলেন। এ উপাখ্যানের শিক্ষণীয় নীতিটি খুবই স্পষ্ট। নারীরা রাজ্য-শাসন বা চরম অধ্যাত্মজ্ঞান ও মুক্তির সাধনায় পুরুষদের চেয়ে কম দক্ষ নয়। 'অর্ধাঙ্গিনী' এবং 'সহধর্মিণী' এই দুটি সংস্কৃত শব্দে যা বোঝানো হয় তা অত্যন্তই খাঁটি কথা। জীবনের যাত্রাপথে নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহায় এবং অধ্যাত্মপথের সহযাত্রী। তাদের পরস্পরের প্রতি মনোভাব ও সম্পর্কের মধ্যে ছোট বা বড়র প্রশ্ন ওঠে না।

আধুনিক জীবনের অনেক সমস্যারও সুন্দর সমাধান পাওয়া যায় বেঙ্কম্মার রচনাবলীতে। ব্রহ্মোৎসব নামে তিরুপতি-বেঙ্কটেশ্বরের একটি বাৎসরিক উৎসবের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে এখনো। আজো তিরুমালি পর্বতে তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত একটি ধর্মশালা দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী

ধর্মনেতাদের জীবনচরিতের মধ্যে কোথাও শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মতো কোনো নারী-ঋষি এবং শিক্ষাদাত্রীর জীবনেতিহাস দেখতে পাওয়া যায় না। অতীতে এমন পুণ্যবতী নারী ছিলেন যাঁরা চিরকুমারী থেকে একাকী নিঃসঙ্গভাবে আত্মোন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এমন মহিমময়ী নারীর উল্লেখও দেখা যায় যাঁরা যৌবনে বিবাহিতা হ'য়েছিলেন, কিন্তু পরে গৃহসংসার ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরান্বেষণে রত হ'য়ে ভগবদ্দর্শন লাভ করেছিলেন। ওঁদের কেউ কেউ প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ ও পারিবারিক অবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে তবে ঐ গ্লানিকর শৃঙ্খলগুলিকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। কারো কারো এমন দুর্ভাগ্য ছিল যে সহানুভূতি ও সাধারণজ্ঞান বিহীন স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে হ'য়েছিল—সেই স্বামীর অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি কোনো অনুরাগ বা ভক্তিভাব ছিল না, যিনি তাঁর উচ্চমনা ভক্তিমতী স্ত্রীকে নির্যাতন করতেন, এবং পরিশেষে যাঁর নির্যাতনের ফলে স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। অন্য কেউ হয়তো বিধবা হ'য়ে ঈশ্বরদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতাহীন পারিবারিক জীবনের বন্ধন কাটিয়ে ঈশ্বরোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সারদা দেবী ওঁদের কারো মতোই ছিলেন না। শৈশবেই তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল, কিন্তু তিনি স্বামীর সঙ্গে বাস করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করেননি। তাঁর মতো এমন নারীর দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁকে শৈশবে দেখেই অনুমান করা যেত যে সংসারে তিনি একটি মহৎ কর্তব্য সমাধানের জন্যেই এসেছেন। ঈশ্বরকে তিনি লাভ করেছিলেন বিশ্বজননীরূপে, এবং তাঁর নিজের মধ্যে ও তাঁর 'স্বামী'র মধ্যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর স্বামীও জগদম্বাকে নিজের মধ্যে এবং তাঁর 'স্ত্রী'র মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পৃথিবীতে এমন দম্পতি আর কখনো দেখা যায়নি; তাঁদের মতো এমন উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিও আগে কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। তাঁরা দুজন বিবাহিত-অবিবাহিত এবং সাধারণ মানুষ ও সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী অভেদে সমস্ত নারীপুরুষেরই নৈতিক অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রতীকের মতো হ'য়ে আছেন।

জন্ম ও পিতৃপরিচয়

শ্রীসারদামণি দেবী শ্রীশ্রীমা নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীর স্মৃতিতেই এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হ'য়েছে। বাংলা দেশে বাঁকুড়া জেলার

জয়রামবাটী নামে এক ছোট গ্রামে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। চারিদিকের সবুজ মাঠ ও তৃণাচ্ছাদিত গোচারণভূমি, দামোদর নদী, পুকুর ও গাছপালা নিয়ে এই শ'খানেক লোকের বাস গ্রামটি সুন্দর এক পল্লী পরিবেশের মধ্যে জীবন্ত আছে আজো। শত শত ভক্ত এখন সারদা দেবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এই গ্রামে তীর্থযাত্রায় আসেন।

তাঁর পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী দরিদ্র হলেও অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। রামচন্দ্রের উপার্জন হত প্রধানত কয়েক বিঘা ধানজমি, যজমানী কাজ ও পৈতে বিক্রী থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নির্বিচারে দান গ্রহণ করতেন না। তিনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। দুর্ভিক্ষ বা আকালের সময় বাড়তি ধান নিজের পরিবারের খরচের জন্যে মজুত না রেখে ক্ষুধিত ও আতুর ব্যক্তিদের সেবায় ব্যয় করতেন।

সারদা দেবীর জীবন যেন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও দৈবী অনুগ্রহের ছকের মধ্যেই গাঁথা ছিল। একবার রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরী স্বপ্ন দেখলেন যে, এক ঐশীশক্তি তাঁদের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। তাঁরা একে এক বিরল সৌভাগ্যের আশীর্বাদ হিসাবেই গ্রহণ করলেন। যথাকালে সারদা দেবী জন্ম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি পিতামাতার ভালোবাসার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা এবং স্বর্গীয় আনন্দ একাকার হ'য়ে গিয়েছিল।

বাল্যকালে সারদা দেবী ভারতবর্ষের অন্য যে কোনো গ্রাম্য বালিকার মতোই অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছিলেন। তিনি খেলাধুলা করতেন, কিন্তু ছেলে-মানুষী খেলার দিকে তাঁর কোনো ঝোঁক ছিল না। তাঁর খেলাঘরে পুতুল ছিল। কিন্তু তিনি কালী ও লক্ষ্মীর প্রতিমাকে ফুল-বেলপাতায় পূজা করতেই ভাল-বাসতেন। আদ্যাশক্তির সঙ্গে একপ্রকার একাত্মতা অনুভব করে তিনি গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে তাঁকে ধ্যান করতেন। এইভাবে ধর্মের পাঠশালায় তাঁর হাতে খড়ি হচ্ছিল। দশবছর বয়সেই তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতা বিকশিত হ'তে শুরু করল। এর আগেও তাঁর ভগবদ্ অনুভূতি এবং স্বপ্নদর্শন ঘটত। এসব অভিজ্ঞতা একজন সন্ন্যাসী তাঁর পরিণত বয়সে লাভ করলেও সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করতেন। তিনি যখন পূর্ণ যৌবনে কামারপুকুরে ছিলেন তখন স্নানের জন্যে একাকী অনিচ্ছুকভাবে পুকুরের ঘাটে যাওয়ার সময় দেখতে পেতেন, কোথা থেকে তাঁর সমবয়সী অষ্টকন্যা আবির্ভূতা হ'য়ে তাঁকে সঙ্গে করে পুকুরে নিয়ে

যেতেন। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কী ক'রে তিনি এমন দেবতার অনুগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ লাভ করেছিলেন।

পুঁথিপড়া বিদ্যা তাঁর ছিল না। শৈশবে তাঁর বর্ণপরিচয় হয়, এবং গ্রামের টোলে ভর্তি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউই তাঁকে পড়াতেন না, নিয়মিত বিদ্যালয় যাওয়ারও ব্যবস্থা করতেন না। শিক্ষার দিকে তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা কন্যা, কাজেই হিন্দু বালিকার পক্ষে যা অপরিহার্য সেই পারিবারিক শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর মাকে তিনি সর্বপ্রকার সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। এইভাবেই তিনি মার সঙ্গে রান্নাঘরে এলেন এবং দরকার মতো নিজেও রান্না করতে শুরু করলেন। বাড়ীর অন্যান্য কাজও অবশ্য তাঁকে করতে হত।

ভারতের সংস্কৃতি কেবল পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাই আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। এই দেশ তার সুউচ্চ সংস্কৃতি, ধর্ম এবং দর্শনগুলির শ্রেষ্ঠ যা কিছু জাতীয় ঐতিহ্য তা প্রচার করার নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। মন্দিরের উৎসব পালন, রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্য পাঠ, যাত্রাভিনয়, পারিবারিক বিগ্রহের দৈনন্দিন পূজা, এবং উপলক্ষ্য উপস্থিত হলে পরিবারের সকলে মিলে একত্রে কোনো ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করা—এই সব মিলেই চরিত্রের সুষম বিকাশের সুযোগ দান করত। এ শিক্ষা অবশ্য বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যাঁরা এসব আদর্শ ও ভাবধারায় শিক্ষিত হতেন তাঁরা অন্যকেও তার অংশ দিতে পারতেন। সারদা দেবী এই সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মসঙ্গীত ও ঐতিহ্যের প্রবাহে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। তাছাড়া ঘটনাচক্রে ছয় বৎসর বয়সেই তিনি এমন একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যিনি সৎপরামর্শ ও নির্দেশ দিয়ে তাঁর জীবনকে সুগঠিত ক'রে পূর্ণতার পথে পরিচালিত করেছিলেন।

বিবাহ

সেকালে প্রচলিত প্রথা অনুসারে ছয় বৎসর বয়সেই তেইশ বৎসর বয়স্ক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদামণির বিবাহ হয়। পিতামাতার ইচ্ছানুসারে এই বিবাহ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সুগভীর তপশ্চর্যায় দিন অতিবাহিত করছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার জয়রামবাটীর পাঁচ মাইল দূরে কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তাঁর তেমন মন ছিল না। ফলে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদ্বিগ্ন হ'য়ে

তাকে দক্ষিণেশ্বরে পুরোহিত হিসাবে কাজে লাগিয়ে দেন। এতে একান্নবর্তী পরিবারের আর্থিক সাহায্য হবে, এও তাঁর একটা আশ্বাস ছিল। সতের বৎসর বয়সেই রামকৃষ্ণ এখানে কঠিন তপশ্চর্যা শুরু করেন। সাতমাসের মধ্যেই তাঁর এমন সব আশ্চর্য ব্যবহার ও সাংসারিক ব্যাপারে অনাসক্তি প্রকাশ পেতে লাগল যে, ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষায় অনভিজ্ঞ তাঁর চারিপাশের লোকেরা তাঁকে উন্মাদ বলেই মনে করতে লাগল। তাঁর মা ও ভাই তাঁকে চিকিৎসার জন্যে কামারপুকুরে নিয়ে এলেন। তাঁরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, রামকৃষ্ণ সংসারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে কী যেন এক অদৃষ্টবস্তুর জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, আর মাঝে মাঝে "মা, মাগো" বলে করুণভাবে কেঁদে উঠছেন। এই অবস্থায় বিবাহের ফলে যদি তাঁর মন স্বাভাবিক সাংসারিক ব্যাপারে ফিরে আসে এ আশায় রামকৃষ্ণের মা-ভাই তাঁর বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু উপযুক্ত বয়সের পাত্রী না পেয়ে তাঁরা হতাশ হতে লাগলেন। মানুষ যখন গভীর ধর্মকর্মে কিম্বা অধ্যাত্ম-সাধনায় অগ্রসর হয়, তখন তার পক্ষে বিবাহ বা অন্যভাবে সাংসারিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে অনিচ্ছুক হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য তাঁর মা ও ভাই যে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং মা-ভাই যখন মনোমত পাত্রী খুঁজে পাচ্ছিলেন না তখন একদিন তিনি হঠাৎ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁদের জানালেন, "অযথা এখানে-ওখানে খুঁজে মরছ। জয়রামবাটীতে যাও, সেখানে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আমার জন্যে নির্দিষ্ট পাত্রীকে পাবে।"

শুভ সময়ে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল। এরপর উনিশ মাস শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গ্রামে থেকে গেলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সারদা দেবীর বয়স হ'য়েছিল সাতবছর। প্রথা অনুসারে রামকৃষ্ণ শ্বশুরালয়ে গেলেন, এবং ফেরার সময় সারদা দেবীকে নিজের বাড়ীতে তাঁর মার কাছে নিয়ে এলেন। তারপর তিনি যখন দক্ষিণেশ্বরে চলে গেলেন, সারদা দেবী পিতৃগৃহে ফিরে গেলেন।

কয়েকবছর কেটে গেল। সারদা দেবী তাঁর পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণেই বেড়ে উঠতে লাগলেন। তিনি সংসারের কাজে তাঁর পিতামাতাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কামারপুকুরে এলেন। এই সময় সারদা দেবীর বয়স হয়েছিল চৌদ্দ বৎসর, এবং তিনমাস তিনি স্বামীর বাড়ীতে এসে স্বামী সহবাস লাভ করেন। রামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অত্যন্ত সদয়, কোমল ও সহৃদয় ব্যবহার করতেন। তিনি তাঁকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতেন—রান্নাবান্না, গৃহকর্ম,

সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন থেকে ঈশ্বরের ধ্যান, অধ্যাত্মজীবন এবং আত্মোপলব্ধি, কিছুই তিনি বাদ দিতেন না। এসময়ে সারদা দেবী বুঝতে শিখেছেন যে তিনি বিবাহিতা নারী। তিনি স্বামীসঙ্গে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করতেন, এবং এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর স্বামীর ঈশ্বর প্রেম অতি গভীর, আর তাঁর দেহমনের পবিত্রতাও অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু অন্য দিকে তিনি অত্যন্তই স্বাভাবিক ও বহুবিধ মানবিক গুণের অধিকারী। এইসব দিনের কথা মনে করে তিনি পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্যাদের বলতেন, "আমি তখন মনে করতাম, আমার বুকের মধ্যে যেন শান্তির কলসী রয়েছে। সব সময়েই এটা আমি অনুভব করতাম। এ যে কী জিনিষ তা অন্যকে বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন।"

আরো চার বছর কেটে গেল। সারদা দেবী তখন অষ্টাদশী তরুণী। তাঁর মনে রামকৃষ্ণের স্মৃতি ছিল অতি সুমধুর, এবং বয়স হওয়ার পর থেকে তিনি মনে মনে তাঁর সান্নিধ্য চাইতেন। তাঁর হৃদয় তাঁকে বলত, চারবছর আগে যিনি এত সদয় ব্যবহার করেছেন, তিনি তাঁকে ভুলে যাবেন না, যথাসময়ে তিনি নিজেই তাঁকে কাছে ডেকে নিবেন। কিন্তু মুখে তিনি এসব কথা কিছুই প্রকাশ করতেন না এবং মনের বাসনা উদ্বেগ সব কিছু সংসারের কাজের মধ্যে মা বাবাকে সাহায্য ক'রে ভুলে থাকতে চাইতেন।

এর আগেই তাঁর কানে এমন গুজব এসে পেঁছেছিল যে রামকৃষ্ণ উন্মাদ হ'য়ে গেছেন। এমন কি মাঝে মাঝে কোনো কোনো প্রতিবেশী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে এমন কথাও সহানুভূতির সঙ্গে বলতেন, "আহা, শ্যামার মেয়েটির এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে হ'য়েছে।" সারদা দেবী নিজে অবশ্য কিছুতেই তাঁদের সামনে আসতে চাইতেন না, পাছে এসব কথা তাঁকে শুনতে হয়। কিন্তু এসবের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে রামকৃষ্ণকে দেখার ইচ্ছা প্রবলতর হত। নিজে স্বচক্ষে দেখে লোকে যা বলত তার সত্যতা যাচাই করে নিতে চাইতেন। সেজন্যে তিনি রামকৃষ্ণের বাসস্থান দক্ষিণেশ্বরে যেতে চাইতেন।

সারদার পিতা তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে রাজি হলেন। রেল বা ষ্টীমারের ব্যবস্থা না থাকায় সারদা দেবী প্রথমে কিছুটা পথ পাল্‌কীতে এসে তারপর পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। এতদূরের রাস্তায় হাঁটা তাঁর অভ্যাস ছিল না। ফলে যাত্রার তৃতীয় দিন তিনি অসুস্থ হ'য়ে জ্বরাক্রান্ত হলেন। সন্ধ্যায় তাঁরা এক সরাইখানায় বিশ্রাম নেওয়ার সময় এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে সারদা দেবীর দেহমন অভাবিত রকম সুস্থ হ'য়ে উঠল! পরবর্তী জীবনে তিনি এসম্বন্ধে নিজেই বলেছেন—

"জ্বরে বেহুঁস হ'য়ে পড়েছিলাম। লজ্জা সরম কিছুই ছিল না। ঠিক সেই সময় একজন স্ত্রীলোককে দেখলাম। তাঁর গায়ের রং ঘোর কালো। আমার পাশে বসে রয়েছে। কিন্তু কালো হলেও তার মতো এমন সুন্দর মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। সে তার ঠান্ডা নরম হাত দিয়ে আমার কপাল টিপে দিচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমার শরীরের তাপ কমে এল। আমি তাকে শুধোলাম, "কোথা থেকে এলে তুমি?" সে বলল, "দক্ষিণেশ্বর থেকে।" এই কথা শুনে আমার মুখে রা সরল না। আমি বলে উঠলাম, "দক্ষিণেশ্বর থেকে! আমিও আমার বরকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছি। মাঝখানে এই জ্বর হ'য়ে দেরি করিয়ে দিল।" একথার পিঠে সে বলল, "চিন্তা করো না। তুমি শিগগিরই ভালো হ'য়ে উঠে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে তোমার বরকে দেখতে পাবে। তোমার জন্যেই আমি তাকে সেখানে রেখেছি।" আমি তাকে বললাম, "বটে! তাই নাকি? কিন্তু তুমি আমার কে?" "আমি তোমার বোন," সে বলল। একথায় আমি খুব অবাক হ'য়ে গেলাম। আর এই কথাবার্তার পরই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।"

সকালে তিনি দেখলেন তাঁর জ্বর ছেড়ে গেছে। তখন সকলের সঙ্গে তিনি আবার হেঁটে চলতে শুরু করলেন।

দক্ষিণেশ্বরে

দক্ষিণেশ্বরে পেঁাছে সারদা দেবী সোজা রামকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন কতো সদয় হৃদয় ছিলেন রামকৃষ্ণ। 'এই যে, তুমি এসে গেছ।' তাঁকে এই বলে একজনকে ডেকে তিনি মেঝের ওপর একখানা মাদুর পেতে দিতে বললেন। দীর্ঘ পথভ্রমণের ক্লান্তি এবং জ্বরের জন্যে সারদা দেবী তখনো কাতর ছিলেন বলে রামকৃষ্ণ তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন। সারদা দেবীর সব থেকে বড় দুর্ভাবনাটাই দূর হ'য়ে গেল। তিনি স্বচক্ষেই দেখতে পেলেন, রামকৃষ্ণের অপ্রকৃতিস্থতার বিষয়ে জনরব আসলে অজ্ঞ সংসারীলোকেদের গালগল্পমাত্র। এরা তাঁর অধ্যাত্ম-মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে যা-ইচ্ছে-তাই ব'লে বেড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীমা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। মাঝে মাঝে কিছুকালের জন্যে তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে যেতেন মাত্র। প্রথম দিকে তিনি দেখতে পেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রিতেও সমাধিস্থ হ'য়ে যেতেন। তিনি জানতেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একজন দৈবী অংশের মানুষ যিনি মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি বা স্তবপাঠ শুনে কিম্বা কোনো পুণ্যকথা আলোচনা করতে করতেই সমাধিস্থ হ'য়ে যেতে পারেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের এই সুখসৌভাগ্যময় দিনগুলির কথা স্মরণ করে তিনি পরে বলতেন,—

"তাঁর যেরকম তন্ময়ভাব হত তা বলে বোঝানো যায় না। দিব্যোন্মাদনার অবস্থায় কখনো তিনি হাসতেন কখনো বা কাঁদতেন, কখনো বা গভীর সমাধির অবস্থায় স্থির হ'য়ে থাকতেন। এমন ভাবে কখনো কখনো সারা রাতই কেটে যেত। সেই দিব্যভাব দেখে অবাক হ'য়ে যেতাম, আর আমার সারা শরীর কাঁপতে থাকত। ভোরের আশায় অপেক্ষা করতাম আমি। তখন তো আমি দিব্যোন্মাদনা কী জিনিষ তা জানতাম না। একরাত্রে তাঁর সমাধি অনেকক্ষণ ধরে চলল। ভয় পেয়ে আমি হৃদয়কে[১] ডেকে পাঠালাম। সে এসে ওঁর কানে নাম জপ করতে লাগল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। এই ঘটনার পর উনি আমার ভয়ের কথা জানতে পেলেন। উনি আমাকে সমাধির কোন্ অবস্থায় কোন্ নাম জপ করে শোনাতে হবে তা নিজেই শিখিয়ে দিলেন। তারপর থেকে আমার ভয় অনেক কমে এল। ঠিক মতো নাম শোনাতে পারলেই ওঁর জ্ঞান ফিরে আসত। কিন্তু এরপরও অনেক সময় আমি সারারাত জেগে কাটাতাম, কখন যে ওঁর সমাধি হবে তার তো ঠিক ঠিকানা কিছু নেই! আমার এ অসুবিধাও ক্রমে উনি জানতে পারলেন। তিনি বুঝলেন, অনেকদিন পার হ'য়ে গেলেও ওঁর ঐ সমাধির ভাবটায় আমি রপ্ত হ'তে পারছিলাম না। তাই উনি আমাকে আলাদা ভাবে নহবৎখানায়[২] ঘুমাতে বললেন।"

সারদা দেবীর মাতৃভাব

ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের সমস্তরকম সাধন পদ্ধতিতেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং বহুরকম অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও তিনি বেশী যা করেছিলেন তা এই যে, তিনি অন্যান্য ধর্মের সত্যও উপলব্ধি করেছিলেন, এবং বুঝতে পেরেছিলেন সব ধর্মমতই এক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। তাঁর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর।

বিবাহের পর যখন সারদা দেবীর দেহে যৌবন আসছিল তখন তিনি বিশ্বজননীর কাছে কায়মনে প্রার্থনা করেছিলেন যে তাঁর মন থেকে যেন জৈব লালসা দূর হ'য়ে যায় এবং তিনি পবিত্র এবং অকলঙ্কিত থাকতে পারেন। দক্ষিণেশ্বরে

---

১ রামকৃষ্ণ দেবের জনৈক আত্মীয়।

২ কালীবাড়ীর নহবৎখানা, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ দেবের মাতা ও সারদা দেবীর বাসগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হত।

বাসের প্রথমদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি স্বামীকে সাংসারিক জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে এসেছেন কিনা, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তা করব কেন? তোমার ধর্মজীবনে সাহায্য করার জন্যেই আমি এসেছি।"

প্রথম দিকে যখন সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শী পূজা করতেন। তিনি আদ্যাশক্তির আসনে সারদা দেবীকে বসতে বলতেন। রাত নটায় নিয়মমত যাগযজ্ঞ মন্ত্র দিয়ে পূজা আরম্ভ হত। সারদা দেবীর মনে অধ্যাত্মবোধ জেগে উঠত। কয়েকবার তাঁর দেহে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে আদ্যাশক্তির আবির্ভাব কামনা করে প্রার্থনা করতেন—

"জগদম্বে, শাশ্বত কুমারী, সর্বশক্তির অধীশ্বরী, সৌন্দর্যরূপিণী, আমার সম্মুখে মুক্তির পথ খুলে দাও। এই নারীর দেহমন পবিত্র করে এর ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে মঙ্গল কর।"

এই পূজার সময় সর্বক্ষণ সারদা দেবী অর্ধধ্যানস্থ অবস্থায় থাকতেন, এবং পূজার শেষে গভীর ভাবে সমাধিস্থ হ'য়ে পড়তেন। পূজক ও পূজিতার এটা ছিল ঐশী মিলন। তাঁরা অনুভব করতেন যে তাঁরা একই ব্রহ্ম।

দীর্ঘকাল এইভাবে আধ্যাত্মিক আবেশের ভিতর দিয়ে কেটে যেত। রাত্রির দ্বিতীয় যামে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা দৈহিক সম্বিত ফিরে পেতেন। তখন তিনি বিশ্বজননীর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করতেন। সম্মুখের জাগ্রত দেবীর কাছে সাধনার জল, জপের মালা, এমনকি নিজেকেও উৎসর্গ ক'রে দিতেন। তখন তিনি এই মন্ত্র উচ্চারণ করতেন—

"দেবী তোমাকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। তুমি শিবপ্রিয়া, ত্রিনয়না, স্বর্ণ-বর্ণা, সর্বভূতের আত্মারূপিণী, আশ্রয়দাত্রী, সর্বমোক্ষদায়িনী, সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপা।"

তান্ত্রিকমতে পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে সাধক প্রথমে দেবতাকে নিজের মধ্যে আবাহন করেন, তারপর পূজার শেষে দেবতাকে আবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্হিত হতে প্রার্থনা জানান। তাই কিছুকালের জন্যে সাধক দেবতার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করলেও, পরে আবার সাংসারিক চেতনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন এবং পরম আত্মজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। রামকৃষ্ণ যখন সারদা দেবীর মধ্যে বিশ্বজননীকে সঞ্চারিত করতেন, তখন সারদা দেবী উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করতেন। তারপর তিনি যখন সাংসারিক জ্ঞান ফিরে পেতেন, তখনও তিনি ঈশ্বর-সাযুজ্যের

অনুভূতি হারিয়ে ফেলতেন না, বরং এই অনুভূতি তাঁর মনে চিরস্থায়ী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া, এই পূজার দ্বারা এটাও বোঝা যায় যে তিনি রামকৃষ্ণের জীবনে, সাধনার ফলে এবং অধ্যাত্ম চেতনায় প্রকৃত সহধর্মিণীত্ব লাভ করেছিলেন। এরপর থেকে তাঁর দেহমন আদ্যাশক্তিরই আধার হ'য়ে উঠেছিল; আর সেই আদ্যাশক্তির লীলা প্রকটিত হত রামকৃষ্ণের দেহ ও মনে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আদ্যাশক্তিরই প্রকাশ দেখতে পেতেন। তাঁদের মন কখনো চেতনার নিম্নতর স্তরে নেমে আসত না। দুজনেই তাঁরা সমান পুণ্যবান ছিলেন। একজন ছিলেন পরম পুরুষ, অন্যজন পরমা প্রকৃতি। সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তের কাছে, নিজের ভক্তের কাছে এবং উভয়ের মিলিত ভক্তের কাছে ছিলেন মাতৃস্বরূপিনী। এবং কেবল তাই নয়, যে আদ্যাশক্তির আরাধনা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তিনি ছিলেন সেই আদ্যাশক্তিরই অবতারস্বরূপিনী। কাজেই এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তিনি আজ শ্রীশ্রীমা নামে পরিচিতা। এই নামের মধ্যে যুগপৎ ভক্তি ও ভালবাসা একাকার হ'য়ে আছে।

হিন্দুধর্মের চিরকালের শিক্ষা অনুসারে হিন্দুনারীরা স্বামীকে দেবতারূপে গ্রহণ ক'রে গার্হস্থ্যজীবনকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হন। কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থভাবে স্বামীসেবায় নিযুক্ত থেকে হিন্দুনারীরা মানবিক ত্রুটি অতিক্রম ক'রে দেবমহিমা লাভ করেন এবং এতেই তাঁদের অধ্যাত্ম উন্নতি সাধিত হয়। সারদা দেবীর অসীম সৌভাগ্য এই যে, তাঁর স্বামী ছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব। ফলে তাঁর কাছে স্বামীসেবাই ছিল ঈশ্বর-আরাধনা। তাঁর আগ্রহশীল মনে রামকৃষ্ণের শিক্ষা খুবই ফলপ্রসূ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর নিজের কথাতেই তাঁর অন্তর্জীবন সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।—

"দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় আমি ভোর তিনটেয় উঠে ধ্যানে বসতাম। প্রায় আমি একেবারে ডুবে যেতাম ধ্যানের মধ্যে। একবার এক জ্যোৎস্নার রাতে আমি নহবতের সিঁড়ির কাছে বসে জপ[১] করছিলাম। চারদিক চুপচাপ। উনি যে কখন ওপথ দিয়ে গেছেন তা আমি জানতেও পারিনি। অন্যদিন আমি তাঁর খড়মের আওয়াজ পেতাম, কিন্তু এদিন কিছুই শুনতে পাইনি। ধ্যানে একেবারে ডুবে গিয়েছিলাম আমি।......এদিন হাওয়ার জন্যে আমার পিঠ থেকে আঁচল সরে গিয়েছিল, কিন্তু আমার সেদিকে খেয়াল হয়নি। মনে হয় যোগেনবাবা[২] ঐ পথ দিয়ে ওঁর কমণ্ডুলু নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল।

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে যে মন্ত্র দিয়েছিলেন তারই জপ।

২ স্বামী যোগানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য।

"আহা, কী আনন্দেই কেটেছে সে দিনগুলো। জ্যোৎস্নার রাতের চাঁদের দিকে চেয়ে আমি হাতজোড় করে প্রার্থনা করতাম, 'ঐ চাঁদের আলোর মতোই আমার হৃদয় যেন পবিত্র হয়!' স্থির ভাবে ধ্যান করতে পারলে ঈশ্বরকে বুকের মধ্যেই দেখা যায়, আর তাঁর কথাও শুনতে পাওয়া যায়। এমন লোকের মনে যদি কোনো ইচ্ছা জাগে, তখনই তা পূর্ণ হয়। শান্তিতে মন ভ'রে ওঠে। আহা, কী মনই ছিল তখন আমার! বৃন্দে দাসীর হাত থেকে একদিন একখানা কাঁসার থালা পড়ে গেল মেঝেতে। শব্দটা যেন আমার বুকের মধ্যে বিঁধে গেল।[১]

"পূর্ণ সিদ্ধির অবস্থায় জানা যায় যে, নিজের বুকের মধ্যে যিনি আছেন, অপরের বুকের মধ্যেও তিনি আছেন—তারা যদি দাবিয়ে রাখা, খেদিয়ে দেওয়া, জল-অচল বা জাতে পতিত মানুষ হয়, তবুও! এ বোধ মনে এলে আর কোনো অহঙ্কার থাকে না।"

এমন কি শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষও সারদা দেবীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতার কথা নিজে মুখে স্বীকার করে গেছেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "উনি যদি অতো পবিত্র না হতেন, কে জানে আমি আত্ম-সংযম হারিয়ে ফেলতাম কিনা। বিয়ের পর আমি মাকে ডেকে বলতাম, 'মাগো, আমার বৌয়ের মন থেকে ভোগবাসনা সব উড়িয়ে দে।' তারপর যখন আমি ওঁর সঙ্গে বাস করতে লাগলাম, তখন দেখলাম মা আমার প্রার্থনা সত্যিই মঞ্জুর করেছেন।"

বাস্তবিক তাঁরা দুজনেই ছিলেন মহামানব ও মহামানবী। জগন্মাতাকে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। অন্য নারী-পুরুষ থেকে তাঁদের পার্থক্য কতো গভীর। এটা মনে রাখা ভাল যে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করলেন, তখন তের বৎসর স্বামী সেবার পর সারদা দেবী কেঁদে উঠলেন এই বলে, "মাগো, আমাকে ফেলে কোথায় গেলি?"

আর শ্রীরামকৃষ্ণও এইভাবে সারদা দেবীর মধ্যে জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একদিন স্বামীর পাদসেবা করতে করতে সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার মধ্যে তুমি কী দেখতে পাও?" তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "যে মা মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা হ'য়ে আছে, যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন এবং এখন

---

[১] শ্রীশ্রীমা তখন নহবতে ধ্যান করছিলেন। শব্দটা তাঁর কানে বাজ পড়ার মতো মনে হল, তিনি কেঁদে ফেললেন। যোগাচার্য পতঞ্জলির মতে, মন যখন গভীর ভাবে ধ্যানস্থ হয়, তখন সামান্যতম শব্দও বজ্রপাতের মতো মনে হয়।

নহবৎ বাড়ীতে রয়েছেন সেই মা-ই আমার পদসেবা করছেন। আমি তোমাকে সেইভাবেই দেখি, মায়ের মতো।"

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ মতোই সারদা দেবী অধ্যাত্ম-সাধনা করতেন। এর মধ্যে জপ আর ধ্যান ছিল প্রধান। স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জন্যে তিনি সযত্নে রান্না করতেন ও খাবার পরিবেশন করতেন। তাছাড়া অন্যান্য ফাইফরমাসও ছিল। এইভাবে স্বামীসেবা করার ফলে তিনি সেই যুগাবতারের নিকটসান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, এবং তাঁদের জীবন ওতোপ্রোতভাবে একাকার হ'য়ে গিয়েছিল। ফলে সারদা দেবীও অধ্যাত্মসাধনা ও ঐশীচেতনার উচ্চ মার্গে আরোহণ করেছিলেন।

এইসব গভীর ধর্মসাধনা ও অধ্যাত্মসিদ্ধির পর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন যে তাঁর তিরোধানের পরও শ্রীশ্রীমা নরধামে থেকে তাঁর বাণী প্রচার করবেন। তিনি সারদা দেবীকে বলেছিলেন, "চারদিকের মানুষগুলো অন্ধকারের কীটের মতো বাস করছে। তুমি ওদের দেখো।" তিনি স্ত্রীকে মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে অন্যকে কী করে দীক্ষা দিতে হয় তা শিখিয়ে দিয়েছিলেন; কী ভাবে অধ্যাত্ম-উপদেশের কাঙালদের পথ চলতে সাহায্য করতে হয় তাও তিনি বলে দিয়েছিলেন। সারদা দেবী পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "এসব মন্ত্রতন্ত্র আমি ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। যে কেউ এ পথে চলবে তারই মুক্তি হ'য়ে যাবে।" কাশীপুরে যখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সারদা দেবীকে কাতরভাবে বলেছিলেন, "হ্যাঁগো, তুমি কি কিছুই করবে না? সবই কি আমাকে করতে হবে?" সারদা দেবী উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি মেয়ে মানুষ, আমি কী করব?" তার উত্তরে উনি বললেন, "না, না, অনেক কিছু করার আছে তোমার।" [১]

তাঁর স্বামীর মতোই সারদা দেবী ছিলেন নিষ্কলুষচিত্ত মানুষ। ধন সম্পদ ইত্যাদির মোহ তিনি যেমনভাবে ছেড়েছিলেন তাতেই বোঝা যায় ত্যাগের আদর্শকে [২] তিনি কত সার্থকভাবে নিজের জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। সত্যিই তিনি স্বামীর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য পাত্রী ছিলেন। কত শত ভক্তই না পরে তাঁর উপদেশ পেয়ে ধন্য হ'য়েছে।

---

১ এখানে গুরু হিসাবে কাজ করার কথা বলা হচ্ছে।

২ একদিন জনৈক ধনী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক শ্রীরামকৃষ্ণের নামে ব্যাঙ্কে ১০,০০০ টাকা জমা দিতে চেয়েছিলেন, যাতে সংসারের অভাব অনটন তাঁকে স্পর্শ না করে। শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শের সঙ্গে এ প্রস্তাব একেবারেই খাপ খায় না কাজেই এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন না। তবে তিনি বললেন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি রাজী হলে ঐ টাকা তাঁর নামে জমা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শ্রীশ্রীমাও এ প্রস্তাব এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে এতেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণেরই টাকা নেওয়া হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আদর্শনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।

প্রথমবার সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর থেকে জয়রামবাটীতে এসেছিলেন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। এসে কয়েকমাস ছিলেন দেশের বাড়ীতে। ১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটল। তখন এই শোকের সময় তিনি তাঁর মায়ের কাছে একটা মস্ত বড় সহায় হ'য়ে উঠেছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন তিনি ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে। সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ আমাশয় রোগে ভুগছিলেন, তাঁকে সেবা করতে লাগলেন সারদা দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণ সেরে উঠলেন, কিন্তু সারদা দেবী পড়লেন ঐ অসুখে। কিছুটা সেরে ওঠার পর ১৮৭৫ সালে তিনি আবার বাপের বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে অসুখটা আবার বেড়ে উঠল এবং ঔষধপত্রে কোনো কাজ দিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। তখন সারদা দেবী দৈব আদেশ পাওয়ার বাসনায় সিংহবাহিনী দেবীর মন্দির দ্বারে উপবাস ব্রত গ্রহণ করলেন। তারপর শ্রীশ্রীমা লক্ষ্য করলেন যে কিছুকালের মধ্যেই দেবী তাঁকে দুটি ঔষধের বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলেন। একটি প্রকটিত হল সারদা দেবীর মার কাছে, সেটা আমাশয়ের ঔষধ। অন্যটি পেলেন তিনি, তাঁর চোখের ব্যারামের ঔষধ। দুটি ঔষধই পরীক্ষা ক'রে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল।

কিন্তু শ্রীশ্রীমা আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। এবারে অসুখ হল প্লীহাবৃদ্ধি। এ অসুখ থেকে সেরে উঠে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তৃতীয়বারের জন্যে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্ডী দেবীর মৃত্যু ঘটেছে। সারদা দেবী পরের বার দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, কিন্তু ছিলেন খুবই অল্প সময়। ১৮৮৪ এবং ১৮৮৫ সালেও তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। এরমধ্যে একবার জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পথে একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। এই জঙ্গলে তখন ডাকাত ছিল। একটি পথিকদলের সঙ্গেই তিনি যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে হাঁটছিলেন বলে তাদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছিলেন। দলটা চোখের বাইরে চলে যাওয়ার পর তিনি এক ডাকাত ও তার স্ত্রীর সাক্ষাৎ পেলেন। বিপদ বুঝতে পেরে মনে মনে খুব ভয় পেলেও তিনি মাথাঠান্ডা রাখলেন। তাদের বাবা আর মা বলে ডেকে নিজেকে পথহারানো মেয়ে বলে তিনি তাদের মন জয় করে নিলেন, এবং তারা তাঁকে সেই বিপজ্জনক স্থানটুকু পার করে দিল। তারপর তাঁর লাবণ্য ও মিষ্টব্যবহারে, সরলতা ও নির্ভর-

শীলতায় বিগলিত হ'য়ে তারা তাঁকে তারকেশ্বরে এনে দলের সঙ্গে নাগাল ধরিয়ে দিল এবং নিজেরা বিদায় নিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হ'য়ে শয্যাগত ছিলেন। তাঁকে প্রথমে ১৮৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্যামপুকুরে আনা হল, তারপর তিন মাস পরে কাশীপুরে নিয়ে যাওয়া হল। শ্রীশ্রীমা তাঁর সেবাশুশ্রূষা ও নিয়মমত পথ্যাদি তৈরী করতেন।

কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা সত্ত্বেও যখন শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখ একভাবেই চলতে লাগল তখন শ্রীশ্রীমা তারকেশ্বরে শিবের কাছে হত্যা দিয়ে দৈবকৃপা ভিক্ষা করতে গেলেন। দুইদিন তিনি নিরম্বু উপবাস ক'রে হত্যা দিলেন। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে তিনি এক আশ্চর্য শব্দ শুনে বিস্মিত হলেন। তখনই তাঁর মনে হল, "স্বামী কে আর স্ত্রীই বা কে? এ সংসারে আমার আত্মীয় কোন্ জন? এভাবে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি কেন?" তিনি বলেছিলেন, "এইভাবে ওঁর জন্যে আমার সমস্ত বন্ধন ঘুচে গেল, মনে এল অসীম বৈরাগ্যভাব। পরদিন সকালে যখন কাশীপুরে ফিরে এলাম, উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিগো, পেলে কিছু? খাঁটি কথা তো এই যে, সবই মায়া, তাই নয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণও এইসময় স্বপ্ন দেখছিলেন যে একটা হাতি যেন ঔষধ আনতে বেরিয়ে পৃথিবীটা খুঁড়ে তছনছ করছে। শ্রীশ্রীমা স্বপ্ন দেখেছিলেন, মা কালীর মূর্তির মুণ্ড যেন একদিকে ঝুলে পড়েছে। তাঁর নিজের ভাষায় ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম। —"আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাগো তুই ঘাড় কাৎ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' মা কালী বলল, 'এইজন্যে।' বলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গলার ঘা দেখালেন, তারপর বললেন, 'আমারও যে গলায় ঐ হয়েছে।'"

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট দেহরক্ষা করলেন। শ্রীশ্রীমার হৃদয় দুঃখ ও শোকে আপ্লুত হ'য়ে উঠল। দাহের পর হিন্দুনারীদের মতো তিনি তাঁর হাতের লোহা গহনা খুলছিলেন, এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকি করছ? আমি তো মরিনি, শুধু এ ঘর থেকে পাশের ঘরে গেছি।" একথা শুনে শ্রীশ্রীমা পরম সান্ত্বনা লাভ করলেন।

তীর্থভ্রমণ

শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের দুই সপ্তাহ পরে সারদা দেবী উত্তর ভারতে তীর্থ-ভ্রমণে বের হলেন। তিনি কলকাতা থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট

যাত্রা করলেন। দলের মধ্যে ছিলেন দুইজন শিষ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদি ও গোলাপমা; এবং তিনজন সন্ন্যাসী শিষ্য—পরে তাঁদের নাম হয়েছিল স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তাছাড়া গৃহীশিষ্য মহেন্দ্রনাথ গুপ্তও সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গী হ'য়েছিলেন।

পথে তাঁরা দেওঘর ও বারাণসীতে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। বারাণসীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখার সময় শ্রীশ্রীমার ভাব-সমাধি হ'য়েছিল। তিনি রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের পূত জীবনের স্মৃতিবিজড়িত অযোধ্যাও দর্শন করেছিলেন। তারপর ট্রেনযোগে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর একখানা হাত কাপড়ের বাইরে এসে পড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের কবচ বেরিয়ে পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনই তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দেন। শ্রীশ্রীমা বলেছেন—"আমি গাড়ীর জানলায় ওঁর মুখ দেখতে পেলাম, উনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, 'আমার সোনার কবচ তোমার হাতে রয়েছে। দেখো, যেন হারিয়ে ফেলো না।'" তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীমার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি উঠে, যে বাক্সে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো ছিল তারই মধ্যে কবচটি রেখে দিলেন। পরে কলকাতায় ফিরে এসে এই কবচটি তিনি বেলুড় মঠে[১] দান করেছিলেন।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধার অসীম বেদনার কথা মনে পড়ায় তাঁর মনে দিব্যভাব এল, এবং মনের সঞ্চিত আবেগের ভারে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তখনও তিনি স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। তিনি সারদা দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কাঁদছ কেন? আমি এখানেই আছি। কোথায় গেছি আমি? এক ঘর থেকে আরেক ঘরে বই তো নয়!"

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমার জীবন গভীর ধ্যানে, প্রার্থনায় এবং ঈশ্বরোপলব্ধিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। কালোবাবুর বাড়ীতে থাকার সময় তাঁর ঘন ঘন নির্বিকল্প সমাধি হত। এইখানে অতি আশ্চর্য উপায়ে তাঁকে গুরুর আসন গ্রহণ করতে হয়। যোগেন (স্বামী যোগানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষা পায়নি। পরপর তিন রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জানালেন যে, তিনি যোগেনকে দীক্ষা দেননি, সারদা দেবীই যেন তাঁকে দীক্ষা দেন; এবং কী মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে তাও তিনি বলেছিলেন। যোগেনও স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়ে তাঁর কাছ থেকে ঠিক এই নির্দেশই লাভ করেছিলেন। কাজেই সারদা দেবী তান্ত্রিক ক্রিয়াচার ক'রে, সমাধিলাভের পর যোগেনকে দীক্ষা দিলেন।

---

১ গঙ্গাতীরে বেলুড়ের এই মঠটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেখানে রামকৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরে তাঁর স্মৃতিচিহ্নগুলি সুরক্ষিত আছে।

এক বছর পরে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁরা বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন।

কামারপুকুরে

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে শ্রীশ্রীমা গোলাপমা এবং স্বামী যোগানন্দকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে গেলেন। স্বামী যোগানন্দ অবশ্য তিনদিন পরেই ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু গোলাপমা মাসখানেক থেকে গেলেন সেখানে।

যে-যুগের কথা তা' মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে এসে গ্রামের মেয়েদের কাছে কী পরিমাণ সমালোচনার পাত্রী হ'য়েছিলেন। তারা ব্যথিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে, একজন হিন্দু বিধবা সধবার মতো চুড়ি লোহা আর লালপেড়ে শাড়ী পরে রয়েছেন। শ্রীশ্রীমা তাই হাতের চুড়ি ও লোহা খুলে ফেলতে চাইলেন, কিন্তু তিনি আবার শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেলেন। তিনি নিজে এবিষয়ে বলেছেন—

"একদিন আমি মহা আশ্চর্য হ'য়ে দেখলাম যে উনি ভূতির খালের দিক থেকে বাড়ীর দিকে আসছেন। ওঁর সঙ্গে নরেন আর অন্যান্য শিষ্যেরা ছিল।......তিনি এসে আমাকে বললেন, 'চুড়িগুলো খুলে ফেলো না। বৈষ্ণব তন্ত্র কী, তা জানো?' আমি বললাম, 'কী জিনিষ সেটা? আমি তো কিছু জানিনে।' শুনে তিনি বললেন, 'গৌরমণি আজ বিকালে এখানে আসবে। সেই মেয়েটিই তোমাকে সব জানাবে।' সেইদিনই গৌরমণি এলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি শিখলাম, মেয়েদের কাছে স্বামী হচ্ছেন চিন্ময় সত্তা।"

গোলাপ মা কামারপুকুর থেকে চলে যাওয়ার পর শ্রীশ্রীমাকে সাহায্য করার জন্যে আর কেউ রইলেন না। আহার্য বা তরিতরকারী আনার জন্যে কাউকে বলবেন, এমন কেউ ছিল না। সেকালের প্রথা অনুসারে তিনি পর্দা মেনে চলতেন, তাই বাড়ীর বাইরে আসতেন না। তাছাড়া খরচপত্রের জন্যে তাঁর হাতে কিছু টাকা-পয়সাও ছিল না। ফলে নিজে হাতে কোদাল ধরে তাঁকে কিছু শাকসব্জী ফলানোর ব্যবস্থা করতে হলো। গোলায় যা কিছু ধান ছিল তাই বার করে তিনি নিজে তা ভেনে সেই চালের অন্ন এবং সামান্য কোনো ব্যঞ্জন, এমনকি নুন ছাড়াই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন ক'রে তার প্রসাদ গ্রহণ করতেন। তিনি শ্বশুরের ভিটেতে ফিরে এসেছেন শুনে তাঁর বিধবা মা তাঁকে জয়রামবাটীতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা একটা মাত্র দিন তাঁর সঙ্গে থেকে আবার কামারপুকুরে ফিরে এলেন।

তিনি ছিলেন একেবারে নিঃসঙ্গ[১] ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়। কী হবে তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন,—"কামারপুকুরে একা একা থাকার সময় আমি ভাবতে লাগলাম, 'আমার ছেলেপিলে নেই। এ সংসারে আপন বলতে আমার কেউই নেই। কী যে হবে আমার।' তখন উনি আমাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'তুমি একটা ছেলে চাও? আমি যে তোমাকে কতগুলো পুত্ররত্ন দিলাম। আর, কিছুদিন যাকনা, কত মুখে তুমি মা ডাক শুনবে দেখে নিও।'" ক্রমে তাঁর মনে স্থিরবিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দিয়ে নিশ্চিত কোনো কাজ করিয়ে নেবেন।

অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী এবং সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাছে খবর পৌঁছালো যে শ্রীশ্রীমা খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছেন, তাঁকে দেখাশোনা করা দরকার। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসে থাকার ব্যবস্থা করাটাকে শিষ্যেরা নিজেদের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করলেন।

ফলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শ্রীশ্রীমার জীবন ও কর্মে নতুন পর্ব শুরু হয়ে গেল। এই বছর থেকেই তিনি শিষ্য ও ভক্তদের ব্যবস্থা করে দেওয়া বাড়ীতে কলকাতায় বাস করতে লাগলেন। পরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায় তৈরী "মাতৃভবনে" আজীবন স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন।

সাধনা ও ভাবাবেশ

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা 'পঞ্চাগ্নি সাধনা'[১] নামে এক সুকঠিন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তিনি ঘন ঘন স্বপ্ন দেখতেন, সেই মানসিক চাঞ্চল্য দূর করার জন্যেই এই সাধনা। এসব স্বপ্নে তিনি একজন সাধুকে দেখতে পেতেন, তিনি এইরকম তপস্যা করতে বলতেন। তাছাড়া একটি বালিকারও দেখা পেতেন স্বপ্নে। এই সময় শ্রীশ্রীমা দুর্লভ অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ করতেন। যোগীনমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য শিষ্যারাও এবিষয়ে জানতে পেরেছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি শারীরিক বোধ অতিক্রম করে যেতে পারতেন। একদিন কলকাতায় বলরামবাবুর বাড়ীর ছাদে ধ্যান করতে করতে তিনি সমাধিলাভ করলেন। তখন

---

১ কখনো কখনো তাঁর অনুরোধ অনুসারে লাহা-পরিবারের প্রসন্নময়ী দেবী রাত্রিতে থাকার জন্যে একজন বৃদ্ধা-দাসীকে পাঠাতেন।

১ একে পঞ্চতপঃ বলে—চারদিকে চারটি অগ্নিশিখা এবং উপরে জ্বলন্ত সূর্য এই নিয়ে পঞ্চাগ্নি। এর মধ্যেই পূজা ও ধ্যান চলে। এই সাধনার পর তিনি আর মানসিক চাঞ্চল্যে কষ্ট পেতেন না।

তাঁর এক আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছিল, তাঁর নিজের ভাষায় তা এইরকম—"ঐ অবস্থায় আমি দেখলাম যেন কোন এক দূর দেশে চলে গেছি। সকলেই সেখানে আমাকে খুব আদর যত্ন করতে লাগল। আমার রূপ যেন আর ধরে না। উনিও সেখানে ছিলেন। খুব যত্ন করে তারা আমাকে ওর পাশে বসিয়ে দিল। সে যে কী আনন্দ, আমি তা বলে বোঝাতে পারবো না। মন থেকে যখন সেই আনন্দের আবেশ কেটে গেল তখনও আমি দেখলাম, আমার শরীরটা যেন সেখানে শুয়ে আছে। আমি ভাবলাম, 'এমন কুৎসিৎ শরীরে ঢুকব কী করে?' কোনো রকমেই আমি মনকে রাজি করাতে পারছিলাম না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর মন রাজি হল, শরীরে সাড় ফিরে এল।" আরেকবার নীলেশ্বর মুখুজ্জের দেওয়া তাঁর জন্যে আলাদা করে রাখা বেলুড় মঠের কাছের বাড়ীতে থাকার সময় তাঁর এই-রকম অনুভূতি হ'য়েছিল, আর জ্ঞান ফিরে আসতেও অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল। ধীরে ধীরে যখন তাঁর দেহচেতনা ফিরে আসছিল তখন তিনি বলতে লাগলেন, "ও যোগীন, আমার হাত কই? আমার পা কই?" যোগীন মাও তাঁর সঙ্গে ধ্যানে বসেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমার হাতে পায়ে চাপ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন, "কেন মা, এই তো তোমার হাত, এই তো তোমার পা।" তবু সারা শরীরের বিষয়ে চেতনা ফিরে আসতে তাঁর অনেকক্ষণ সময় লাগল।

ক্রমে তাঁর অধ্যাত্ম-সাধনার বিরাটত্বের কথা যতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ততোই বেশী বেশী লোক তাঁর কাছে উপদেশ-নির্দেশ এবং দীক্ষালাভের জন্যে আসতে লাগলেন।

গার্হস্থ্য জীবন

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জননীর দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমা পিতৃ-পরিবারের কর্ত্রী হ'য়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চারজন ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ অভয়চরণই ছিলেন সব থেকে মেধাবী। দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারী পাশ করার কিছুকালের মধ্যেই তিনি ১৮৯৯ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর আগে তাঁর স্ত্রী সুরবালাকে তিনি শ্রীশ্রীমার হাতেই সঁপে দিয়ে যান। স্বামীর অকাল মৃত্যুর শোকে সুরবালা উন্মাদ হ'য়ে পড়েন। ১৯০০ সালে তিনি রাধারাণী অর্থাৎ রাধু নামে একটি কন্যার জন্ম দেন। রাধুর মা অসুস্থ এবং উন্মাদ, সেজন্যে তাকে লালন করার ভার শ্রীশ্রীমার উপরই এসে পড়ে। রাধুকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু এই মেয়েটি এবং তার মা সারদা দেবীর অত্যন্ত অশান্তি এবং দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও, শত দুর্ব্যবহারেও তিনি এই দুজনের প্রতি মুহূর্তের

জন্যেও বিরূপ হতেন না। ওদের কাছে থেকে দুঃখ পেলে তিনি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন, "হয়তো কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা দিয়ে আমি শিবপুজো করেছি। সেইজন্যে এজীবনে আমি এমন কাঁটা পেয়েছি।"

রাধুর মা যতোখানি কাঁটা ছিল, বড় হ'য়ে উঠে রাধু তার চেয়ে আরো কষ্টদায়ক কাঁটা হ'য়ে দাঁড়াল। দেহেমনে সে ছিল দুর্বল; তেমনি ছিল জেদী আর দুষ্ট-প্রকৃতির মেয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা রূপিনী পিসীর আদর পেয়ে আরো বিগড়ে যেতে লাগল সে। ১৯১১ সালে জুন মাসে শ্রীশ্রীমা তার বিবাহ দিলেন, কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল, সে আর শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার কথা কানে তুলল না। ফলে সে এবং তার মা দুজনেই শ্রীশ্রীমায়ের স্থায়ী বোঝা হ'য়ে দাঁড়াল। ক্রমে রাধুর মধ্যেও জন্মলব্ধ উন্মাদ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল, এবং তার দুঃস্বভাবও তীব্র হ'তে শুরু করল। এই অবস্থায় রাধুর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, কিন্তু তার যত্ন নিতে রাধু ছিল একান্তই অনিচ্ছুক। এজন্যে শ্রীশ্রীমা তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করতেন, কখনো কখনো ধমকও দিতেন। একবার রাধু রাগের মাথায় তরকারীর ঝুড়ি থেকে একটা বড় বেগুন তুলে তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারল। তাঁর গায়ে বেশ জোরেই লেগেছিল সেটা, ব্যথায় তাঁর শরীর কুঁকড়ে গেল, ফুলেও উঠল। কিন্তু নিজের ব্যথার চেয়ে শ্রীশ্রীমা রাধুর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন, কারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, কোনো বোকা বা মূর্খ লোক যদি কোনো দেবোপম ব্যক্তিকে অপমান করে, তাহলে সেই লোক হয় শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করবে কিম্বা দুরদৃষ্ট লাভ করবে। সেজন্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন, "প্রভু, ও পাগল, ওর দোষ তুমি ক্ষমা করো।" তারপর তিনি রাধুকে আশীর্বাদ করে বললেন, "রাধু, উনি এমনকি বকতেনও না আমাকে, আর তুই আমাকে এত কষ্ট দিলি। তুই কী করে বুঝবি যে আমার ঠাঁই কোথায়? তোদের সঙ্গে আছি বলে তোরা আমার কিছুই বুঝতে পারিস নে।" একথা শুনে রাধুর চোখে জল দেখা দিল। কিন্তু এসব চোখের জল ছিল খুবই সাময়িক ব্যাপার।

রাধুর কোনো পরিবর্তন হল না। রাধুর সমস্ত খরচ শ্রীশ্রীমাকেই চালাতে হত। এবং টাকাপয়সার খুব টানাটানি থাকলেও শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ নষ্ট করে কোনো ভক্তের কাছে তিনি সাহায্যও চাইতে পারতেন না।

তাঁর মন ছিল খুবই পবিত্র এবং স্বার্থপরতাহীন। সকলের সেবার জন্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ভাবাবেশের সময় শ্রীশ্রীমার প্রায়ই সমাধিলাভ ঘটত, এবং সংসারে এমন কিছুই ছিল না, যার আকর্ষণে তিনি বস্তুচেতনায় ফিরে

আসতেন। যে সব আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সংসারে আকর্ষণ নেই, কিম্বা শরীরের প্রতি মায়া নেই, তাঁরা অপেক্ষাকৃত কম বয়সেও সমাধিলাভ করে থাকেন। শ্রীশ্রীমা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, এইসব বৈরাগ্য ও সমাধিলাভ সত্ত্বেও রাধুর জন্যে তাঁর এই বন্ধন তা শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই ঘটেছে—যাতে তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শ্রীশ্রীমা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমা নিজেই বলেছেন—

"রাধুকে দিয়ে উনি কী ভাবেই না বেঁধেছেন আমাকে।···...ওঁর চলে যাওয়ার পর জীবনের কোনো কিছুর ওপর আমার রুচি ছিল না। সংসারের ব্যাপারে উদাসীন হ'য়ে আমি মনে মনে বলতাম—এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে আমার লাভ কী? এই সময়ে আমি দেখলাম, দশবারো বছরের একটা মেয়ে লাল শাড়ী পরে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। উনি তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন, 'ওকেই আঁকড়ে থাকো। অনেক সন্তান তোমার কাছে আসবে।' পর মুহূর্তেই উনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। মেয়েটিকেও আর দেখতে পেলাম না। তারপর আমি এই জায়গায় (জয়রামবাটীতে তাঁর নিজের বাড়ীতে) বসে ছিলাম। সে সময় রাধুর মা উন্মাদ পাগল। তার বুকের কাছে ছিল একটা কাঁথার পুঁটলি; আর কাঁদতে কাঁদতে রাধু তার পিছনে হামাগুড়ি দিচ্ছিল। এই দেখে বুকের মধ্যে যেন আমার কেমন করে উঠল। তখনি দৌড়ে গিয়ে রাধুকে বুকে তুলে নিলাম। মনে মনে আমি বললাম, 'আহা, আমি যদি মেয়েটাকে না দেখি তো কে এর যত্ন আত্তি করবে? ওর বাপ নেই, মা তো ঐ পাগলি।' আর যেই মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলাম, অমনি আমি ওঁকে দেখতে পেলাম। উনি বললেন, "এই সেই মেয়ে। একে আঁকড়ে থাকো। এ হল যোগমায়া, মায়ারূপিণী শক্তি'।"

শ্রীশ্রীমা আরো বলতেন, "এই যে দেখছ রাধুর বিষয়ে আমার চিন্তা, এ একরকম মায়া—এটা আমিই নিজের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি।" তারপর বলতেন, "মন আমার রাধুর দিকে যায় না এতটুকু। আমি জোর করে ওর দিকে নিয়ে যাই। আমি ওঁর কাছে প্রার্থনা করি, "ওগো, রাধুর দিকে যাতে একটু আমার মন যায় সেই ব্যবস্থা করো তুমি। না হলে কে ওকে দেখবে?"

কিন্তু রাধু এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের দাবী-দাওয়া সত্ত্বেও শ্রীশ্রীমার মন যে ঈশ্বরের দিকেই নিবদ্ধ ছিল তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ স্ত্রী-পুরুষেরা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্ত হলে তারা ছোট বা বুড়ো যাই হোক, নিজের মৃত্যুর সময়ে তাদের থেকে বিচ্ছেদ সইতে পারে না। কিন্তু শ্রীশ্রীমা বারবার করে তাঁর বাজার সরকারকে বলতেন যেন রাধু আর তার মাকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত তাঁর বিছানার কাছে

এলে তিনি তাদের সরিয়ে নিয়ে যেতে বলতেন। তিনি জানাতেন যে, তাদের দিক থেকে তিনি তাঁর মনকে চিরতরে সরিয়ে নিয়েছেন, তারা তাঁর কাছে না এলেই ভালো।

গুরু হিসাবে

রামকৃষ্ণ-আশ্রম এবং তার ভক্তবৃন্দের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের পরই শ্রীশ্রীমায়ের স্থান। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্যা এবং তাঁরা ছিলেন দুই দেহে এক প্রাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তিরোধানের পর শ্রীশ্রীমাকেই তাঁর আরব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আর শিষ্যরাও যাতে তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীমার কোনো প্রভেদ না করেন, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তা ও শক্তি শ্রীশ্রীমার ভিতর দিয়ে প্রকটিত ছিল। এবং তাঁর লোকান্তর ঘটার পর শ্রীশ্রীমা গুরু হিসাবে ছিলেন সুযোগ্যা। গুরু হওয়ার দায়িত্বও বড় কম নয়। কিন্তু যখনই তিনি কাউকে দীক্ষা দিতেন, শ্রীশ্রীমা সে দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবেই গ্রহণ করতেন। তিনি বলতেন,—

"গুরুর শক্তিই মন্ত্রের ভিতর দিয়ে শিষ্যের কাছে যায়। সেইজন্যেই দীক্ষার সময় গুরু তাঁর শিষ্যের পাপ নিজে টেনে নেন, আর অসুখবিসুখে এত কষ্ট পান। গুরু হওয়া সহজ কথা নয়। শিষ্যের পাপের ভার যে তাঁকেই বইতে হয়। তিনি তাকে এড়িয়ে চলতে পারেন না। ভালো শিষ্য অবশ্য গুরুকেও সাহায্য করে। কোনো কোনো শিষ্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, কেউ কেউ ধীরে ধীরে এগোয়; কর্মফলের জন্যে মনের অবস্থার ওপরই এটা নির্ভর করে।"

তাঁর মন এতোই মাতৃভাব ও সকলের প্রতি স্নেহে পূর্ণ ছিল যে আধ্যাত্মিক সহায়তা চাইলে নিজের দুঃখকষ্টের অছিলায় কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। একবার শ্রীরামকৃষ্ণের একজন মহাশিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ বলেছিলেন, "যে বিষ আমরা নিজেরা গ্রহণ করতে পারি না, তাই আমরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সবাইকেই তিনি আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলেরই পাপ তিনি নিজে গ্রহণ করে পরিপাক করছেন।" তাঁর কলকাতা বাসের সময় মঙ্গলবার ও শনিবারে কয়েক শ শিষ্য আর ভক্ত এসে তাঁকে প্রণাম করে পদধূলি গ্রহণ করতেন। সে সময় তিনি অন্যের পাপের ভোগে নিজের সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা বোধ করতেন। তাই তিনি বারবার গঙ্গাজল দিয়ে পা ধুতেন। এতে অনেকটা আরাম পাওয়া যেত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের একজন শিষ্যা এতে ঠাণ্ডা লাগতে পারে বলে তাঁকে এরকম করতে বারণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা উত্তর দিলেন—

"তা যোগীন, এটা আমি কী করে বুঝিয়ে বলি তোমাকে কোনো কোনো লোক যখন আমার পা ছোঁয় তাতে বেশ চাঙ্গা বোধ করি। আবার কেউ কেউ পা ছুঁলে অসহ্য জ্বালা করতে থাকে। বোলতার কামড়ের মতো মনে হয়। গঙ্গাজল দিলেই তবু কিছুটা আরাম পাই। একবার ধারে কাছে এখানকার শিষ্যরা কেউ ছিল না, এমন সময় একজন আধবুড়ো মানুষকে আসতে দেখলাম।......দূর থেকে তাকে দেখেই ঘরে ঢুকে আমার বিছানায় গিয়ে বসলাম। আমাকে প্রণাম করে পদধূলি নেওয়ার জন্যে তার খুব আগ্রহ ছিল। আমি নিষেধ করে স'রে গেলাম তবু সে প্রণাম করল। সেই থেকে পায়ে আর পেটে একটা অসহ্য ব্যথায় আমি মরার মতো হ'য়ে পড়লাম। তিনচার বার পা ধুলাম, কিন্তু তবু যেন জ্বালা আর যেতে চায় না।"

যদিও তিনি জানতেন যে শিষ্যদের পাপের জন্যে তাঁকে কষ্ট পেতে হবে, তবু তিনি তাদের মায়ের মতোই ভালবাসতেন। একবার যখন একজন শিষ্য তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তাঁকে কষ্ট দিতে সংকোচ বোধ করছিল, তিনি তখন তাকে বলেছিলেন, "না বাছা, এইজন্যেই তো আমাদের জন্ম। আমরা যদি অন্যদের পাপ ও দুঃখ নিজের মধ্যে নিয়ে হজম না করি তো আর কে তা করবে? পাপী দুঃখীর দায় আর কে বইবে?" তাঁর শেষ ব্যাধির সময় যখন তিনি খুবই রোগা হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না, তখন তাঁর সন্ন্যাসী শিষ্যেরা একদিন তাঁর কষ্টের কথা আলোচনা করছিলেন। একজন বললেন, "মা যদি এবার সেরে ওঠেন, তবে আমরা তাঁকে বলব যাতে তিনি আর কাউকে দীক্ষা না দেন। এতরকম লোকের পাপ নিজের ওপর নিয়েছেন বলেই তিনি এত কষ্ট পাচ্ছেন।" একথা শুনতে পেয়ে শ্রীশ্রীমা হেসে বললেন, "একথা বলছ কেন? তুমি কি মনে কর, উনি সংসারে শুধু রসগোল্লা খাওয়ার জন্যেই এসেছিলেন?" আরেকবার তিনি একজন শিষ্যকে বলেছিলেন, "বাছা, এখানে যতো লোক আসে তার মধ্যে কতোজনই তো জীবনে কোনো কিছুর বাছবিছার করেনি। কোনো পাপই তারা বাদ দেয়নি। কিন্তু তারা এখানে এসে যখন আমাকে মা বলে ডাকে, আমি সব কথা ভুলে যাই, আর তাদের যা পাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশী কিছুই তারা পায়।"

আতিথেয়তা

শ্রীশ্রীমার আতিথেয়তা ছিল আশ্চর্য রকমের। মায়ের মতো যত্ন আর সজাগ দৃষ্টি ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করার সৌভাগ্যলাভ করতো

তাঁরা যতোক্ষণ থাকতেন অতিথির মতো আদরযত্ন পেতেন। যদি কোনো পরিচারিকা শিষ্যা কোনো কাজে পাশের পাড়ায় গিয়ে ফিরতে দেরী করত, তিনি যথাসময়ে আহার না করে তার জন্যে অপেক্ষা করতেন। ভক্তেরা যখন তাঁর জয়রামবাটীর বাড়ীতে যেতেন, তিনি সর্বদাই তাঁকে দু'তিনদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে পীড়াপীড়ি করতেন। তিনি বুঝাতেন যে, জয়রামবাটীতে যেতে লোকেদের যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হত। তিনি বলতেন, "গয়া কাশী যাওয়া সোজা, কিন্তু এখানে নয়।" জীবনের শেষ কয় বছর তাঁর কলকাতা-বাসের সময় দর্শনপ্রার্থী ভক্তের সংখ্যা এত বেশী হত যে তিনি সেই ভিড়ের চাপে ক্লান্ত হ'য়ে গ্রামের বাড়ীতে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও কলকাতা থেকে অনেক ভক্ত গিয়ে উপস্থিত হতেন। কেউ কেউ বিনা খবরে অসময়ে গিয়েও হাজির হতেন। তবু তাঁরা সকলেই এরকম আন্তরিক আতিথেয়তাই লাভ করতেন।

তাঁর শক্তি

"শ্রীশ্রীমা আশ্চর্য মানসিক শক্তির দ্বারা মানুষকে পাপপথ থেকে ফেরাতে পারতেন। এইভাবে তিনি একজন কু-অভ্যাসে আসক্ত ব্যক্তিকে সারিয়ে তুলেছিলেন। তিনি একটি যুবতীর মন ফিরিয়ে দেন, যে একজন যুবককে ধ্বংসের পথে টানছিল। তিনি জনৈক সংসার বিরাগী ব্যক্তির আত্মহত্যায় উদ্যত স্ত্রীকে ধর্মজীবনে ফিরিয়ে এনেছিলেন।"[১] শ্রীশ্রীমার সংস্পর্শে এসে কোনো কোনো ভক্তের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ হ'য়েছিল। আবার কেউ কেউ তাঁকে জীবনে তো নয়ই এমন কি তাঁর ছবিটুকু পর্যন্ত না দেখলেও মনুষ্যদেহে দেবীর মতো তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেত। কেউ কেউ স্বপ্নে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র পেত, এবং পরে যখন তারা দীক্ষা চাইত তখন দেখত তিনি সেই স্বপ্নের মন্ত্রই তাদের দান করেছেন। বাংলা নাটকের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ শ্রীশ্রীমাকে যখন স্বপ্নে দেখেন তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বৎসর। অনেক বছর পর যখন তিনি শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করেন তখন তিনি আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ্য করেন যে স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর মিল একেবারে হুবহু। কিন্তু তিনি দৈনন্দিন জীবনে খুব সাদাসিধে ভাবেই থাকতেন, এবং দেখলে মনে হ'ত একজন সাধারণ নারী। মুমুক্ষু ব্যক্তিদের মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া ছাড়াও, তিনি রামকৃষ্ণ আশ্রমের নতুন শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মচর্যব্রত ও সন্ন্যাসের গুহ্য রহস্যের কথা বলে আশীর্বাদ জানাতেন। ব্রতভিক্ষা হিসাবে তিনি ব্রহ্মচারীদের শ্বেতবস্ত্র এবং সন্ন্যাসীদের গেরুয়া বস্ত্রও দিতেন।

---

১ শ্রীসারদা দেবী দি হোলি মাদার ঃ রামকৃষ্ণমঠ, মাইলাপুর। মাদ্রাজ ॥

পুনরায় তীর্থভ্রমণ

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে গয়ায় তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মাতার নামে পিন্ডদান করলেন। তিনি বুদ্ধগয়াতেও গিয়েছিলেন। সেই বৎসরই তিনি পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। গয়া এবং পুরীতে তিনি এই কারণেই বিশেষভাবে গিয়েছিলেন যে রামকৃষ্ণদেব এস্থানগুলিতে যাননি। শ্রীরামকৃষ্ণের আশঙ্কা ছিল এদুইস্থানে গিয়ে তাঁর ভাবাবেশের উন্মাদনার ফলে হয়তো তিনি বেঁচে থাকতেই পারবেন না।

১৮৯৪ সালে শ্রীশ্রীমা দ্বিতীয়বার বারানসী ও বৃন্দাবনে যান। ১৯০১ সালে তিনি আবার পুরীতে গিয়েছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহরমপুরে যাত্রাবিরতি করে রামেশ্বরে গিয়েছিলেন। তিনি মাসখানেক মাদ্রাজ থেকে বহুলোককে মন্ত্রদীক্ষা দেন। সেখানে শিক্ষিতা মহিলাদের আধিক্য দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হ'য়েছিলেন। রামেশ্বরের পথ তিনি মাদুরায় থেমে মীনাক্ষী মন্দিরে গিয়ে মাতৃদর্শন লাভ করেন। রামেশ্বরে স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত রামনাদের রাজা পূজার জন্যে এমন আশ্চর্য ব্যবস্থা করে দেন শ্রীশ্রীমাকে, যা আর কোনো তীর্থযাত্রীর বরাতে জোটেনি কখনো। রামেশ্বর থেকে তিনি বাঙ্গালোরে যান। তারপর কলকাতায় ফেরার পথে তিনি রাজমাহেন্দ্রীতে গিয়ে একদিন থেকে পুণ্যতোয়া গোদাবরী নদীতে স্নান করেন। পরে পুরীতেও তিনি কয়েকদিন ছিলেন, এবং কলকাতায় ফেরেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

তিনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৃতীয়বার বারাণসীতে গিয়ে আড়াই-মাস কাল অবস্থান করেন। সেখানে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতা পুরীর গুরু ভ্রাতা চামেলী পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চামেলী পুরীর বয়স তখন একশ বছরেরও বেশী হ'য়েছিল। কলকাতায় ফেরার আগে শ্রীশ্রীমা সারনাথও দর্শন করেন।

কলকাতায় মাতৃভবন

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় 'মাতৃভবনে'[১] উঠে আসেন। এখানে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্যাও[২] শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকতেন।

---

১ এটি এখন রামকৃষ্ণ আশ্রমের একটি প্রকাশন কেন্দ্র। তাছাড়া দ্বিমাসিক পত্রিকা 'উদ্বোধন' এখান থেকে প্রকাশিত হয়। এটি 'উদ্বোধন কার্যালয়' নামেও পরিচিত।

২ পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তাঁদের মধ্যে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মীদিদি, এবং গৌরী-মা বিশেষ খ্যাতি-সম্পন্না ছিলেন। এঁদের সকলেই ছিলেন বিধবা, কেবল গৌরী-মা ছিলেন চির-কুমারী। তাঁরা সকলেই সাধনা ও সেবার পূণ্য জীবন যাপন করতেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণের কয়েকজন গৃহী শিষ্যের স্ত্রীরাও শ্রীশ্রীমার কাছে আসতেন, এবং তাঁকে নিমন্ত্রণ করে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন। এই গৃহীদের মধ্যে বলরাম বসু এবং "ম" নামের আড়ালে "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের" রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেষ দিনগুলি

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে গিয়ে বৎসরাধিক কাল সেখানে ছিলেন। এই অবস্থানের শেষ তিন মাসে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই খুব খারাপ হ'য়ে যেতে লাগল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর কালাজ্বর হল। তারপর ঘনঘনই তিনি এই অসুখে কষ্ট পেতে লাগলেন। তিনি একে-বারেই হীনবল হ'য়ে পড়লেন। সেজন্যে স্বামী সারদানন্দ তাঁকে ১৯২০ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করলেন। তিনি এলেন খুবই 'সংকটাপন্ন অবস্থায়' দেখতে হ'য়েছিলেন 'অস্থিবর্ণসার' এবং গায়ের রঙ্ হয়েছিল 'ঝুলকালির মত কালো'। এর পর পাঁচমাস ধরে তিনি ভুগতে লাগলেন। মাঝে মাঝে জ্বর ১০৩° ডিগ্রি পর্যন্ত উঠত। তাছাড়া তিনি সারা শরীরে অসহ্য জ্বালা বোধও করতেন।

তিরোভাবের একমাস আগে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি তাঁর নিজের ঘর থেকে পাশের ঘরে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। নিজের বিছানাও তিনি মেঝের উপরে করালেন। কিন্তু সেই অত্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্যের অবস্থাতেও তিনি যা কিছু পথ্য গ্রহণ করতেন তা শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করেই প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি রাধু এবং তার ছেলের উপর থেকে সম্পূর্ণভাবে মন সরিয়ে নিলেন। এরা তাঁর বড়ই আদরের জিনিষ ছিল। তখনই স্বামী সারদানন্দ এবং অন্যান্যরা বুঝতে পারলেন যে, শ্রীশ্রীমা আর বেশী দিন বাঁচবেন না।

তাঁর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগল। রক্তাল্পতার জন্যে তাঁর পা ফুলে উঠল। তিনি বিছানা থেকেই উঠতে পারছিলেন না। শেষ সময়ের দু'একদিন আগে একজন স্ত্রীলোক প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "মাগো, আমাদের বরাতে কী হবে?" শ্রীশ্রীমা অতি ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বললেন, "ভয় পাচ্ছ

কেন? ওঁকে তো তুমি দেখতে পেয়েছ।" তারপর একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "কিন্তু একটা কথা আমি বলছি তোমাকে—যদি মনের শান্তি চাও, অন্যের দোষ ধরো না। বরং নিজের দোষ দেখার চেষ্টা করো। সমস্ত বিশ্বসংসারটাকে নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা কর। কেউই পর নয়, বাছা। সারা সংসারই তোমার নিজের।" সম্ভবত বিশ্বজগতের কাছেও এই তাঁর শেষ বাণী।

শেষ তিনদিন তিনি প্রায় চুপচাপই থাকতে লাগলেন। কারো সঙ্গেই কথা বলতেন না। একবার শুধু তিনি স্বামী সারদানন্দকে ডেকে বলেছিলেন, "শরৎ, আমি যাচ্ছি—যোগীন, গোলাপ আর ওরা সব রইল। তাদের দেখো।"

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই রাত ১টা ৩০ মিনিটে চূড়ান্ত ভাবাবেশের অবস্থায় শ্রীশ্রীমার মহাপ্রয়াণ ঘটল। তাঁর দেহ বেলুড় মঠে এনে দাহ করা হল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় কয়েক হাজার ভক্ত, সাধারণ-মানুষ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব

শ্রীশ্রীমার সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন এতোই গভীর যে তার অসাধারণত্ব অনুভব করা খুবই কঠিন। কালের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন প্রায় আমাদের সমসাময়িক। ফলে প্রাচীনকালের ঋষি ও সাধুসন্তদের মতো তাঁর নামের চতুর্দিকে কোনো উপকথা বা জনশ্রুতির কুজ্ঝটিকা জমে ওঠেনি। তাঁর সম্বন্ধে যা জানা যায় তা খুবই স্পষ্ট। শ্রীশ্রীমার মতো আর কোনো নারী এভাবে স্বামীর সঙ্গে বাস করেছেন বলে শোনা যায়নি, আর কোনো নারীর জীবনের সঙ্গেই তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই। তিনি সর্বদা ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করতেন, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব তিনি এমনভাবে আবৃত রাখতেন যে, তাঁকে সাধারণ স্তরের নারীর মতোই দেখাত। তিনি এতো সাত্ত্বিক, এতো শান্ত এবং এতোই প্রাণময়ী ছিলেন যে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি ও মহত্ত্বের প্রায় কোনো বহিঃপ্রকাশই ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁকে আদ্যাশক্তির অবতার জগন্মাতারূপে চিনতে পেরেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন—"নহবতে যে মানুষটা বাস করছে (অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা) সে যদি কোনো কারণে কারো ওপর রেগে যায় তো তাকে বাঁচানো আমারো অসাধ্য।" "তাঁর মধ্যে ভারতীয় নারীত্ব তার ভারতীয় বৈশিষ্ট্য পালন করে আত্ম-অতিক্রমের দ্বারা বিশ্বমহিমা লাভ করেছে।"[১] সারদা দেবী

১ গ্রেট উইমেন অব ইন্ডিয়া (অদ্বৈত আশ্রম, কলিকাতা): ডাঃ স্যার এস্ রাধাকৃষ্ণাণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত অর্থে স্ত্রীও ছিলেন না, মাও ছিলেন না। তবু তিনি মহত্তর অর্থে মা ছিলেন। তাঁর কথা স্মরণে এলেই মাতৃরূপিণী ঈশ্বরের কথা মনে আসে আমাদের। শ্রীশ্রীমা আর ঈশ্বর একই সত্তা।

তাঁর উপদেশাবলী

শ্রীশ্রীমার জীবনচরিত আলোচনা করলে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকে না যে তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের একাধিপত্য ছিল। তাঁর উপদেশাবলী পণ্ডিত বা প্রাজ্ঞব্যক্তির মতো ছিল না, সেগুলি মনে হত ত্রাণকর্ত্রী মহামানবীর বচনামৃত। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা লব্ধ এই সত্যগুলি পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষের বাণীর মতোই মনের উপর অপরিহার্য প্রভাব বিস্তার করে। এগুলির বিষয়ে যতোই আলোচনা করা যায় এবং চিন্তা করা যায়, হৃদয় ততোই পবিত্র হ'য়ে ওঠে, মনও সেই পরিমাণে প্রশান্তি লাভ করে। তাঁর উপদেশাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল নিচে, এতেই তাঁর অন্তঃসৌন্দর্যের বিষয়ে পাঠক নিঃসন্দেহ হ'তে পারবেন।

অধ্যাত্ম সাধনা

(১) তুমি যদি ভগবানকে না ডাকো, তাঁর তাতে কী? তোমারই দুর্দশা বাড়বে।

(২) প্রাতঃ-সন্ধ্যা আর সায়ং-সন্ধ্যাই ভগবানের নাম নেওয়ার সব থেকে ভালো সময়। মন এসময়ে খুব পবিত্র থাকে।

(৩) মন্ত্র শরীরকে পবিত্র করে। ভগবানের নাম জপ করলে মানুষ পবিত্র হ'য়ে ওঠে। সেজন্যে সবসময় তাঁর নাম জপ করো।

(৪) ধ্যান করার অভ্যাস কর, তাহলে ধীরে ধীরে তোমার মন এত শান্ত আর স্থির হ'য়ে উঠবে যে ধ্যান থেকে মন সরিয়ে নেওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

(৫) কর্মফলকে কেউ এড়াতে পারে না। তবে ধর্মজীবন যাপন করলে সেখানে অল্প একটু কাঁটার খোঁচা খেয়েই পার পাওয়া যায়।

(৬) কাজ করতে হবে, ঠিকই। কাজ মনকে বিপথ থেকে বাঁচায়। কিন্তু প্রার্থনা আর ধ্যানও সেই রকম দরকারী। সকালে আর সন্ধ্যায় অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ধ্যানে বসা উচিত। এতে নৌকোর হালের মতো কাজ দেবে। সন্ধ্যায় ধ্যানে বসলে সারাদিনের কাজের বিষয়ে আত্মচিন্তা করা যায়।

(৭) মানুষ এমনি যা ভালোবাসে তাতে দুঃখ ডেকে আনে! ভগবানের প্রতি ভালোবাসায় আশীর্বাদ নেমে আসে।

(৮) অনেকে আছে যারা জীবনে ঘা খেয়ে তবে ঈশ্বরের নাম করে। কিন্তু শিশুকাল থেকেই যে ফুলের মতো নিজের মন ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারে, সেই ধন্য।

(৯) ঈশ্বরকে ডাকুক আর নাই ডাকুক, অবিবাহিত লোক অর্ধমুক্ত। ঈশ্বরকে অল্প একটু ডাকলেই সে তাড়াতাড়ি সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

(১০) অল্পস্বল্প প্রাণায়াম করতে পার, কিন্তু বেশী নয়। বেশী প্রাণায়াম করলে মাথা গরম হয়ে যাবে। মন যদি নিজেই শান্ত হ'য়ে ওঠে, তবে প্রাণায়াম করার দরকার কী? প্রাণায়াম আর আসন অভ্যাস করলে অনেক রকম বিভূতি লাভ করা যায়। এইসব বিভূতি অনেক সময় বিপথে নিয়ে যায়।

(১১) যা খাবে, তা সবই আগে ঈশ্বরকে নিবেদন করে নেবে। অনিবেদিত খাদ্য কখনো খাওয়া উচিত নয়। খাদ্য যেমন হবে, রক্তও হবে তেমনি। শুদ্ধ খাদ্য থেকেই শুদ্ধ রক্ত, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ শক্তি পাওয়া যায়। শুদ্ধ মনেই প্রেম-ভক্তি আসে।

(১২) জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়া আর তাঁর ভাবেই পরিপূর্ণ থাকা।

(১৩) মনের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। মনের শুদ্ধতা ছাড়া কিছুই লাভ করা যায় না। কথায় বলে, "সাধকলোক গুরু, ঈশ্বর এবং বৈষ্ণবদের কৃপা-লাভ করতে পারে, কিন্তু একজনের কৃপা না হলে দুঃখ এড়াতে পারে না।" সেই একজন হল মন। সাধকের মন তার ওপর প্রসন্ন হওয়া চাই।

(১৪) ভগবানকে পেলে আর কী হয়? তার কি একজোড়া শিং গজায়? না, কেবল মন শুদ্ধ হয়, আর শুদ্ধ মনের ফলেই মানুষ জ্ঞানলাভ করে জেগে ওঠে।

(১৫) মনই সব। মনের মধ্যেই মানুষ শুদ্ধতা অশুদ্ধতা বুঝতে পারে। নিজের মনে দোষ না থাকলে অন্যের দোষ দেখতে পায় না মানুষ।

(১৬) হাওয়া উঠলে যেমন মেঘ উড়ে যায়, তেমনি ভগবানের নাম নিলে সংসারের ভোগতৃষ্ণাও দূরে পালায়।

(১৭) অনেকরকম কথা ভেবে মনকে ধোঁকায় ফেল না। একটা কাজ করতেই মানুষ হিমসিম খেয়ে যায়, তবু হাজার কথা মাথায় এনে মনটাকে হতভম্ব করে দেয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের সাবধানতা

(১৮) একটা কথা বলছি তোমাকে। যদি মনের শান্তি চাও, অন্যের দোষ ধরো না। বরং নিজের দোষ দেখার চেষ্টা করো। সমস্ত বিশ্বসংসারটাকে নিজের করে নেওয়ার চেষ্টা কর। কেউই পর নয়, বাছা; সারা সংসারই তোমার নিজের।

(১৯) কথা দিয়েও কাউকে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অযথা অপ্রিয় সত্যও বলা ঠিক নয়। কর্কশ কথা বলতে বলতে নিজের স্বভাবও কর্কশ হ'য়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "খোঁড়াকে কেমন ক'রে খোঁড়া হল তা জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়।"

(২০) এসব শুকনো আলোচনা আর দর্শনের কূটকচালি ছেড়ে দাও। তর্ক দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে পেরেছ কি?

(২১) টাকায় মনটাকে কালো করে দেয়। তুমি হয়তো মনে করতে পার তুমি টাকা পয়সার ব্যাপারে নেই; টাকা-পয়সার জন্যে কোনো আসক্তি নেই তোমার! তুমি এমনও ভাবতে পারো যে, যখন ইচ্ছে তুমি এসব ছেড়ে যেতে পারো। না বাছা, এসব চিন্তা মনে ঠাঁই দিও না। ছোট্ট একটা ফাঁক দিয়ে এটা আবার তোমার মনে ঢুকে পড়বে, আর নিজের অজানিতে ধীরে ধীরে তোমার গলায় ফাঁসির মতো আটকে যাবে।

(২২) যতক্ষণ মানুষের কামনা বাসনা আছে, ততক্ষণ পুনর্জন্মের হাত থেকে নিস্তার নেই। কামনা-বাসনাই এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ ধারণ করতে বাধ্য করে। একটুকরো মিছরী খাওয়ার বাসনা থাকলেও মানুষকে জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়।

(২৩) গুরুর প্রতি ভক্তি থাকা উচিত। গুরুর স্বভাব যাই হোক, তাঁর প্রতি অচল ভক্তির জন্যেই শিষ্য মুক্তি পেয়ে যায়।

(২৪) যতো তুচ্ছই হোক, কোনো কিছু নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়। তোমার যদি সবকিছুর ওপর শ্রদ্ধা থাকে, সবকিছুই তবে তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। তুচ্ছ কাজও মনে শ্রদ্ধা নিয়ে করা উচিত।

(২৫) মানুষ যতো আধ্যাত্মিকই হোক না কেন, দেহ-ধারণ করার মাশুল তাকে শেষ কড়া পর্যন্ত মিটিয়ে দিতে হবে।

দৈব কৃপা

(২৬) প্রশ্ন—মা, এতো জপতপ করলাম, কিন্তু কই কিছু তো পেলাম না।
উত্তর—ঈশ্বর তো মাছ-তরকারী নয় যে দাম দিয়ে কিনবে।

(২৭) প্রশ্ন—মা, এতো বারবার তোমার কাছে আসছি, আর তোমার কৃপাও বোধহয় পেয়েছি, কিন্তু কিছুই তো বুঝতে পারিনে!

উত্তর—বাছা, মনে কর তুমি বিছানায় ঘুমিয়ে আছ, আর কেউ যেন বিছানাশুদ্ধ তোমাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাহলে কি ঘুম ভেঙেই তুমি বুঝতে পারবে যে নতুন জায়গায় এসেছ? মোটেই না। তন্দ্রার ঘোর একেবারে কেটে গেলে তবে তুমি টের পাবে যে নতুন জায়গায় এসেছ।

(২৮) প্রশ্ন—কী ক'রে ঈশ্বর দর্শন লাভ করা যায়?

উত্তর—তাঁর কৃপা হলেই তবে তা সম্ভব। কিন্তু ধ্যান আর জপ চালিয়ে যেতে হবে। ওতে মনের মালিন্য দূর হয়। তাছাড়া পূজা অর্চনার মতো ধর্মনিষ্ঠাও দরকার। ফুলকে হাতে নিলে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায়, কিম্বা পাটায় ঘষলে যেমন চন্দন কাঠের গন্ধ পাওয়া যায়, সেইরকম সব সময় ঈশ্বর-কথা চিন্তা করলেই তবে আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করা যায়।

(২৯) বুকের একেবারে অন্তস্তল থেকে ঈশ্বরের নাম জপ কর। আর মনে প্রাণে শ্রীরামকৃষ্ণের শরণ নাও। বাইরের ব্যাপারে মনে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। আধ্যাত্মিক পথে কতোদূর এগোলে তা নিয়ে হিসাবও করো না, দুর্ভাবনাও করো না। নিজের উন্নতির বিচার করাটা অহঙ্কার। গুরু আর ইষ্টের কৃপার উপর বিশ্বাস রাখ।

(৩০) একশবার চাইলেও শিশুরা একটা জিনিস হয়তো একজনকে দিতে চায় না, আবার অন্য একজনকে হয়তো একবার চাইলেই দিয়ে দেয়। ঈশ্বরের কৃপারও তেমনি কিছু অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কে

(৩১) সত্যের প্রতি ওঁর কতো নিষ্ঠা ছিল। তিনি বলতেন যে কলিযুগে সত্যই একমাত্র তপস্যা। সত্যকে আঁকড়ে থেকেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

(৩২) সংসারে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রকটিত করার জন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাকে রেখে গেছেন।

(৩৩) তুমি যদি ওঁর ছবির সামনে সর্বদা প্রার্থনা কর তবে ছবির ভিতর দিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করবেন। যেখানে সে ছবি রাখা হবে সেই জায়গাই হয়ে উঠবে মন্দির।

(৩৪) ঈশ্বরের শরণ নিলে নিয়তির বিধানও নাকচ হ'য়ে যায়। নিয়তি এসব লোকের বিষয়ে নিজে যা লিখেছে তা নিজের হাতেই মুছে দেয়।[১]

[১] শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবন ও উপদেশাবলীর বিষয়ে এই অধ্যায়ে যা লিখিত হ'য়েছে তার উপকরণ সংগৃহীত হ'য়েছে উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, থেকে বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এবং রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ, থেকে প্রকাশিত 'শ্রীসারদা দেবী, দি হোলি মাদার' নামক ইংরাজী গ্রন্থ থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে অন্য কয়েকজন পুণ্যবতী নারী

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুণ্যভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। যখন জোয়ারের বান আসে তখন নদী-উপনদী, খাল-বিল-পুকুর-দীঘি সবই নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে সেই জলোচ্ছ্বাস ধারণ ক'রে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। সেই-রকম কোনো ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের সংস্পর্শে যেসব নারীপুরুষ আসেন তাঁরাও আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করেন, এবং যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের মনোভাব নিয়ে এইরকম মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা সাধক হ'য়ে ওঠেন।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে শ্রীরামকৃষ্ণ বহু মুমুক্ষু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়ে সন্ন্যাসের পথ দেখিয়েছেন এবং সহস্র সহস্র গৃহীকে ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেবল পুরুষ নয়, নারীর সংখ্যাও কম ছিল না। এঁরা কেউ কেউ সন্ন্যাসিনীর পবিত্র জীবন যাপন করেছেন, আবার কেউ কেউ গৃহে থেকেই ধর্মাচরণ করে গেছেন।

যেসব মহামানবী তাঁর সন্দর্শনে এসেছেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠা। এবং তিনি তাঁর অন্যতম গুরুর আসন গ্রহণ করেছিলেন। আরেক-জন ছিলেন সুগভীর মরমীয়া সাধনায় পারদর্শিণী। ইনি বাল গোপালের কৃপা লাভ করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রীও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য শিষ্যাদের মধ্যে গৃহীনারী যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন সন্ন্যাসিনী। এঁরা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পুণ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রীর মতোই শ্রীশ্রীমার নিকট সংস্পর্শে আসেন।

যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী

শ্রীরামকৃষ্ণের নারী গুরু যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে পরিচিতা ছিলেন। যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম এই সাধিকা বৈষ্ণব এবং তান্ত্রিক মতেও সাধনা করতেন। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কেননা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তখন তাঁর বয়স হ'য়েছিল পঁয়তাল্লিশ বৎসর। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন পঁচিশ বৎসর। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর

পিতামাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের নিবাস ছিল যশোর জেলায়। তিনি ছিলেন চিরকুমারী। যোগাভ্যাস করার ফলে তাঁর মহাবিভূতি লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর প্রব্রজ্যার পথে দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হন। যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পান তখন আনন্দাশ্রু বিসর্জন ক'রে তাঁকে বলেন, "বাছা, তুমি এখানে? গঙ্গাতীরে কোথাও তুমি আছ জানতে পেরে কতোদিন ধ'রে আমি তোমায় খুঁজছি। এতদিনে দেখা মিলল।" তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মনেও মাতৃভাব জাগরিত হল। তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি আমার কথা জানলে কী ক'রে, মাগো?" ভৈরবী উত্তর দিলেন, "মা কালীর দয়াতেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে তোমাদের তিনজনের সঙ্গে আমার দেখা হবে। পূর্ববঙ্গে দুজনের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছে। তারা হল চন্দ্র আর গিরিজা। আর বাকী ছিলে তুমি, তোমার সঙ্গে আজ দেখা হল।"

ঐ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর তপস্যায় মগ্ন থেকে বিভিন্ন রকমের আশ্চর্য দৈবানুভূতি লাভ করতেন। তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর গা ঘেঁষে ব'সে নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতি এবং উপলব্ধির কথা বালকের মতো সরলভাবে তাঁকে সব জানালেন। ধ্যানের সময় কী রকম তাঁর বাহ্যজ্ঞান রহিত হ'য়ে যায়, সর্বদেহে জ্বালাবোধ হ'তে থাকে, কীভাবে রাতের পর রাত তিনি নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটান, মনে কেমন বৈরাগ্য ভাব আসে, সবই তিনি ভৈরবীকে জানালেন। তিনি বারবার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "এমন কেন হয় তা বলতে পার তুমি? লোকে বলে আমি পাগল। সত্যিই কি আমি উন্মাদ হ'য়ে গেছি?" তাঁর এসব কাতর জিজ্ঞাসা শুনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁর অধ্যাত্ম-সৌভাগ্যের কথা ভেবে আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলেন। তিনি বললেন, "কে তোমাকে পাগল বলে, বাছা? এসব পাগলামি নয়। তুমি সাধন-মার্গের পরম সৌভাগ্য 'মহাভাব' লাভ করেছ। এর উনিশটি বাহ্যলক্ষণ আছে। যেমন—অশ্রু, কম্প, শিহরণ, স্বেদ। যারা এসব কখনো অনুভব করেনি তারা এর মর্ম বুঝবে না। তাই ওরা তোমাকে পাগল বলে।" তিনি আরো জানালেন যে শ্রীরাধা এবং শ্রীগৌরাঙ্গের এই একই রকম অনুভূতি হত। তাঁর কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ খুবই সান্ত্বনা পেলেন মনে।

সন্ধ্যাবেলায় ব্রাহ্মণী রান্না ক'রে তাঁর ইষ্ট দেবতা রঘুবীরের ভোগ দিলেন। এই দেবতাটির প্রস্তরমূর্তি সর্বদাই তিনি নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। ভোগের ধ্যানের সময় তিনি একটা অর্থপূর্ণ দিব্যদর্শন লাভ করলেন। ইতিমধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর দিকে যাওয়ার জন্যে একটা অপ্রতিরোধ্য তাগিদ অনুভব

করলেন, এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে রঘুবীরের প্রস্তরমূর্তির সামনে নিবেদিত ভোগ তিনি ভূতাবিষ্টের মতো নিজে ভক্ষণ করতে লাগলেন। এদিকে ধ্যানের পর চোখ মেলে ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভোগ খেতে দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। কারণ দিব্য দর্শনে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা এই বাস্তবেরই অনুরূপ ব্যাপার। এসময়ে রামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না। খাওয়ার পর তিনি ক্ষমাভিক্ষা করে বললেন, "আমি জানিনে কেন যে অর্ধচেতন অবস্থায় এমন কাজ করলাম।" ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন, "তুমি ঠিকই করেছ, বাছা। এ তুমি নও, তোমার মধ্যে যে অদ্বৈত আছেন তিনিই একাজ করেছেন। ধ্যানের সময়ই আমি বুঝতে পেরেছি কে একাজ করেছেন, এবং কেন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে পূজা-অর্চনায় এখন আর আমার কোনো দরকার নেই। ওতে যা পাওয়ার সে ফল আমি পেয়ে গেছি।" এইবলে তিনি ভুক্তাবশিষ্ট যা পড়ে ছিল তা প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করে রঘুবীরের প্রস্তরমূর্তিটি গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। কত বৎসর ধরে এই মূর্তিটির পূজা করেছেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি স্থির নিশ্চয় হ'য়েছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ রঘুবীরেরই জীবন্ত বিগ্রহ।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী এরপর নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারলেন যে, গভীর ঈশ্বর-প্রেম এবং সার্থক অধ্যাত্ম-সাধনার ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ অলৌকিক বিভূতির অধিকারী হ'য়েছেন। তিনি রামকৃষ্ণের উপলব্ধিকে শ্রীচৈতন্যের উপলব্ধির মতো মনে করলেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণও শিহোরে যাওয়ার পরে একটা অর্থপূর্ণ দিব্যদর্শন লাভ করলেন একদিন, যাতে তিনি দেখতে পেলেন যেন দুটি জ্যোতির্ময় কিশোর তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এল। ব্রাহ্মণী জানালেন, এঁরা চৈতন্য আর নিত্যানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সর্বদেহে জ্বালা অনুভব করতেন তা ব্রাহ্মণী সহজেই সারিয়ে দিলেন। তাছাড়া একসময় রামকৃষ্ণ দারুণ ক্ষুধার তাড়নায় ভুগছিলেন, প্রাণপণে খেয়েও তিনি ক্ষুধার হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন না। ব্রাহ্মণী জানতেন উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনার পথে কখনো কখনো সাধক এইসব অদ্ভুত অবস্থায় পড়েন। তিনি এমন একটা উপায় বলে দিলেন যা অনুসরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ তিন দিনের মধ্যে ক্ষুধার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বাভাবিকত্ব ফিরে পেলেন।

ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে চৌষট্টি তন্ত্রের বিভিন্ন যোগ-সাধনার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "মা কালীর দয়াতেই এসব অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে গায়ে আঁচড়টি না লাগিয়ে পার হ'য়ে এসেছি। এর

কোনো কোনোটা এতো মারাত্মক যে এতে সাধুদের পা ফস্কিয়ে জাহান্নমে যাওয়ার রাস্তা খুলে যায়।”

ভৈরবী ব্রাহ্মণীই প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে অবতারের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর মতামত ঘোষণা করেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রীর জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস এই কথা শুনে বৈষ্ণবচরণ, পণ্ডিত গৌরী-কান্ত তর্কালঙ্কার এবং অন্যান্যদের ডেকে পাঠালেন। এঁরা পাণ্ডিত্য ও ধর্ম-নিষ্ঠার জন্যে সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। এঁদের সঙ্গে যাতে ব্রাহ্মণী আলোচনা করতে পারেন এই ছিল মথুরানাথের উদ্দেশ্য। পণ্ডিত গৌরীকান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে একবাক্যে ঘোষণা করলেন, “আমি এবিষয়ে কৃতনিশ্চয় যে, তুমি সেই অসীম শক্তির আধার, যার কণামাত্র গ্রহণ করে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে অবতারের আবির্ভাব ঘটে। আমি এটা প্রাণের মধ্যে অনুভব করছি, শাস্ত্রও আমার অনুকূলে। কেউ যদি আমাকে তর্কে আহ্বান করে তবে আমি আমার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করার জন্যে প্রস্তুত আছি।”

শেষ জীবনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ধ্যান ও যোগসাধনা করেই অতিবাহিত করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বারানসীতে তীর্থভ্রমণে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি ভৈরবীকে শেষ কয়টাদিন বৃন্দাবনে কাটাতে বলেন। ভৈরবী সম্মত হ'য়ে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সঙ্গেই বৃন্দাবনে যান। সেখানে কিছু কাল পরেই তাঁর লোকান্তর ঘটে।

অঘোরমণি দেবী

(গোপালের মা নামেই পরিচিতা)

অঘোরমণি দেবী ছিলেন একজন উচ্চস্তরের সাধিকা। তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিও ছিল অনন্যসুলভ। তাঁর জীবন এবং অধ্যাত্ম উপলব্ধির কাহিনী পড়লে আশ্চর্য হ'তে হয়।

কামারহাটির এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। নয় বৎসর বয়সে তাঁর পিতা কাশীনাথ ভট্টাচার্য ২৪-পরগণা জেলার বোদ্রার নিকটে পাইঘাটি গ্রামের এক দরিদ্র যুবকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিবাহের অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি বিধবা হন। বিবাহিত জীবন যে কী তা তখন তিনি জানতেনই না। শ্বশুরবাড়ীতে কিছুকাল থাকার পর তিনি পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নীলমাধব ভট্টাচার্য গ্রামের শ্রীরাধামাধব বিগ্রহের পূজারী ছিলেন। অঘোরমণি দেবী ক্রমে মন্দির এবং তার বাগানের দিকে আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। সেইখানে মন্দিরের

প্রতিষ্ঠাতা ভক্তবর গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বিধবা বাস করতেন। অচিরেই বালিকা অঘোরমনির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি বাগানের গৃহেই বাস করতে শুরু করেন। এই ছোট বাড়ীটি গঙ্গাতীরেই অবস্থিত ছিল। এইখানেই অঘোরমনি ভক্তি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে বড় হ'য়ে উঠতে লাগলেন।

কালক্রমে একজন বৈষ্ণব গুরুর কাছ থেকে পরে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর জীবনের আদর্শ, অন্তরের বিগ্রহ ছিলেন শিশু কৃষ্ণ। তাঁর নিজের ঘরে তিনি ধ্যান ও মালা জপ করে সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসর কৃষ্ণের সাধনা করেন। আর এতো তীব্র ছিল তাঁর আকুতি যে সন্তানরূপে শেষপর্যন্ত তিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ দত্তের বিধবার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আবার আসতে বলেছিলেন। প্রথম দর্শনের পরই অঘোরমনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে আসেন, এবং ক্রমেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হ'তে থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শিশুভাব জেগে উঠত। মা যশোদার বাড়ীতে বাল গোপালের মতো তিনি অঘোরমনিকে মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদির জন্যে জ্বালাতন করতেন। এঁদের দুজনের সেই মধুর বাৎসল্য ভাবের বর্ণনা করার ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অঘোরমনির সাধিকা জীবনের বিরল উপলব্ধিগুলির বর্ণনা দেওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। তিনি এমন একটি উচ্চস্তরের অধ্যাত্মজগতে বাস করতেন যার সামান্যতম আভাসও সাধারণ মানুষের পক্ষে অলভ্য। একদিন জপের শেষে তিনি ইষ্ট দেবতাকে ফলমূল নিবেদন করলেন, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, চোখ মেলে তিনি দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিভরা মুখে ডান হাত মুঠো ক'রে তাঁর কোলের উপর বসে আছেন। অঘোরমনি হাত বাড়িয়ে তাঁকে ছুঁতে গেলেন, কিন্তু মূর্তিটা তখনই অদৃশ্য হ'য়ে গেল, আর সেখানে তিনি দেখলেন শিশু গোপাল ননীর জন্যে এক হাত বাড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আসছেন। এই দিব্য দর্শনের কথা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন,

“কী যে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম আমি! আনন্দে আমি কেঁদে ফেলে বলে উঠলাম, ‘হায়রে, গরীব বিধবা আমি, ক্ষীর ননী কোথা থেকে পাব, বাছা?’ কিন্তু গোপাল একথায় কান দিল না। সে বারবার করে বলতে লাগল, ‘খেতে দাও কিছু।’ জলভরা চোখে আমি তখন উঠে তার জন্যে কয়েকটা নারকেলের নাড়ু নিয়ে এলাম। গোপাল তখন আমার কোলে বসে, মালা কেড়ে নিয়ে, পিঠের

ওপর ঝাঁপিয়ে, সারাঘরে ছুটোছুটি ক'রে এমন দৌরাত্ম্য শুরু করল যে মন্ত্র জপ করা আমার অসাধ্য হ'য়ে উঠল।”

পরদিন সকালে গোপালের মূর্তিকে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন। গোপালের টুকটুকে পা দু'খানি তাঁর আঁচলের ভিতর দিয়ে শিশুর মতো বেরিয়ে ছিল তখন। সেদিন তাঁর মনের সাধও বাস্তবে রূপায়িত হল। তিনি যখন এসেছিলেন, তখন তাঁর ভাবোন্মাদের অবস্থা চলছে—চুল খুলে গেছে, চোখের দৃষ্টি স্থির, শাড়ীর আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ঢুকে তিনি বসামাত্র রামকৃষ্ণও ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ছোট শিশুর মতো তাঁর কোলে গিয়ে বসলেন। অঘোরমনি তখন এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যা সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য। তিনি বললেন, “এই তো গোপাল আমার কোলের ওপর। ......এইবার সে তোমার শরীরে ঢুকে গেল।......আবার সে বেরিয়ে এল। এস, সোনা আমার, তোমার দুখিনী মায়ের কাছে এস।” এই রকম আবেগ রুদ্ধ অবস্থায় তিনি ভাবসমাধি লাভ করলেন। সেইদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সকলে তাঁকে ‘গোপালের মা’ বলে ডাকতে শুরু করলেন। অধ্যাত্ম-সাধনা এবং সদগুণাবলীর জন্যে এই কুমারী বিধবা কৃষ্ণের জননীতে রূপান্তরিতা হ'য়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সারাদিন ধ'রে রেখে স্নানাহারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাঁর ভাবাবেশের অবস্থা কিছুটা শান্ত হলে তাঁকে নিজের বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সেখানেও এইরকম দৈবলীলা অব্যাহত ভাবেই চলতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার তাঁকে বলেছিলেন, “তুমি অসাধ্যসাধন করেছ। এযুগে তোমার মতো সিদ্ধি পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার।”

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান তাঁর বুকে কঠিন হ'য়ে বেজেছিল। তখন তাঁর খুবই বয়স হয়েছে, কিন্তু গোপালকে দেখার দিব্য দর্শন তখনো তার একভাবেই চলছে। কোনো কোনো সময়ে তিনি গোপালকে সর্বত্র এবং সর্বভূতে প্রকাশমান দেখতে পেতেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অঘোরমনি অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় বলরাম বসুর গৃহে স্থানান্তরিত করা হল। ভগিনী নিবেদিতা কন্যার মতো ভক্তি-ভালোবাসায় তাঁকে সেবা করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে মাঝে মাঝেই দেখতে আসতেন। মহাপ্রয়াণের আগে তাঁকে গঙ্গাতীরে আনা হল। তারপর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাঁর পদদ্বয় পুণ্যসলিলা গঙ্গার জলে স্পর্শ করে রাখা হল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই অনন্ত শান্তির মধ্যে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

লক্ষ্মীমণি দেবী

(লক্ষ্মীদি নামে পরিচিতা)

লক্ষ্মীমণি দেবীকে সকলে লক্ষ্মীদি বলে ডাকত। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। কালক্রমে তিনি একজন সাধিকা নারী হ'য়ে ওঠেন। কামারপুকুরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম হয়। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী থেকে তিনি প্রায় দশ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-যত্ন করতেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল শিবরাম।

লক্ষ্মীমণি কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেননি। পরবর্তী জীবনে অবশ্য তিনি পড়তে শিখেছিলেন, এবং রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি বাংলা ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'রে এই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতেন।

তিনি ছিলেন স্বভাবতই স্বল্পভাষী। নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তিনি বড় একটা কথা বলতে চাইতেন না। অল্পবয়সেই হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁর মনে ভক্তিভাব জাগ্রত হয়। শীতলা এবং রঘুবীরকেই তিনি বিশেষভাবে পূজা করতেন। নয় বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা রামেশ্বরের মৃত্যু ঘটে। বারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পরে তাঁর দাদা রামলাল শ্রীরাম-কৃষ্ণকে তাঁর বিবাহের সংবাদ দেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তন্ময় অবস্থায় এসে বললেন, "অল্প দিনের মধ্যেই ও বিধবা হবে।" তাঁর ভাগিনেয় হৃদয় কাছেই ছিলেন। তিনি ব্যথিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আশীর্বাদ জানানোর পরিবর্তে কেন তিনি অমন কঠিন কথা বললেন। রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "আমি কী করব? মা কালী আমাকে দিয়ে বলালেন যে। লক্ষ্মী হল মহা তেজস্বিনী মা শীতলার অংশ, আর ওর স্বামী হল একজন সাধারণ মানুষ। এমন লোকের সহধর্মিণী হতে পারে না লক্ষ্মী।......বিধবা হওয়া ছাড়া ওর উপায় নেই।" সত্যিই, একদিন লক্ষ্মীর স্বামী কাজের চেষ্টায় বাড়ী থেকে বের হলেন, তারপর আর তাঁর কোনো খবর পাওয়া গেল না। তাঁর আত্মীয়েরা বারো বছর ধ'রে তার খবর নেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো খবরই যখন পাওয়া গেল না, তখন এতদিনের স্থগিত রাখা শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করা হল। লক্ষ্মী অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে কোনো দাবীদাওয়া তোলেননি।

লক্ষ্মীর যখন চৌদ্দ বছর বয়স তখন তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বৈষ্ণব সাধনায় দীক্ষা দেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫

পর্যন্ত তের বৎসরকাল তিনি বেশীর ভাগ সময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমার সাহচর্যে ছিলেন এবং তাঁর জীবনও তাঁদের পুণ্য জীবনের প্রভাবে বিকাশ লাভ করে। তিনি বলতেন—

"কতদিন আমি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে নহবতের একখানা ছোট ভাঁড়ার ঘরে কাটিয়েছি। শ্রীশ্রীমা রান্না করতেন, আমি তাঁর পুজোর কাজে সাহায্য করতাম। সে সময়ে সারাদিনই কাতারে কাতারে ভক্তরা আসতেন। তাঁদের প্রত্যেকের রুচি অনুসারে কতো অসময়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হত আমাদের। আমাদের মধ্যে এত মিল ছিল যে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের "শুক-সারী" বলে ডাকতেন। নহবৎ বাড়ীর যে ঘরটায় আমরা থাকতাম সেটা এতো ছোট ছিল যে তাকে তিনি খাঁচার সঙ্গে তুলনা দিতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সেই পুণ্য আবহাওয়ায় থাকার যে কী আনন্দই ছিল তখন। সারাদিন সব কাজে তাঁর সঙ্গে থেকে কাজও যেমন শেখা যেত তেমনি পরমহংসদেবের ও শ্রীশ্রীমার পুণ্যজীবনের অমৃতধারা পান ক'রে ধন্য হওয়া যেত।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সময় তিনি শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুর বাগানে শ্রীশ্রীমাকে সাহায্য করতেন, রামকৃষ্ণদেবের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তরের পর তিনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে এক বৎসর বৃন্দাবনে থেকে অধ্যাত্ম-সাধনায় রত থাকেন। তারপর শ্রীশ্রীমা পুরী গেলে তিনিও তাঁর সঙ্গে যান। তিনি গঙ্গাসাগর, নবদ্বীপ, এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম, গয়া, বারানসী এবং হরিদ্বারও দর্শন করেন। যখনই সম্ভব হত লক্ষ্মীদিদি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বাস করতেন, অন্য সময়ে থাকতেন কামারপুকুরে। তাঁর ভ্রাতা রামলালের পত্নীবিয়োগ ঘটার পর তিনি লক্ষ্মীদিদিকে তাঁর কাছে এসে বাস করতে অনুরোধ করেন। তারপর থেকে তিনি দশ বৎসর কাল তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কাটান।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে তিনি আবার পুরীতে যান। সেখানে পৌরসভার কাছ থেকে তাঁর জন্যে একখন্ড জমি পাওয়া যায় এবং সেই জমিতে একটি বাড়ী তৈরী করা হয়। ১৯২৪ এর ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে গৃহপ্রবেশ করে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। ১৯২৬-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী, বাষট্টি বৎসর বয়সে অগণিত ভক্তকে শোকসাগরে মগ্ন করে তিনি লোকান্তরে গমন করেন।

'দি মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

"ভগিনী লক্ষ্মী বা ভারতীয় পদ্ধতিতে তাঁকে যেমন ডাকা হত, লক্ষ্মীদিদি প্রকৃতই শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং তাঁর বয়সও অপেক্ষাকৃত কম। গুরু এবং ধর্মোপদেষ্টা হিসাবে অনেকেই তাঁর অন্বেষণ করেন। আর তাঁর গুণও যেমন অগাধ, সঙ্গী হিসাবেও তিনি তেমনি আনন্দদায়ক। কখনো হয়তো তিনি ধর্ম-মূলক যাত্রাগান থেকে পাতার পর পাতা বক্তৃতা আবৃত্তি করে যাবেন, আবার কখনো উপস্থিত লোকদের নানাদলে বিভক্ত ক'রে নানা ধর্ম-কাহিনীর চরিত্রাভিনয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে সারা ঘরে স্নিগ্ধ আনন্দের প্রবাহ বইয়ে দেবেন। প্রথমে হয়তো কালী, তারপর সরস্বতী, তারপর হয়তো জগদ্ধাত্রী, কিম্বা কদম্বমূলে কৃষ্ণ—এইভাবে সামান্য উপকরণে লোকদের সাজিয়ে তিনি বিস্মিত ক'রে দিতে পারেন।"

যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস

(যোগীন-মা নামে পরিচিতা)

যোগীন্দ্র মোহিনী বিশ্বাস ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে উত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রসন্ন কুমার মিত্র একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকও ছিলেন তিনি।

ছয়-সাত বৎসর বয়সে ২৪-পরগণা জেলার খড়দহের জমিদার বংশের অম্বিকা-চরণ বিশ্বাস নামে একজন রূপবান ধনী ব্যক্তির সঙ্গে যোগীন্দ্র মোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল অত্যন্তই দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর স্বামী পাপ-জীবনে আসক্ত হ'য়ে অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত ধনসম্পদ উড়িয়ে দেন। একটিমাত্র কন্যা ছিল তাঁর। এই কন্যাটির বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাংসারিক দায়িত্ব শেষ হ'য়েছে অনুভব ক'রে তিনি তাঁর স্বামীগৃহ ত্যাগ ক'রে বাগবাজারে তাঁর পিতৃ-গৃহে ফিরে এসে বিধবা মায়ের সঙ্গে বাস করতে শুরু করেন। বলাই বাহুল্য যে এ ঘটনার আগে যোগীন্দ্র মোহিনীর মতো একজন অল্পবয়স্কা মা কতো বছরই না যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটিয়েছেন।

যোগীন্দ্র মোহিনীর শ্বশুরবাড়ীর দিক দিয়ে আত্মীয় ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একজন গৃহীভক্ত বলরাম বসু। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন একবার তাঁর বাড়ীতে এসে-ছিলেন সেই সময় বলরাম বসু যোগীন্দ্র মোহিনীকে সেখানে নিয়ে যান। তখন যোগীন্দ্র মোহিনীর মানসিক অশান্তির চূড়ান্ত অবস্থা। এই দর্শনের পর ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসতে লাগল। যে আত্মিক শান্তির জন্যে তিনি

তৃষিত হ'য়ে ছিলেন, তার সাক্ষাৎ পেতে লাগলেন তিনি। তিনি এর আগেই কালীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মন্ত্রে সম্মতি জানিয়ে তাঁর উপদেষ্টা হতে রাজি হলেন। তিনি যোগীন-মার সম্বন্ধে বলতেন, "যোগীন সাধারণ ফুলের কুঁড়ি নয় যে চট করে ফুটে উঠবে। ও হল সহস্রদল পদ্ম, ফুটবে বেশ ধীরে ধীরে।"

দক্ষিণেশ্বরে তিনি শ্রীশ্রীমার দর্শন লাভ করেন। শ্রীশ্রীমা তখনই অনুভব করেছিলেন, এতদিনে সারাজীবনের সঙ্গিনী খুঁজে পেলেন তিনি। রামকৃষ্ণের ভক্তবৃন্দ যোগীন্দ্র মোহিনীকে যোগীন-মা বলে ডাকতেন। যোগীন-মা সপ্তাহে অন্তত একবার দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে রাত্রিবাস করে যেতেন। তাঁরা পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমার পুণ্যজীবনের দৃষ্টান্তে যোগীন-মা উচ্চতর অধ্যাত্ম-সাধনায় ব্রতী হতে থাকেন। তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধির বাসনাও তীব্রতর হ'তে থাকে। তিনি রামায়ণ-মহাভারত ও প্রধান প্রধান পুরাণগুলি, এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ম ছিল যে তিনি এইসব পুণ্যগ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলী নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারতেন। তাঁর এই গুণের জন্যে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে তাঁর "ক্র্যাড্‌ল টেল্‌স্‌ অব হিন্ডুইজম্‌" নামক গ্রন্থ প্রণয়নকালে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহে দর্শন দান করেন। সেই উপলক্ষে যোগীন-মা অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর শয়ন-কক্ষে পদার্পণ ক'রে কিঞ্চিৎ জলযোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এর ফলে ঐ কক্ষটি বারানসী তুল্য পুণ্যস্থান হ'য়ে উঠবে এবং সেখানে মৃত্যু ঘটলে তাঁর আত্মার মুক্তিলাভ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সানন্দে তাঁর অনুরোধে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবনে অধ্যাত্ম-সাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তর সংবাদ পেয়ে যোগীন-মা অত্যন্তই ব্যথা অনুভব করেন। শেষ সময়ে যে তাঁর দেখা পেলেন না এই ভেবেই যোগীন-মা বেশী কাতর হ'য়ে উঠেছিলেন। তারপর শ্রীশ্রীমা তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে বৃন্দাবনে এলে তাঁর দর্শনে রামকৃষ্ণের বিচ্ছেদ তিনি দ্বিতীয়বার করে অনুভব করেন। কিন্তু তাঁরা দুজনেই একটি দিব্য-দর্শনে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করেন। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'য়ে বলেছিলেন, "এত কান্নাকাটি করছ কেন? এই তো আমি। কোথায় গেছি বলতো? এঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার মতো বইতো নয়।"

একবার লালাবাবুর মন্দিরে ধ্যান করার সময় যোগীন-মা সমাধিস্থ হ'য়ে জ্ঞান ফিরে পেতে এত দেরী করতে লাগলেন যে শ্রীশ্রীমা রীতিমত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। যোগীন-মা পূর্ণ সমাধি লাভ ক'রে উপবিষ্ট ছিলেন তখন। এ বিষয়ে পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন, "তখন আমার মন ধ্যানের মধ্যে এমন গভীরভাবে ডুবে গিয়েছিল যে বাইরের জগতের কোনো চেতনাই আমার ছিল না।......আমি আমার ইষ্ট-কে সর্বত্রই দেখতে পেতে লাগলাম। তিন দিন কেটে গিয়েছিল এইভাবে।"

পিত্রালয়ে থাকার সময়ও তাঁর এইরকম অনুভূতি হত। একবার স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছিলেন, "যোগীন-মা, সমাধির মধ্যেই তুমি দেহত্যাগ করবে। কারণ একবার কারো এই উপলব্ধির সৌভাগ্য ঘটলে মৃত্যুর সময়ে সেই স্মৃতি তার মনে ভেসে ওঠে।" তিনি পরম ভক্তিভরে শিশুগোপালের পূজা করতেন। তিনি বলেছেন, "একদিন পূজা করার সময় দুটি অতিসুন্দর ছেলে হাসতে হাসতে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। আমার পিঠের ওপর আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কে তা জানো?" আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই জানি। তুমি হচ্ছ বীর বলরাম, আর তুমি কৃষ্ণ।' ছোটজন তারপর বলল, "তুমি কিন্তু আমাদের মনে রাখবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন?' আমার নাতিদের দিকে দেখিয়ে সে বলল, 'ওদের জন্যে।'" সত্যি, তাঁর কন্যার অকালমৃত্যুর পর কিছু দিনের জন্যে তিনি তাঁর অনাথ নাতিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর ধ্যান অগভীর হ'য়ে উঠেছিল।

তিনি খুব নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। তিনি এমন কতকগুলি সাধনায় রত হ'য়েছিলেন যা অত্যন্তই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে পঞ্চতপা সাধন করেন। তিনি পুরীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য স্বামী সারদানন্দ কর্তৃক নিয়মমতো তান্ত্রিক সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন। অবশ্য পূজার সময় ছাড়া তিনি গৈরিক বাস ধারণ করতেন না।

শ্রীশ্রীমা বলতেন, "যোগীন মহা-তপস্বিনী।" এবং "ও মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানী মানুষ।" যোগীন-মা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন দেহত্যাগ করেন।

গোলাপ সুন্দরী দেবী

(গোলাপ-মা নামে পরিচিতা)

গোলাপ সুন্দরী দেবী পরবর্তী কালে গোলাপ-মা নামে পরিচিতা হ'য়েছিলেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর কলিকাতার এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁর বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। অল্প বয়সেই একটি পুত্র এবং একটি কন্যা রেখে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে। কিছুকালের মধ্যে শিশুপুত্রটিও মারা যায়। তাঁর কন্যা চণ্ডীর বিবাহ হ'য়েছিল পাথুরিয়াঘাটা রাজ পরিবারের সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে। কিন্তু তারও অকাল মৃত্যু ঘটে। এরপর গোলাপ সুন্দরীর নিজের বলতে আর কেউই রইল না, মনেও তাঁর কোনো শান্তি ছিল না।

যোগীন-মা ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী। একবার তিনি গোলাপ সুন্দরীকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাওয়ার পর ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর ছাড়া যে সংসারে আর তাঁর কারো কথাই ভাববার নেই, এইটেই তাঁর পরম সৌভাগ্য। একথা শুনে অত্যন্ত সান্ত্বনা লাভ করলেন তিনি। শ্রীশ্রীমা তখন নহবৎবাড়ীতে বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে গোলাপ-মার পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী হ'য়ে উঠলেন গোলাপ-মা।

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পুরনো কোঠাবাড়ীতে দর্শন দিলেন। এখানে তিনি তাঁর ভাইবোনদের সঙ্গে বাস করতেন। তাঁর এই দর্শনলাভে গোলাপ-মা এতোই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন যে, তাঁর সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণাই যেন তিরোহিত হ'য়ে গেল। রামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে গোলাপ-মার যত্ন নিতে বললেন। তিনি জানালেন, আজীবন ছায়ার মতো গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমার অনুসরণ করবেন। সত্যি, শ্রীশ্রীমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছত্রিশ বৎসর ধ'রে গোলাপ-মা অক্ষুণ্ণ উৎসাহে তাঁর সেবা করেছিলেন। শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুর বাগানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শেষব্যাধির সময় গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমার কাছে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষায় সাহায্য করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বারাণসী বৃন্দাবন এবং মাদুরা-রামেশ্বরে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। সর্বদাই তিনি সযত্নে শ্রীশ্রীমার সেবাযত্ন করতেন।

তাঁর দৈনন্দিন জীবন ছিল অনাড়ম্বর। তিনি ভোর চারটেয় শয্যাত্যাগ ক'রে নিজের ঘরে জপ-তপ করতেন। তারপর কুটনো কুটে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতেন। ফিরে এসে শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন। পূজা শেষ হলে প্রসাদী ভোগ ভক্ত ও পরিচারকদের মধ্যে বিতরণ করতেন গোলাপ-মা। বিকালে তিনি মহাভারত ও ভগবদ্ গীতা পাঠ করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের

উপদেশাবলী নিয়ে আলোচনা করতেন। সন্ধ্যার পর তিনি রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত জপতপ করতেন। তারপর তিনি আহারাদি শেষ ক'রে শুতে যেতেন। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "গোলাপ জপ ক'রে ঈশ্বর পেয়ে গেছে।"

গোলাপ-মা দরিদ্রদের ভালোবাসতেন। তাঁর উপার্জনের অর্ধেক তিনি দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করতেন।

শ্রীশ্রীমার মৃত্যুর পর তিনি আরো চার বৎসর বেঁচে ছিলেন। প্রায় ষাট বৎসর বয়সে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

গৌরীমণি দেবী

(গৌরী-মা নামে পরিচিতা)

গৌরীমণি দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার শিবপুর নিবাসী পার্বতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ সন্তান। তাঁর জননী গিরিবালা দেবী ছিলেন ধর্মবতী নারী। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ভালোই জানতেন, এবং ফার্সী ও ইংরাজীও কিছু কিছু জানা ছিল তাঁর।

গৌরীমনিকে বাল্যকালে মৃদানী ব'লে ডাকা হত। তিনি প্রথমে স্থানীয় মিশনারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তৎকালীন বিশপের ভগ্নী কুমারী মেরিয়া মিলম্যান এই বিদ্যালয়ের একজন সংগঠিকা ছিলেন। তিনি মৃদানীকে এতো ভালোবাসতেন যে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টান শিক্ষকদের হিন্দুধর্মের প্রতি অবজ্ঞায় বালিকা মৃদানীর মন এত বিরূপ হ'য়ে ওঠে যে তিনি বিদ্যালয়ে যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক সংস্কৃত স্তোত্র এবং গীতা ও চণ্ডী মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলেন। তাছাড়া রামায়ণ-মহাভারতের অনেক অংশও তিনি আবৃত্তি করতে পারতেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞান তাঁর ভালোই ছিল।

বালিকা বয়সেই মৃদানীর মন অত্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে অভিষিক্ত হ'য়ে উঠেছিল। প্রায় দশবছর বয়সে একজন ব্রাহ্মণ গুরুর কাছ থেকে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং একজন ভক্ত নারী শ্রীদামোদর-রূপী শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রস্তর-বিগ্রহ দিয়েছিলেন তাঁকে। এই মূর্তিটি তিনি সযত্নে বহুক্ষণ ধরে পূজা করতেন। সারাজীবনই এই মূর্তিটি তাঁর সঙ্গে ছিল।

তাঁর মা এবং অন্যান্য আত্মীয়েরা তাঁর দ্রুত আধ্যাত্মিকভাবের বিকাশে ভীত হ'য়ে উঠে তের বছর বয়সেই তাড়াতাড়ি তাঁর বিবাহ স্থির করে ফেললেন। তিনি অবশ্য তাঁর মার কাছে বারণ ক'রে বলেছিলেন, "আমি এমন বরকে বিয়ে করব যে

অমর।” অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণকেই তিনি স্বামীত্বে বরণ করবেন। বিবাহের আগের দিন তাঁকে একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হল। ভয় ছিল, পাছে তিনি পালিয়ে যান। যাই হোক, তাঁর আত্মীয়স্বজনের চেয়ে বুদ্ধি তাঁর বেশীই ছিল। রাত্রে তিনি পালিয়ে গেলেন। তারপর অবশ্য তাঁকে খুঁজে পেয়ে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হ'য়েছিল। কিন্তু বিয়ের কথা আর কখনো তোলা হয়নি।

অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে গৃহীজীবন তাঁর অনুকূল নয়। আঠারো বৎসর বয়সে আত্মীয়দের সঙ্গে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যে অন্যত্র চলে গেলেন। তারপর তিনি একদল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে হরিদ্বারে গেলেন। তিনি গৃহীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন। কখনো কখনো তিনি গভীর অরণ্যপথে ভ্রমণ করে অনেক বিপদেরও সম্মুখীন হতেন। কিন্তু কখনো তিনি নতিস্বীকার করতেন না। তাঁর গলায় ঝোলানো দামোদরের মূর্তিই ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। সামান্য কয়েকটি সাংসারিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদি ছাড়া গীতা, ও কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও মা-কালীর পটই ছিল তাঁর একমাত্র সম্পদ। এইভাবে তিনি একে একে কেদারনাথ, বদ্রিনারায়ণ, জ্বালামুখী, অমরনাথ, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং পুরী দর্শন করতে সমর্থ হতেন। তীর্থভ্রমণের সময় লোকালয় ছাড়া গিরিপ্রান্তরে সর্বদাই তিনি গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতেন। কখনো কখনো তিনি আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে ভস্ম এবং কাদা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখতেন, কিংবা আলখাল্লা ও পাগড়ী পরে পুরুষ সাজতেন। কখনো কখনো তিনি পাগলের মতো ভানও করতেন। দ্বারকায় তাঁর আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ হ'য়েছিল।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। একদিন বলরাম বসু তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে গৌরীমাকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা করিয়ে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আবার আসতে বললেন। সেই অনুসারে পরদিনই তিনি একা আবার দক্ষিণেশ্বরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরম করুণাভরে তাঁকে নহবৎবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এর পর থেকে গৌরী-মা মাঝে মাঝে এসে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

একদিন ভোরবেলায় গৌরী-মা যখন মন্দিরের বাগানে ফুল তুলছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, “গৌরী, আমি জল ঢালছি, তুমি কাদা ছানো।” একথাটা

গৌরী-মা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করছেন দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, "আহা, একেবারেই আমার কথা বুঝতে পারনি তুমি। আমি যা বলছি তার মানে হল, এদেশের মেয়েরা বড়ই দুরবস্থার মধ্যে আছে। তাদের জন্যে কাজ কর তুমি।" তখন গৌরী-মা সব কথা বুঝতে পারলেন। কিন্তু হৈচৈময় জনাকীর্ণ শহরে কাজ করা তিনি ঠিক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, ছোট মেয়েদের যদি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে শিক্ষা-দান করতে হয় তবে সে কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, "তোমাকে এই শহরেই মেয়েদের শিক্ষার জন্যে কাজ করতে হবে। অনেক সাধনা করেছ তুমি। এখন এই তপঃশুদ্ধ জীবন মেয়েদের সেবায় দান কর তুমি।" এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরী-মাকে উৎসাহ ও আশীর্বাদ দিয়ে নারী ও বালিকাদের জন্যে ভবিষ্যৎ কর্মের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে ১৮৮৬ খৃীষ্টাব্দে তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে নয় মাস ধরে কঠোর অধ্যাত্মসাধনায় রত হ'য়েছিলেন। এই সাধনা শেষ হওয়ার আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে দেহরক্ষা করলেন। গৌরীমা এতই শোকাহত হ'য়েছিলেন যে কঠোর তপশ্চর্যা দ্বারা জীবন বিসর্জন দেবেন বলে স্থির করে-ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দৈবদর্শন দান ক'রে এমন চরম কাজ করতে নিষেধ করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীশ্রীমা যখন বৃন্দাবনে এলেন তখন তিনি গৌরীমার জন্যে অনেক অনুসন্ধান ক'রে রৌয়ার এক নির্জন গুহায় তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা একবৎসর বৃন্দাবনে থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন, কিন্তু গৌরী-মা সেখানেই থেকে গেলেন। মাঝে শুধু একবার তিনি হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। সবশুদ্ধ প্রায় দশ বৎসর কাল উত্তর ভারতে অবস্থান করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

তাঁর দেশব্যাপী সুদীর্ঘ ভ্রমণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, ভারতীয় নারী ও বালিকাদের শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও বিরাট সংগঠন ক্ষমতা ইত্যাদির ফলে গৌরী-মা শ্রীরামকৃষ্ণ-আদিষ্ট কর্মের পক্ষে সুযোগ্য অধিকারিণী ছিলেন। তাই ১৮৯৫ খৃীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর নামানুসারে কলকাতার নিকটে বারাকপুরের কল্পেশ্বর নামে গঙ্গাতীরস্থ স্থানে তিনি নিজের সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল তাই দিয়ে সারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। অচিরকালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি বৃহদাকার হ'য়ে উঠল। ১৯১১ খৃীষ্টাব্দে এটি কলকাতায় একটি স্থানে স্থানান্তরিত করা হল। তারপর

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের ২৬নং মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটের বর্তমান বাড়ীতে উঠে এল আশ্রমটি।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গৌরী-মার স্বাস্থ্য খারাপ হ'য়ে যেতে শুরু করল। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর বৎসর। তিনি শেষবারের মতো পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে গেলেন। বছর দুই পরে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে বৈদ্যনাথ-ধামে গেলেন। এবং পরবৎসর গেলেন নবদ্বীপে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শিবরাত্রির দিন তিনি জানালেন তাঁর জীবননাট্য দ্রুত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। শেষরাত্রির দিকে তিনি শ্রীদামোদরের বিগ্রহটি তাঁর কাছে আনতে বললেন। মূর্তিটি দেখে তিনি বললেন—"সুন্দর। চোখ খুলেই হোক আর চোখ বন্ধ করেই হোক, আমি স্পষ্ট তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। সর্বদাই দেখতে পাচ্ছি আমি তাঁকে।" তিনি মূর্তিটি আশ্রমের প্রধান কর্মকর্ত্রীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে মাথায় আর বুকে স্পর্শ করলেন। পরদিন তিনি প্রথমে তিনবার "গুরু রামকৃষ্ণ" নাম নিয়ে তারপর কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটে ইহধাম ত্যাগ করলেন।

গুরু হিসাবে গৌরী-মা শতশত ভক্তকে নিয়ত উপদেশ দিয়ে অধ্যাত্মপথে চালিত করেছিলেন।[১]

---

১ এই অধ্যায়ের উপকরণ সংগৃহীত হ'য়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মায়লাপুর, মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত "শ্রীরামকৃষ্ণ, দি গ্রেট মাষ্টার" এবং "বেদান্ত কেশরী" (হোলি মাদার নাম্বার) থেকে, এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "উদ্বোধন" পত্রিকার (উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা।) সংখ্যাগুলি থেকে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সাধিকাগণ

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারীগণের মর্যাদার উন্নতি

অবতরণিকা

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অবদান

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে অনেক দিক দিয়েই পৃথক। সেজন্যে হিন্দুরা এঁদের অনাচারী মনে করেন। সর্বশ্রেণীর এবং সর্বসম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমাধিকার এই দুই ধর্মমতের অন্যতম বৃহৎ অবদান।

বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক সমাজবিন্যাসে বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছিল। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাই জাতিভেদ প্রথা বলে পরিচিত হ'য়েছিল। বৈদিক-যুগের পরে যে সমস্ত সামাজিক ও ধর্মগত সুযোগ সুবিধা প্রথম দুই বর্ণের লোকেরা এবং বিশেষ ক'রে প্রথম বর্ণের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ যাজকেরা ভোগ করতেন, তা চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের বা আর্যসমাজের বহির্ভূত "দাস্যু"-দের তো ভোগ করতে দেওয়াই হত না, এমন কি তৃতীয় বর্ণের অন্তর্গত বৈশ্যরাও ছিল সেসব অধিকারের বাইরে। বস্তুত দাস্যু আর অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা মানুষ হিসাবে যা তাদের প্রাপ্য এমন কোনোরকম সামাজিক বা ধর্মগত অধিকারই ভোগ করত না।

বেদ-পরবর্তী যুগের মহান যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ যিনি 'ভগবদ্-গীতা'র উদ্‌গাতা, তিনিই প্রথমে সর্বমানবে[১] ধর্মগত সমাধিকার দান করেছিলেন। তিনি সামাজিক সমাধিকারও প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করেননি।

কয়েক শতাব্দী পরে মহাবীর ও বুদ্ধদেব প্রচার করলেন, সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষেরই ধর্মের অধিকার আছে। উচ্চবর্ণের নারী ও পুরুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সমতা বৈদিক যুগে প্রবর্তিত হ'য়েছিল সেই অধিকার নিম্ন-বর্ণের নারীপুরুষের মধ্যেও বিস্তার লাভ করল। এই দুই ধর্মপ্রবর্তক মহামানব সকল শ্রেণীর সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে সামাজিক সমতাও প্রচার করেছিলেন, আর এই সমতা দেশের নারীসমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। মহাবীর (৫৯৯—৫২৭ খৃীঃ পূর্বাব্দ) ছিলেন বুদ্ধদেবের (৫৬০—৪৮০ খৃীঃ পূঃ) পূর্ববর্তী। নারীদের সামাজিক ও ধর্মগত মর্যাদার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার প্রথম গৌরব তাঁরই।

---

১ ভগবদ্-গীতা, নবম অধ্যায়, ৩০-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

দুটি বিপরীত শক্তি

প্রাচীনতম কাল থেকেই ভারতবর্ষে রক্ষণশীলতা ও উদারতার মনোভাব সামাজিক ও ধর্ম সম্পর্কিত ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে এতোবার এসেছে যে তা দেখে আমাদের মনে পড়ে মানুষের হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও প্রসারণের কাজ। যখনই সামাজিক ও ধর্মগত ক্ষেত্রে কঠোর বিধিবিধান শ্বাসরোধ করার উপক্রম করেছে, তখনই উদারতার মনোভাব দেখা দিয়ে নারীপুরুষের সমান সামাজিক ও ধর্মগত অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। আবার সেই রকমই, যখন ঐ সব উদারতার যা প্রয়োজনীয়তা তা শেষ হ'য়েছে এবং দেশের সামাজিক ও ধর্মগত জীবন বিদেশী প্রভাবে বিপন্ন হ'য়ে উঠেছে, তখন রক্ষণশীলতার মনোভাব দেখা দিয়ে ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করেছে। কাজেই, এই দুটি মনোভাবই নিজ নিজ উপায়ে ভারতীয় সমাজজীবনকে পরিপুষ্ট করে এসেছে।

বৌদ্ধধর্ম

হিন্দুধর্মের কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশাসন থেকে মুক্তি দেয় বলে বৌদ্ধধর্ম একটি স্বতন্ত্র জীবনপদ্ধতি হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। এই মুক্তির ছাপ বৌদ্ধদের সমাজ, রীতিনীতি এবং আচারব্যবহার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যেত। করুণাময় তথাগত ঘোষণা করেছিলেন, জাতিবর্ণ-স্ত্রীপুরুষ-অভেদে ধর্মের পথ সকলের জন্যেই উন্মুক্ত। বুদ্ধদেব শ্রমণদের যে সংঘারাম স্থাপিত করেছিলেন তাতে তিনি উচ্চনীচ, ধনীদরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলকেই আশ্রয় দিতেন। শ্রমণীদের যে সংঘারাম স্থাপনের জন্যে তিনি সম্মতিদান করেছিলেন, তাতেও বিবাহিতা-অবিবাহিতা-বিধবা অভেদে সমাজের সকল স্তরের নারীদেরই গ্রহণ করা হত।

সঙ্ঘের মধ্যে অধ্যাত্ম-অগ্রগতিই একমাত্র বিচার্য বিষয় ছিল। শ্রমণী হিসাবে যাদের গ্রহণ করা হত সেই নারীদের মধ্যে ব্যবহারের অন্য কোনো তারতম্য করা হত না। এমন কি নটী এবং পতিতাদের সঙ্ঘে গ্রহণ করা হত এবং অন্য শ্রমণী-দের মতোই তাদের প্রতি সমান ব্যবহার করা হত, অতীত জীবনের কোনো রকম অসম্মানই ভোগ করত না তারা। শ্রমণী ও নতুন শিক্ষার্থিনীরা শ্রমণ এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদের মতোই একরকম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করত। গৃহস্থ নারী ভক্তদেরও বৌদ্ধ মতবাদের ধর্মনীতির বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত।

অবশ্য বৌদ্ধযুগে সাধারণভাবে নারীদের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেলেও শ্রমণী-দের স্থান ছিল শ্রমণদের নিচের স্তরে। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধদেব প্রথমে নারীদের সঙ্ঘে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুকই ছিলেন। কিন্তু তাদের গ্রহণ করে দীক্ষাদান না করা তাঁর বাণীর মূলনীতির বিরোধী হওয়ায় বাধ্য হ'য়ে তাঁকে নারীদের জন্যে সঙ্ঘ স্থাপনে মত দিতে হ'য়েছিল। তবে তিনি শ্রমণীদের আচার ব্যবহারের জন্য কতকগুলি কঠোর বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন।

কীভাবে বৌদ্ধ শ্রমণীদের সঙ্ঘারাম স্থাপিত হয়েছিল

সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র এবিষয়ে একমত যে মহা-প্রজাবতী গৌতমী রাজপ্রাসাদের পাঁচশত অনুচরীসহ সংসার ত্যাগ ক'রে প্রথম শ্রমণী সঙ্ঘ স্থাপন করেন। গৌতমী ছিলেন বুদ্ধদেবের পালিকা মাতা এবং দ্বিতীয় মহিষী। তিনিই প্রথম কেশমুণ্ডন করে পীতবস্ত্র ধারণ করেন। বুদ্ধদেব তখন কপিলাবস্তুর নিগ্রোধরামে ছিলেন। গৌতমী তাঁকে দর্শন করতে গিয়ে তাঁর সামনে প্রণিপাত হ'য়ে বললেন, "প্রভু, নারীদেরও যদি গৃহধর্ম ত্যাগ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে তথাগতের শরণ নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তবে ভালো হয়।" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "থাক গৌতমী, দয়া করে তুমি নারীদের এমন অধিকার দেওয়ার কথা বলো না।" গৌতমী তারপরও আরো দুবার এই অনুরোধ জানালেন, কিন্তু বুদ্ধদেব নিজমতে অটল থেকে একই উত্তর দিলেন। তখন গৌতমী দুঃখিত মনে অশ্রুপাত করতে করতে তাঁর সম্মুখ থেকে চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালীর দিকে যাত্রা করলেন। বৈশালীতে এসে তিনি মহাবন কুটাগার গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। গৌতমীও বৈশালীতে এলেন। বুদ্ধশিষ্য আনন্দ তাঁকে বুদ্ধের গৃহদ্বারে অপেক্ষা করতে দেখতে পেলেন। তিনি গৌতমীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তিনি "স্ফীত-পদে ধূলিধূসর অবস্থায়" এসে "করুণভাবে অশ্রুপাত" করছেন। গৌতমী জানালেন, তথাগত নারীদের শ্রমণী হ'তে অনুমতি দান করেননি। তখন আনন্দ তথাগতের সমীপে গিয়ে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর বার্তা জানিয়ে বললেন, "প্রভু, গৌতমী যেমন প্রার্থনা করছেন, সেই রকম অনুমতি নারীদের দেওয়া হলে ভালোই হত।" বুদ্ধদেব তখন বললেন, "থাক আনন্দ, দয়া করে তুমি নারীদের এমন অধিকার দেওয়ার কথা বলো না।" আনন্দ আরো দু'বার এই অনুরোধ জানালেন, কিন্তু একই উত্তর পেলেন। পরে আনন্দ অন্যভাবে বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করলেন, "প্রভু, নারীগণ যদি গৃহসংসার ত্যাগ ক'রে তথাগতের মত ও পথ গ্রহণ ক'রে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, তবুও কি তারা আলোচনার অধিকার বা দ্বিতীয় কি

তৃতীয় মার্গ কিংবা অর্হৎ হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে না?" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "তা পারে, আনন্দ" তখন আনন্দ বললেন, "প্রভু, তা যদি পারে তবে বলি—মহাপ্রজাবতী গৌতমী তথাগতের বহু সেবা যত্ন করেছেন। মাতৃস্বসা ও ধাত্রীরূপে তিনি তাঁকে দুধপান করিয়েছেন এবং তথাগতের মাতৃবিয়োগের পর তাঁকে নিজের স্তন্যদান করেছেন। প্রভু, গৃহসংসার ত্যাগ ক'রে তথাগতের মত ও পথ গ্রহণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করার অনুমতি নারীদের দিলেই বোধহয় ভালো হত।"

বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "তাহলে আনন্দ, মহাপ্রজাবতী গৌতমী যদি আটটি অনুশাসন গ্রহণ করেন, তবে সেই হোক তাঁর দীক্ষা।"

আটটি অনুশাসন

এই আটটি অনুশাসন হল:—

(১) কোনো শ্রমণী শতবর্ষীয়া হলেও নবীনতম শ্রমণকেও প্রণিপাত জানাবে। (এই অনুশাসন মানতে গৌতমী প্রথমে অস্বীকার করেন, কিন্তু তথাগতের ইচ্ছানুসারে এটি তাঁকে মেনে নিতে হয়।)

(২) শ্রমণীগণ কখনোই এমন স্থানে বর্ষাকালে থাকবে না, যেখানে কোনো শ্রমণ নেই।

(৩) বর্ষাকাল শেষ হলে নিজের দৃষ্ট, শ্রুত বা সম্ভাব্য সমস্ত দোষের জন্যে শ্রমণীরা শ্রমণ সংঘ ও শ্রমণীসংঘের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

(৪) শ্রমণীগণ 'উপসৎ' ও 'ও বাদে'র পূর্বে শ্রমণদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

(৫) গুরুতর অপরাধের জন্যে শ্রমণীগণ উভয় সংঘারামের কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

(৬) দুই বৎসর কাল "ছয়টি নীতি" তে শিক্ষা লাভ করার পর শ্রমণীগণ "উপসম্পদা"র পূর্বে উভয় সংঘারাম থেকেই অনুমতি গ্রহণ করবে।

(৭) শ্রমণীগণ কোনো শ্রমণকে তিরস্কার করবে না, কিন্তু শ্রমণগণ শ্রমণীদের তিরস্কার করতে পারবে।

(৮) শ্রমণীগণ কোনো শ্রমণকে কটুবাক্য বা নিন্দাবাদ করতে পারবে না।[১]

শ্রমণীসংঘের আরো কতকগুলি অনুশাসন ছিল যা তাদের মেনে চলতে হত,

[১] "উইমেন ইন বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার"—ডঃ বি, সি, লাহা। ৮০-৮১ পৃষ্ঠা।

অনুশাসনগুলির ধরণ থেকেই বোঝা যায় সেগুলি খুব কঠোর ছিল। ব্রহ্মচর্য, তপশ্চর্যা, কঠোর মানসিক ও আত্মিক শৃংখলা রক্ষা করাই ছিল অনুশাসনগুলির উদ্দেশ্য। অবশ্য এই বিধিনিষেধগুলি শিক্ষার্থিনী শ্রমণীদের জন্যেই বিশেষ-ভাবে প্রণীত হ'য়েছিল।

স্বভাবতই শ্রমণ ও শ্রমণীদের এই দুটি সংঘারামের অস্তিত্ব বুদ্ধদেবের খুবই চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠেছিল। সেইজন্যেই শ্রমণীদের ক্ষেত্রে অনুশাসনগুলি তিনি এত কঠোর ক'রে প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু এই অনুশাসনগুলির ফলে শ্রমণী-গণ শ্রমণদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। তার ফলে তাদের পক্ষে শ্রমণদের সঙ্গে মেলামেশা করা আবশ্যিক হ'য়ে ওঠে এবং পরিণামে এইটেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করে ফেলে। কালক্রমে শ্রমণ ও শ্রমণীদের সংঘারাম ভারতবর্ষে লোপ পেয়ে যায়। পঞ্চম খৃীষ্টাব্দ থেকে নারীদের আর শ্রমণ হওয়ার অধিকার দেওয়া হত না।

জৈনধর্ম

মহাবীর ছিলেন উদারপন্থী। তিনি নারীদের সংঘে গ্রহণ করতে কোনো দ্বিধা বোধ করেননি। তাঁর অনুগামীগণ চার ভাগে বিভক্ত ছিলেন—সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনী, সাধারণ পুরুষ ও সাধারণ নারী।

জৈনধর্ম দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। দিগম্বর পন্থীগণ মনে করেন নারীগণ মুক্তিলাভ করতে পারেন না। সেজন্যে নারীদের তাঁরা তাঁদের সংঘে গ্রহণ করেন না। কিন্তু শ্বেতাম্বর পন্থীগণ নারী ও পুরুষদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না এবং স্বচ্ছন্দে পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও তাঁদের সংঘে গ্রহণ করেন। মহাবীরের সময়ে জৈন সন্ন্যাসীর সংখ্যা ছিল চৌদ্দ হাজার কিন্তু সংসারত্যাগী নারী সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ছিল ছত্রিশ হাজার। মহাবীরের খুল্লতাতপুত্রী (কেউ কেউ বলে পিতৃস্বসা) চন্দনা ছিলেন সন্ন্যাসিনী-মঠের অধিকর্ত্রী। এই সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে পৌমাবঈয়ের মতো রাণী এবং বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। সকলেই এ'দের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধর্মসাধিকাগণ

১। বৌদ্ধধর্মের ধর্মসাধিকাগণ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগ খুবই গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। এ সময়ে বিদেশেও যেমন ধর্মপ্রচারে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, মাতৃভূমিতেও সেই-রকম জীবন ও চিন্তাধারার প্রসারলাভ ঘটেছিল। কয়েকজন উচ্চমনা মহীয়সী নারীর নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ভাস্বর হ'য়ে আছে এই যুগের ইতিহাসে। বুদ্ধদেবের জীবন ও উপদেশ থেকে প্রেরণালাভ ক'রে এদের কয়েকজন গৃহসংসার ত্যাগ ক'রে নবগঠিত শ্রমণীসংঘে যোগদান করেন। এই শ্রমণীসংঘ ছিল তখন সারা পৃথিবীর ইতিহাসেই নতুন ঘটনা। এইসব ভিক্ষুণীগণ তাঁদের গুরুভ্রাতা ভিক্ষুদের মতোই আশ্রমে বাস করতেন এবং দেশে দেশে জনসাধারণের মধ্যে সত্য ও জ্ঞানের আলো বিতরণ ক'রে পরিব্রাজিকা-রূপে ভ্রমণ করতেন।

নিজের বিশ্বাস ও ভক্তিকে গভীরতর করাই অন্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব ত্বরান্বিত করার সহজতম পথ। সেই কারণে যেখানে তাঁরা যেতেন, সেখানেই এইসব ভিক্ষুণীগণ তাঁদের আদর্শনিষ্ঠা ও পবিত্রতার জন্যে সকলের মনে গভীর-ভাবে রেখাপাত করতেন। বহুলোকের মনে তাঁদের আবেদনে সাড়া জেগেছিল এবং বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথের আহ্বান জনগণের হৃদয় জয় ক'রে উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গের মতো সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গোপা

বৌদ্ধনারীগণের মধ্যে তথাগতের পত্নী গোপার স্থানই সর্বাগ্রে। যখন রাজ-কুমার সিদ্ধার্থ গভীর রাত্রে সপুত্র ঘুমন্ত গোপাকে ত্যাগ করে চলে যান, তখন গোপা অত্যন্ত ব্যথা পেলেও তাঁর বিয়োগযন্ত্রণার জন্যে কোনো হাহুতাশ করেননি, তাঁকে ত্যাগ ক'রে যাওয়ার জন্যে কুমারকে কোনো দোষারোপও করেননি। জগতের দুঃখের জন্যে করুণা ও প্রেমে রক্তাক্ত সেই হৃদয়ের মহত্ত্ব তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। রাজপ্রাসাদের বিলাস-ব্যসনে পরিবৃত হয়েও তিনি এরপর থেকে শুদ্ধাচারী জীবন যাপন করতে লাগলেন। এটা তাঁর স্বামীর অরণ্যবাসী-তপস্বীর জীবনের চাইতে কম কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার ছিল না।

যেদিন বুদ্ধ বোধি-লাভের পর তাঁর পিতৃ-আবাসে ফিরে এসেছিলেন, কপিলা-বস্তু নগরের অধিবাসীগণের সেদিন আনন্দের আর সীমা ছিল না। কিন্তু তিনি

এলেন, রাজকুমার বেশে নয়, মুণ্ডিতমস্তক নগ্নপদে—মানুষের সেবক, শিক্ষক ও ত্রাতা হিসাবে।

পতিবিরহের দীর্ঘ ও নিঃসঙ্গ বৎসরগুলিতে গোপা স্বামীর চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন যে বুদ্ধদেবের কাছে ত্যাগের মনোভাব যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসেছিল তাঁর কাছেও তেমনি সহজেই এল। বুদ্ধদেব রাজধানীতে ফিরে এলে গোপা তাঁকে সপ্রেম অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তাঁর মহামূল্য উপঢৌকন একমাত্র পুত্র রাহুলকে দান করলেন। তিনি রাহুলকে তার পিতার কাছে গিয়ে পিতৃধন চাইতে বললেন। কিন্তু রাহুল পিতৃহীন ভাবেই বেড়ে উঠেছিল। তাই সে বলল, "মা, পিতাকে চিনব কী করে?" সগর্বে তার মাতা উত্তর দিলেন, "বাছা, মানুষের মধ্যে যিনি সিংহের মতো তিনিই তোমার পিতা।" কিশোর বালক রাহুল তখন, যে-পিতাকে কখনো সে দেখেনি, সোজা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে অকুতোভয়ে নিজের প্রার্থনার কথা বারবার করে জানাতে লাগল। অবশেষে তার প্রার্থনায় বিচলিত হ'য়ে বুদ্ধদেব তাঁর প্রধানশিষ্য আনন্দকে বললেন যাতে রাহুলকে ভিক্ষাপাত্র ও পীতবস্ত্র দেওয়া হয়। গোপার দিক থেকে এইটেই ছিল সর্বশেষ এবং মহত্তম আত্মত্যাগ। শতদুঃখের মধ্যেও আনন্দ ও শান্তির প্রতিমা এই রাজমাতা এক নবযুগের জাতীয় জাগরণের ঊষায় দাঁড়িয়ে যেন যাঁরা তাঁর স্বামীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে তাদের জন্যে আশীর্বাদ রেখে গেলেন। আর জনসাধারণও তাদের অন্তরের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে তাঁর নতুন নাম দিল যশোধারা—অর্থাৎ গৌরবের প্রতিমা। আজও তিনি সেই নামেই অভিহিত হন।

স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের কথা প্রায়ই উল্লেখ করতেন।[১] তিনি একবার বলেছিলেন, "বুদ্ধদেবের সবথেকে একজন বড় শিষ্য ছিলেন তাঁর পত্নী। তিনি ভারতবর্ষে নারীদের মধ্যে বৌদ্ধ-আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন।"

অবশ্য মতান্তরে বলা হয়, বুদ্ধদেবের বিমাতা গৌতমীই বৌদ্ধ শ্রমণীদের সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত করেন।

গৌতমী (মহাপ্রজাবতী)

বুদ্ধদেবের জননী মায়া দেবীর গৌতমী নামে এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। তাঁরও বিবাহ হ'য়েছিল রাজা শুদ্ধোধনের সঙ্গে। সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন

---

১ স্বামী বিবেকানন্দ—"কম্‌প্লিট ওয়ার্কস," ভলিয়ুম ৭, পৃঃ ৭৬।

পরে মায়া দেবী যখন দেহত্যাগ করলেন গৌতমী তখন অত্যন্তই শোকাহত হ'য়েছিলেন। রাজাও পুত্রের লালনপালনের কী ব্যবস্থা হবে এই ভেবে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে কয়েকদিন পরে গৌতমীরও একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করল। কিন্তু স্বর্গগতা জ্যেষ্ঠার ঐ মাতৃহীন পুত্রের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এত বেশী হ'য়েছিল, এবং এতই ছিল তাঁর পতির প্রতি কর্তব্যবোধ যে নিজের পুত্রকে তিনি ধাত্রীর হাতে দিয়ে মাতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ তিনি উজাড় করে দিয়েছিলেন ভগিনীপুত্রের উপর। সিদ্ধার্থও গৌতমীকে নিজের মায়ের মতোই ভালোবাসতেন। যদিও একথা অস্বীকার করা যায় না যে বাল্যকালেও রাজকুমারের নিশ্চয় ভবিষ্যৎ বুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত জন্মগত অনেক গুণ ছিল, তবু এটাও সন্দেহ করা যাবে না যে তাঁর অনেক সদ্‌গুণ গৌতমীর প্রভাবেও বিকাশ লাভ করেছিল। গৌতমীও বুদ্ধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন এবং উপযুক্ত সময় এলে শাক্যবংশের পাঁচশত নারী সঙ্গে নিয়ে তিনি বুদ্ধের কাছে গিয়ে ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অতি উচ্চ পর্যায়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে আজীবন ঐ নতুন ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। "থেরীগাথা"য় তিনি বুদ্ধদেবকে সম্বোধন করে লিখেছেন, "হে সুগত, যখন তুমি শিশু ছিলে তখন তোমাকে দেখে, তোমার আধো আধো কথা শুনে আমি দৃষ্টি আর শ্রবণের আনন্দ লাভ করতাম। কিন্তু এখন তোমার জ্ঞানের কথা শুনে আমার হৃদয় যেমন আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না।"

এই কথাগুলিতে বোঝা যায়, গৌতমী যে কেবল বুদ্ধদেবের একজন অনুরক্ত শিষ্যা ছিলেন তাই নয়, শেষ পর্যন্তও তিনি বুদ্ধদেবকে স্নেহময়ী মাতার দৃষ্টিতেই দেখতেন। গৌতমী নামে আরো একজন বুদ্ধশিষ্যা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পার্থক্যের জন্যে বুদ্ধজননীকে মহাপ্রজাবতী বলে ডাকা হত।

কিসা গৌতমী

অন্য গৌতমী দরিদ্র পিতামাতার সন্তান ছিলেন। তাঁর স্বামীর আত্মীয়গণ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত তাঁর সঙ্গে। সেইজন্যে, শীর্ণ ও মলিন ছিলেন বলে তিনি কিসা গৌতমী নামে পরিচিতা হ'য়েছিলেন। 'কিসা' একটি পালি শব্দ, সংস্কৃত 'কৃশা' শব্দ থেকে উৎপন্ন। যাই হোক, একটি পুত্রের জন্মদানের পর অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটল। তাঁর ক্ষুধিত হৃদয়ের যতো কিছু স্নেহ ভালোবাসা সবই পুত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হ'তে থাকল। ভবিষ্যতের নতুন আশায়

পূর্ণ হ'য়ে উঠলেন তিনি। এর পর থেকে তিনি শিশুটির জন্যেই জীবন ধারণ করতে লাগলেন। কিন্তু হায়, তাঁর সুখের দিন ছিল খুবই স্বল্প স্থায়ী। একদিন বাগানে খেলার সময় বালকটি বিষধর সাপের দ্বারা আহত হল। তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটল। গোতমী শোকে প্রায় উন্মাদ হ'য়ে উঠলেন। বালকটির মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধ'রে তিনি কোনো ঔষধের আশায় পাগলিনীর মতো ছুটোছুটি করতে লাগলেন। সেইসময় সশিষ্য বুদ্ধ সেই পথ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তাঁর সৌম্য শান্ত করুণাঘন মুখমণ্ডল দেখে গোতমীর মনে আশা জাগল। তিনি পুত্রের মৃতদেহ তাঁর পদতলে রেখে নতজানু হ'য়ে সাশ্রুনয়নে বললেন, "এই পুত্রটি না পেলে জগৎ আমার চোখে অন্ধকার। এর জীবনদান ক'রে আমার আঁধার ঘরে আলো ফিরিয়ে দিন।" বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন, "কল্যাণী, এক তোলা সর্ষপ নিয়ে এস, আমি তোমার পুত্রের মৃতদেহে প্রাণ এনে দেবে। কিন্তু মনে রেখ, ঐ সর্ষপ এমন গৃহ থেকে আনতে হবে যেখানে মৃত্যু কখনো তার ছায়া ফেলেনি।" তথাগতের বাক্যের গভীরতর অর্থ শোকাহতা সরলমনা গোতমী বুঝতে পারলেন না। তিনি একমুঠো সর্ষে চেয়ে ঘরে ঘরে ঘুরলেন, কিন্তু ঘরে ঘরেই মৃত্যু তার ছায়া ফেলে গেছে, এবং এমন একটি পরিবারও তিনি পেলেন না যেখানে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটেনি। আশাহত এবং বিফল মনে তিনি বুদ্ধের কাছে এসে জানালেন, সর্ষে যদিও বহু পরিবারই তাঁকে দিতে রাজি হ'য়েছিল, তবু বুদ্ধদেবের শর্তানুসারে এমন গৃহ তিনি পাননি যেখানে কখনো কারো মৃত্যু ঘটেনি। তখন বুদ্ধদেব স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, "কল্যাণী, জন্ম আর মৃত্যু, সংসারের অমোঘ নিয়ম। তুমি নিজেই দেখলে এ দুঃখ কেবল তোমারই একার নয়।" তথাগতের বাক্য গোতমীর আহত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপের মতো কার্যকরী হল। হতাশার স্থানে এল অনাসক্তি, এবং যে প্রবল বেদনায় তাঁর হৃদয় মুহ্যমান হ'য়ে উঠছিল তার স্থলে দেখা দিল শান্ত বৈরাগ্য ভাব। তিনি পুত্রের শেষকৃত্য ক'রে বুদ্ধের বাক্যে জীবন সম্বন্ধে যে নতুন চেতনা লাভ করেছিলেন তারই ফলে বুদ্ধের শরণ নিয়ে ঘরসংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হন। তারপর কালক্রমে তিনি বোধিপ্রাপ্ত হ'য়ে অর্হত্ব লাভ করেন।

ধর্মগুরুগণ সকলেই একথা বারবার ঘোষণা করেছেন যে বাইরের পরিবেশ থেকে স্থায়ী শান্তির আশা করা মূর্খতা। বহির্বিশ্ব বড় জোর আমাদের উপাদান সংগ্রহ ক'রে দিতে পারে, তাকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে গড়ে নিতে পারি। আর এ ব্যাপারে বাইরের চাপে ভেঙে পড়লে হবে না, সেই চাপকে অতিক্রম ক'রে যাওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই। গোতমীর এই কাহিনী অত্যন্তই

সরল এবং জীবনের মতো সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর হৃদয়ে যদি মহৎ উদ্দেশ্য জাগ্রত না হত তবে এর বর্ণনা নিশ্চয়ই অবান্তর হত। তাঁর উপদেশাবলীও "থেরী-গাথায়" লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছে। তাঁর জীবন এরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে, আধ্যাত্মিক জীবনের ফলেই স্থায়ী শান্তি লাভ করা সম্ভব হয়। এরই প্রসাদে সত্য-সন্ধানী ব্যক্তি মায়াময় নশ্বর সংসারের অপরিহার্য অবদান সুখদুঃখের সীমাকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, পবিত্র ধর্মজীবনের সম্বন্ধে যে রকম ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার উপরও এই কাহিনী যথেষ্ট আলোকপাত করে। সাধারণ মানুষের কাছে দৈহিক জীবনই একমাত্র বাস্তব সত্তা। তারা পীড়িত ব্যক্তির নিরাময় এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভকেই মানবজাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলে মনে করে। কিন্তু, বিশ্বজগতে প্রেম ও করুণার প্রতিমূর্তিরূপে পূজিত হলেও বুদ্ধদেব দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে কিংবা অন্য কখনো কোনো ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা ব্যবহার করেননি, অথবা আশ্চর্য রোগনিরাময়ে আত্মনিয়োগ করেননি। বরং দৈবানুগ্রহে আশ্চর্য ঘটনার সংঘটনকে তিনি সত্যের পথে বৃহত্তম বাধা বলে মনে করতেন। একবার তাঁর শিষ্যগণ তাকে এমন একজন ব্যক্তির কথা বলেছিল যে একটি পাত্রকে অনেক উঁচু থেকে হাতে না স্পর্শ করেই গ্রহণ করতে পেরেছিল। বুদ্ধদেব পাত্রটি গ্রহণ ক'রে নিজের পদতলে দলিত করে শিষ্যদের বলেছিলেন, তাঁরা যেন কোনো আশ্চর্য ঘটনার উপর তাঁদের বিশ্বাসকে গড়ে না তোলেন। তিনি যা কিছু করতেন তার মধ্যেই থাকত একটি সুগভীর মানবিক আবেদন। একটি ছাগলশিশুকে রক্ষার জন্যে তিনি যে তাঁর নিজের জীবন দান করতে চেয়েছিলেন তাতেও এই মানবিক আবেদনই প্রত্যক্ষ করা যায়। সেইজন্যেই আমরা দেখতে পাই, তাঁর অনুগামীদের জীবনেও কোনো অতীন্দ্রিয় ঘটনার প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি। এইখানেই ছিল তাঁদের শক্তির উৎস এবং বৃহত্তম আবেদন।

সুপ্রিয়া

সুপ্রিয়া ছিলেন শ্রাবস্তী নগরীর বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী অনাদপিণ্ডদের কন্যা। তাঁর স্নেহময় পিতামাতা তাঁকে অজস্র বিলাসের মধ্যে মানুষ করেন। তাঁর চরিত্রগঠন ও শিক্ষার জন্যে পিতামাতার স্নেহ ও ঐকান্তিকতার কোনো পরিসীমা ছিল না। কথিত আছে যে সুপ্রিয়া এক আশ্চর্য মনঃশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাতিস্মর—অতি শৈশবেই তিনি পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারতেন এবং

পূর্বজন্মের অনেক ঘটনা তিনি বিবৃত করতে পারতেন। বুদ্ধদেবের মাতৃস্বসা এবং পালিকা-মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী সাত বৎসর বয়সেই তাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাদান করেন। সুপ্রিয়া প্রাজ্ঞতা এবং অধ্যাত্মজ্ঞানের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি যে একাকী নির্জনবাসে কালাতিপাত করতেন তা নয়। প্রার্থনা ও ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সময় ক'রে রোগীর পরিচর্যা এবং দরিদ্র ও নিঃসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন। তাঁর বালিকা বয়সের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনায় তাঁর নৈতিক সাহস ও চরিত্রবলের বিষয়ে আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

একদা যখন প্রভু বুদ্ধ জেতবন বিহারে বাস করছিলেন সেই সময়ে সৌভাগ্য-শালী শ্রাবস্তী নগরে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্যাভাবে নরনারী কঙ্কালসার হ'য়ে উঠল এবং রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়তে লাগল। মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্যে কত মনুষ্যজীবন অকালে ঝ'রে পড়ল, পিছনে পড়ে রইল ভগ্নহৃদয়ের হাহাকার ও ছন্নছাড়া সংসার। শ্রাবস্তী নগরে যে খাদ্যক্রয়ের জন্যে যথেষ্ট ধন-সম্পদ ছিল না তা নয়, সহজেই সেভাবে এই দারুণ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত। কিন্তু যাঁরা খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারতেন সেই ধনী নাগরিক-দের হৃদয় স্বার্থপরতা ও লোভে পাথর হ'য়ে গিয়েছিল। স্বদেশবাসীদের দুঃখে অবিচলিত এই সব ব্যক্তি দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের দুর্দশার দিকেও দৃষ্টিপাত করেননি, তাদের দরিদ্রপল্লীর মর্মন্তুদ হাহাকারও কানে তোলেন নি। বরং, পাছে দরিদ্র লোকেরা বুভুক্ষা ও দুর্ভিক্ষে মরীয়া হ'য়ে আইনভঙ্গ করে এবং এইভাবে তাদের ভাগ্যবান প্রতিবেশীদের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন করে তোলে এই ভয়ে তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থাকেই দৃঢ়তর করে তুলতে লাগলেন।

একদিন একটি মরণাপন্ন শিশুকে শ্রমণবিহারের সদর দরজায় পড়ে থাকতে দেখা গেল। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দ তার করুণ অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে প্রভু তথাগতের কাছে গিয়ে বললেন, "চারিদিকে লোকেরা অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। বর্তমান অবস্থায় আমাদের সংঘের কর্তব্য কী?" সেইসময়ে শ্রাবস্তী নগরের বহু ধনী ব্যক্তি বুদ্ধদেবের বাণী শোনার জন্যে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁদের আহ্বান করে বললেন, "সমাগত সকল ভদ্রব্যক্তিই ধনী ও ক্ষমতাশালী। তোমরা যদি চাও তবে সহজেই তোমরা এইসব লোকদের সাহায্য ক'রে মৃত্যুর মহামারীকে বন্ধ করতে পার।" তথাগতের এই কথা শুনে সকলেই কোনো না কোনো কৈফিয়ৎ দিতে লাগলেন। কেউ বললেন, "আমাদের শস্যভাণ্ডার একেবারে শূন্য।" অন্য কেউ বললেন, "শ্রাবস্তী একটি বৃহৎ নগরী,

জনসংখ্যাও যথেষ্ট। সকলের খাদ্য সংস্থান করা অসম্ভব ব্যাপার।” বুদ্ধের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য অনাথপিন্ডদ সে সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রভু তথাগত চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন, “এমন মানুষ কি কেউই এখানে উপস্থিত নেই যে তাঁর ভ্রাতাদের এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে পারে?” কেউই উত্তর দিল না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত দারুণ নিস্তব্ধতার পর একটি তরুণী নারী নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নির্ভীক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, “প্রভু, আপনার সেবিকা আপনার আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত আছে। মানুষকে সেবা করতে পারা এক পরম সৌভাগ্য, তাতে যদি নিজের জীবনও যায় তাতে ক্ষতি নেই।” বলাবাহুল্য ঐ তরুণীটি বর্তমান কাহিনীর নায়িকা সুপ্রিয়া ছাড়া অন্য কেউ নয়। শ্রোতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কিন্তু তাঁরা মনে করলেন, সুপ্রিয়া বয়সোচিত দায়িত্বজ্ঞান হীনতার বশেই না ভেবেচিন্তে এমন কথা বলেছেন। প্রভু তথাগত তাঁর কথা শুনে স্মিত হাসি হেসে প্রশ্ন করলেন, “বৎসে, কী উপায়ে তুমি এই বিশাল জনসমষ্টির উদর পূর্ণ করবে?” সুপ্রিয়া উত্তর দিলেন, “প্রভু, আপনার করুণায় আমার ভিক্ষাপাত্র কখনো শূন্য থাকবে না। এই ভিক্ষাপাত্রই ক্ষুধিতকে অন্ন দেবে, মুমূর্ষুকে প্রাণ দেবে; শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষও বিদূরিত হবে এরই কল্যাণে।”

আনন্দের হৃদয় সুপ্রিয়ার অমৃতময়ী মিষ্ট বাণীতে আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তিনি বালিকাকে আশীর্বাদ করে বললেন, “হে মাতৃরূপী কন্যা, প্রভু অমিতাভ যেন তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন।” বুদ্ধদেবও তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। তারপর সেদিনের মতো সভার কাজ শেষ হল।

অনাথপিন্ডদের কন্যা এবং মহাপ্রজাবতী গৌতমীর প্রিয় শিষ্যা সুপ্রিয়া শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষ দূর করার ব্রত গ্রহণ করেছেন এই সংবাদ সারা নগরীতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এক বিরাট উদ্দীপনার বন্যায় নাগরিকদের হৃদয় দ্রব হ'য়ে উঠল। একবাক্যে তারা বলে উঠল, “সুপ্রিয়ার ভিক্ষাপাত্র কখনো শূন্য থাকবে না।” ঘরে ঘরে সুপ্রিয়া খাদ্যভিক্ষা করে ভ্রমণ করতে লাগলেন। তাঁর মানবপ্রীতিতে সকলের হৃদয়েই আগে সাড়া জেগেছিল। নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। উষা-সমাগমে যেমন রাত্রির বিভীষিকা কেটে যায় তেমনি সুপ্রিয়ার ভাস্বর ব্যক্তিত্বে প্রত্যেক হৃদয়েই আস্থা ও আশা জাগিয়ে তুলল। এইভাবে শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হ'য়ে গেল। এবং এই একটিমাত্র কর্ম সমাধা করেই সুপ্রিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রইলেন।

পটাচারা শ্রাবস্তী নগরের এক শ্রেষ্ঠীবংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের বয়স হলে তাঁর পিতামাতা নিজেদের শ্রেণীর মধ্যেই একজন প্রিয়দর্শন চরিত্রবান যুবকের সঙ্গে বিবাহ স্থির করেন; কিন্তু পটাচারা তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন না। নিজের পছন্দ মতো অন্য এক যুবককে বিবাহ করলেন তিনি। তাঁর পিতামাতা এজন্যে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। পটাচারা পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বাস করতে চলে গেলেন।

বহুবৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। দুইটি পুত্রের জন্মের পর পিতামাতাকে দেখবার জন্যে পটাচারার আবার খুব ইচ্ছা হল। তিনি স্বামীর সঙ্গে ছেলে দুটিকে নিয়ে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করলেন। পথে এক অরণ্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর স্বামীকে সাপে কামড়াল। কাছাকাছি কোনো সাহায্যই পাওয়া গেল না, ফলে বেচারী সেখানেই মারা গেল। এই অভাবিত শোক প্রাণপণে সহ্য করে করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে পটাচারা পথ চলতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখনো তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলছিল। যখন তাঁর ছেলেদুটি এক গাছের ছায়ায় ঘুমাচ্ছিল, সেইসময় এক বুনো পাখি এসে ছোটটিকে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। একটি ঝরনা পার হওয়ার সময় তাঁর বড় ছেলেটিও জলের তোড়ে ভেসে চলে গেল। দুঃখের পাত্র এইভাবে কানায় কানায় পূর্ণ হ'য়ে উঠল। তাঁর ছোট সংসারের সকলকেই একে একে হারিয়ে পটাচারা শোকে উন্মাদপ্রায় অবস্থায় কী করবেন ভেবে না পেয়ে আচ্ছন্নের মতো পথ চলতে লাগলেন। তাঁর হৃদয় এতই ভারাক্রান্ত এবং মন এত উদ্‌ভ্রান্ত ছিল যে কোন্ দিকে তিনি যাচ্ছেন তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। এই চরম দুঃখের সময়ে শেষ আশা তাঁর যা ছিল তা হচ্ছে পিতামাতার সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা। কিন্তু ঈশ্বর যাঁদের অনুগ্রহ করেন তাঁদের বোধহয় সংসারের সবরকম আশা আসক্তি ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের উপরই একমাত্র নির্ভর করতে শিখতে হয়। আর সম্ভবত এই জ্ঞান লাভ করার জন্যেই পটাচারার ভাগ্যে আরো কিছু হতাশা জমা ছিল।

ইতিমধ্যে তিনি শ্রাবস্তীর কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। কিন্তু নগরে ঢুকে তিনি বাল্যকালের সেই পরিচিত গৃহ আর দেখতে পেলেন না। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন তাঁর অনুপস্থিতির সময় পিতৃগৃহের ছাদ ধ্বসে প'ড়ে তাঁর পিতামাতা দুজনেই জঞ্জালের নিচে জীবন্ত সমাধি লাভ করেছেন। এই শেষ আঘাতে তাঁর সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে তিনি

সারা নগরীতে ঘুরে ঘুরে পথের প্রত্যেককে নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলেন।

ভগবান বুদ্ধ সেইসময় শ্রাবস্তী নগরীতে ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পটাচারা তাঁর কাছে গিয়ে পদতলে পড়ে তাঁর আত্মীয়-পরিজন সকলের মৃত্যুর কথা বললেন। বুদ্ধদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সংসারের এই জীবন সর্বদাই নশ্বর। তাঁর কথায় পটাচারার মন অনেক শান্ত হ'য়ে এল। তিনি সঙ্ঘের শরণ নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হলেন। এরপর থেকে তিনি মানুষের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি এই নতুন সদ্ধর্মের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, লোকসাধারণকে ধর্মের অষ্টমার্গ অনুসরণের জন্যে উদ্বুদ্ধ করতেন। জীবনব্যাপী সাধনায় তিনি এমন আত্মিক শক্তির অধিকারিণী হ'য়েছিলেন যে তিনি সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে শান্তি দিতে পারতেন। 'পিটক' গ্রন্থে কথিত আছে যে একবার পাঁচশত নারীর এক সমাবেশে ভাষণদানের সময় পটাচারার বাণী তাঁদের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তাঁরা সকলেই বুদ্ধের শরণ নিয়ে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। কেবল সাধারণ্যে ভাষণ দিয়েই এতগুলি হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করার ঘটনা ইতিহাসে অতি বিরল, এবং এবিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে তাঁর নিজের জীবন ও চরিত্রবলই তাঁর বাণীতে শক্তি ও বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত করে তুলেছিল। আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা অতি সাধারণ নগণ্য অস্তিত্ব থেকে নিজের জীবনের উৎকর্ষ ঘটিয়ে অধ্যাত্ম আনন্দ ও স্থায়ী শান্তি লাভের বিরল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পটাচারার কাহিনীতে। আর এই ভাবেই তিনি অন্যদেরও সৎ ও মহৎ জীবন যাপনে উৎসাহিত করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন।

অম্বপালী

বৈশালী নগরীতে অম্বপালী নামে একজন রূপবতী গণিকা বাস করতেন। তিনি যথেষ্ট ধনশালিনী নারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পত্তির মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিল নগরের উপকণ্ঠে এক বৃহৎ 'আম্রবন'।

প্রব্রজ্যার সময় সশিষ্য প্রভু বুদ্ধ একবার এই পথে গমন করছিলেন। উদ্যানটির স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশ তাঁকে আকর্ষণ করে, এবং বাসের পক্ষে উত্তম-স্থান বিবেচনা ক'রে তিনি সেই উদ্যানের ছায়াময় আম্রবৃক্ষতলে কিছুদিনের জন্যে অবস্থান করবেন বলে স্থির করেন। তাঁর আগমনের বার্তা শুনে অম্বপালী সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁর সাজসজ্জা ও অলঙ্কার সাধারণ হলেও তাঁর রূপ ছিল অসাধারণ। দূর থেকে তাঁকে আসতে দেখে বুদ্ধদেব মনে মনে

বিবেচনা করলেন, "ভুবনবিজয়ী রূপ থাকা সত্ত্বেও এই নারী সৌম্যদর্শন ও দৃঢ়চেতা। এমন চরিত্রের নারী সংসারে খুঁজে পাওয়া কঠিন।"

প্রভুর সামনে প্রণিপাত ক'রে অম্বপালী শ্রদ্ধাভরে তাঁর কাছে বসলেন। তাঁর বিশ্বাসের গভীরতা দেখে বুদ্ধদেব তাঁকে ধর্মশিক্ষা দিলেন। তাঁর মঙ্গলময় দৃষ্টিতে অম্বপালীর ঐহিক বাসনা সমস্ত বিদূরিত হ'য়ে গেল। তাঁর হৃদয় পবিত্র হ'য়ে উঠল, প্রভুর বাণীতে বিশ্বাসও হল দৃঢ়তর। তিনি তখন বিনয় বচনে প্রভুকে বললেন, "প্রভু, আমাকে এই আশীর্বাদ করুন যেন আগামী কাল সশিষ্য আপনাকে কিছু ভিক্ষা দান করতে পারি।" তথাগত নীরবে তাঁর সম্মতি জানালেন। অনতিবিলম্বে কয়েকজন ধনী শ্রেষ্ঠীযুবক মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হ'য়ে রথে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং প্রভু বুদ্ধকে পরদিন তাঁদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব আগেই অম্বপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, কাজেই তিনি যুবকদের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। যুবকেরা অম্বপালীর আমন্ত্রণকে নাকচ করে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। তাঁরা প্রভুকে মূল্যবান মণিমুক্তা উপহার দেওয়ারও প্রস্তাব করলেন। কিন্তু যিনি নিজের রাজ্য ত্যাগ ক'রে এসেছেন সেই প্রভু তথাগতকে ঐহিক সম্পদে প্রলুব্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই অম্বপালীর আমন্ত্রণই অটল রইল।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী পরদিন বুদ্ধদেব সশিষ্য অম্বপালীর গৃহে দর্শন দিলেন। প্রশস্ত আঙিনায় সুন্দর উদ্যানের মধ্যে বিশাল আবাসগৃহ ছিল অম্বপালীর। সেই মনোরম গৃহ রাজপ্রাসাদকেও হার মানাত তার বিলাস-সজ্জায়। প্রভু তথাগতের অভ্যর্থনার জন্যে গৃহ এবং উদ্যান কতোভাবেই না সুসজ্জিত করা হ'য়েছিল, আর কতো রকম খাদ্যই না প্রস্তুত করা হ'য়েছিল প্রভুর প্রীতির জন্যে। বুদ্ধদেব এবং তাঁর শিষ্যগণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই খাদ্য গ্রহণ করার পর, অম্বপালী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রভুকে নিবেদন করলেন, "হে প্রভু, এই গৃহ এবং এই উদ্যান, আমার পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তা, আমার অন্য যা কিছু আছে সবই 'সঙ্ঘে'র চরণে উৎসর্গ করলাম আমি। এই সামান্য দান গ্রহণ ক'রে আমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করুন।"

তথাগত অম্বপালীর দান গ্রহণ করে অম্বপালীকে তাঁর শিষ্যা করে নিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি বৈশালী ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। কিন্তু অম্বপালী সেখানেই আপন নগরীর জনসাধারণের সেবার জন্যে থেকে গেলেন। পরবর্তী জীবন তিনি দরিদ্র ও নিঃসহায়ের সেবার মধ্য দিয়েই অতিবাহিত করেছিলেন।

'ধর্মের' চিন্তা এবং চিন্তায় ও কর্মে পবিত্রতা অর্জন করাই ছিল তাঁর সাধনা। একদা যদিও তিনি গণিকার নীচবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও নিজের জীবনকে নতুন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। পরিপার্শ্বের প্রভাবে নিজে চালিত না হ'য়ে পরিপার্শ্বকে তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেছিলেন যাতে মানবাত্মার অতুলনীয় মহত্ত্বই বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

সংঘমিত্রা

রাজর্ষি অশোকের মহীয়সী কন্যা ছিলেন সংঘমিত্রা। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন, তিনি ছিলেন সম্রাটের ভগ্নী। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে সংঘমিত্রাকে যে অশোকের কন্যারূপে বলা হয় তার বিরুদ্ধাচারী এই মতের স্বপক্ষে তাঁরা কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন নি।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম হ'য়েছিল দেশের রাজধর্ম। জীবহিংসা নিষিদ্ধ করা হ'য়েছিল। সারা দেশে রোগাক্রান্তদের জন্যে আতুরালয় স্থাপিত হ'য়েছিল। দরিদ্র ও নিঃসহায় ব্যক্তিদের অন্ন বস্ত্র দান করা হত। জনগণের ধর্মশিক্ষার জন্যে একটি নতুন সরকারী বিভাগ খোলা হ'য়েছিল। ধর্মবিহারগুলিকে উপযুক্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হত। ধর্মের শিক্ষা সাধারণ্যে প্রচারের জন্যে খুবই যত্ন নেওয়া হত। মন্দির ও বিহারগুলির গাত্রে, পর্বতশিখরে, স্তম্ভগাত্রে, নগরে ও গ্রামে, সাধারণের মিলনস্থানে এবং নির্জনস্থানে—সারা ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরেও এই ধর্মশীল সম্রাটের নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধানগুলি খোদিত ক'রা হ'য়েছিল। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আলোচনা সভা ও ধর্মসভা আহ্বান করা হত। সেখানে প্রবুদ্ধ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীগণ ধর্মের সমস্যার আলোচনা করতেন। শুদ্ধাচারী উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টাগণ সারা দেশে এবং বিদেশে সদ্ধর্মের নীতি-শিক্ষা এবং সর্বজীবে করুণার বাণী প্রচারের জন্যে প্রেরিত হতেন।

রাজর্ষি অশোক তাঁর কন্যা সংঘমিত্রা এবং পুত্র মহেন্দ্রের শিক্ষার জন্যে বিশেষ-রকম যত্ন নিয়েছিলেন। এই সময় রাজকুমারের বয়স ছিল কুড়ি বৎসর, রাজ-কুমারীর আঠারো। দুজনেই সুন্দর, মিষ্টস্বভাব, বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিনয়ী ছিলেন। বৌদ্ধ-ভিক্ষুকদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব এবং পরিবেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা তাঁদের তরুণ হৃদয়ে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁদের পিতা যে কর্মে পরম অনুরাগের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সে বিষয়ে পিতার চেয়ে তাঁদের উৎসাহ কিছুমাত্র কম ছিল না।

একদা, অশোক যখন তাঁর পুত্রকে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চেয়েছিলেন, তখন একজন আচার্য এসে তাঁকে বলেছিলেন, "তিনিই কেবল 'ধর্মে'র প্রকৃত বন্ধু, এবং তিনি তাঁর সন্তানদের ধর্মের জন্যে উৎসর্গ করতে পারেন।" রাজা একথায় সাড়া দিয়ে পুত্রকন্যাকে ডেকে তাঁদের দিকে সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা কি আজীবন দারিদ্র্য, পবিত্রতা এবং বিশ্ব-জনীন সেবার ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?" রাজার এই প্রশ্নে পবিত্র ও সরল হৃদয় মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রার আনন্দের সীমা রইল না। 'সংঘ'কে সেবা করার বাসনা তাঁদের মনে আগেই জাগ্রত হ'য়েছিল, কিন্তু তাঁদের ধারণা হ'য়েছিল রাজকুলে জন্মগ্রহণ করার কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে তাঁদের সংসার-ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হবে না। তখন তাঁরা একবাক্যে উত্তর দিলেন, "করুণাময় প্রভু বুদ্ধের উপদেশ মতো বিশ্বজনীন প্রেমের বাণী প্রচার করার কোনো কাজে যদি আত্মনিয়োগ করতে পারি, তবে তাকে আমরা মহাসৌভাগ্য বলে বিবেচনা করব। আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমরা সংঘের শরণ নিয়ে মানবজীবনের পরম কামনার চরিতার্থতা লাভ করি।"

পুত্রকন্যার মুখ থেকে এই ত্যাগের বাণী শুনে অশোকের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি তখন সংঘকে সংবাদ পাঠালেন যে অশোক তাঁর পুত্রকন্যাকে প্রভু তথাগতের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। অচিরেই এ সংবাদ পাটলিপুত্র নগর এবং সারা মগধরাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। পিতা এবং পুত্রকন্যাদের এই উচ্চসংকল্প ও স্বার্থহীনতা দেখে জনসাধারণ আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠল।

মহেন্দ্রের নাম হল ধর্মপাল এবং সংঘমিত্রা পরিচিতা হলেন আয়ুপালী নামে। দুজনেই সংঘে দীক্ষিত হ'য়ে কায়মনোবাক্যে তথাগতের পথ অনুসরণ করতে লাগলেন। বত্রিশ বৎসর বয়সে মহেন্দ্র সিংহল দ্বীপে প্রেরিত হলেন। সিংহলের রাজা তিষ্ঠ মহেন্দ্রের সুন্দর মুখমণ্ডল মহাবোধির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে তিনি মহেন্দ্রকে অভ্যর্থনা ক'রে রাজ-অতিথির মতো বরণ করে নিলেন। মহেন্দ্র তাঁর ধর্মপ্রচার আরম্ভ করলেন। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁর কাছে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করল।

কিছুকাল পরে সিংহলের রাজকুমারী অনুলা তাঁর পাঁচশ সখী নিয়ে গৃহ-সংসার ত্যাগ ক'রে শ্রমণীসংঘে যোগ দিতে মনস্থ করলেন। কাজেই এইসব নতুন শিক্ষার্থিণীকে শিক্ষাদানের জন্যে উপযুক্ত নারী খুঁজে বার করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ল। মহেন্দ্রের মনে হল তাঁর ভগ্নীই এই কঠিন কর্মের একমাত্র যোগ্য অধি-কারিণী। সিংহলী নারীদের মধ্যে কাজ করার জন্যে সংঘমিত্রাকে পাঠানো

সম্ভব কিনা জানতে চেয়ে তিনি তাঁর পিতাকে চিঠি লিখলেন। সংঘমিত্রা তাঁর ভ্রাতার অনুরোধের কথা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অবিলম্বে ঐ নতুন দেশে যাত্রা করলেন।

ভারতের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম যে, একজন সদাচারিণী সুশিক্ষিতা সম্রাটকন্যা বিদেশের নারীদের মধ্যে শান্তি ও প্রীতির বাণী প্রচারের জন্যে দেশের বাইরে গেছেন। কী প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে এই সংবাদ ভারতের জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, তা আজ কল্পনা করাই কঠিন। কথিত আছে যে, সংঘমিত্রা যখন সিংহলে উপনীত হ'য়েছিলেন তখন তাঁর জ্যোতির্ময় পবিত্রতা, তাঁর পরম ত্যাগের বেশভূষা এবং মুখমণ্ডলের স্নিগ্ধ শান্তির গাম্ভীর্য দেখে দ্বীপবাসীগণ বিস্ময়াহত ভাবে পটে আঁকা ছবির মতো স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সংঘমিত্রা অবিলম্বে একটি শ্রমণীসংঘ স্থাপিত ক'রে শিক্ষার্থিণীদের শিক্ষার কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন। তাঁদের ভ্রাতা-ভগ্নীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র সিংহল দ্বীপই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। দ্বীপটির কেন্দ্রস্থলে অনুরাদ্ধপুর নামে এক বৃহৎ নগর স্থাপিত হ'য়েছিল। সেখানকার বিশাল স্তূপগুলি এবং মাইলের পর মাইল-ব্যাপী প্রস্তরনির্মিত গৃহের ভগ্নস্তূপ তাদের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। ধ্যানী বুদ্ধ, 'ধর্ম' প্রচারক বুদ্ধ, নির্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধ, ইত্যাদির অজস্র প্রস্তরমূর্তি বৌদ্ধ-যুগের গরিমার বিষয়ে আমাদের সচেতন ক'রে তোলে।

মহাবংশ নামে এক বৌদ্ধগ্রন্থের লেখক বলেছেন, "সংঘমিত্রা পরম বোধি লাভ করেছিলেন। ঐ দ্বীপে বাস করার সময় 'ধর্ম' প্রচারের জন্যে কতো প্রশংসনীয় কাজই না তিনি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহলের রাজা তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে বিরাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা করেছিলেন।"

দু হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা যে প্রেম ও সত্যের বর্তিকা জেলেছিলেন, আজও তা অম্লান দীপ্তিতে জাগ্রত রয়েছে সিংহল দ্বীপে।

২। জৈনধর্মের ধর্মসাধিকাবৃন্দ

শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর, জৈনধর্মের এই দুই সম্প্রদায়ের সাহিত্যেই ঐ ধর্মের মহীয়সী নারীর বিষয়ে উল্লিখিত হ'য়েছে। এ'দের মধ্যে কয়েকজনের কথা কিংবদন্তী নির্ভর হলেও, অন্যদের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক

অস্তিত্ব থাক বা না থাক এঁরা সকলেই বহু বংশপরম্পরায় জৈনধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

জৈনগণ চব্বিশজন তীর্থঙ্করের পিতামাতা, এবং বিশেষ ক'রে মাতার প্রতি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করেন। সন্তানক্রোড়ে মূর্তি এখনো আবুপাহাড়, গিরনার ও অন্যান্য স্থানের জৈন মন্দিরগুলিতে পূজিত হয়।

মরুদেবী ছিলেন প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের জননী। যখন তিনি শুনলেন যে তাঁর পুত্র পুরিমতাল নগরে 'কেবলজ্ঞান' লাভ করেছেন, তখন তিনি রাজরক্ষী-দলের সঙ্গে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। এই তীর্থঙ্করের অধ্যাত্মবিভূতিতে তিনি এতোই তন্ময় হ'য়েছিলেন যে তৎক্ষণাৎ ধ্যানস্থ হ'য়ে সমাধিলাভ ক'রে দেহত্যাগ করেছিলেন। ঊনবিংশ তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ছিলেন একজন রাজকন্যা। শ্বেতাম্বরগণ মনে করেন তিনি মিথিলা, অর্থাৎ বর্তমান বিহারের রাজা কুম্ভের কন্যা ছিলেন। তিনি সুন্দরী এবং বিদুষী ছিলেন বলে বহু রাজাই তাঁর পাণিপ্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁর পিতা এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রত্যাখ্যানে তাঁরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে মিথিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে প্রবলভাবে মিথিলা আক্রমণ করেন। মল্লির পিতা যখন প্রায় পরাজিত হ'য়ে এলেন তখন তাঁর পিতাকে তিনি সমস্ত রাজাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নিজের কক্ষে আহ্বান করতে বললেন। রাজারা মল্লির কক্ষে এসে তাঁর অপূর্ব-সুন্দর মূর্তি দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আরেকটি অনুরূপ মূর্তি অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে হতভম্ব রাজাদের বললেন, প্রথমে তাঁরা যা দেখেছেন তা হল মল্লির স্বর্ণমূর্তি। তারপর তিনি মূর্তিটির মাথার একটি ঢাকনী খুললে সমস্ত স্থানটি দুর্গন্ধে ছেয়ে গেল। তার ভিতর একটা ফাঁকা জায়গায় কয়েকদিন আগে খাদ্যদ্রব্য জমা করে রাখা হ'য়েছিল। রাজারা দেখা করতে আসার আগেই সেই খাদ্য পচে উঠেছিল। মল্লি রাজাদের বললেন, তাঁরও দৈহিক সৌন্দর্যের নিচে ঐরকম দুর্গন্ধযুক্ত নোংরা জিনিষ আছে। তিনি আরো জানালেন যে, সংসারের সুখৈশ্বর্য ছেড়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। একথা শুনে রাজারা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন, প্রকৃত সুখ কেবল ধ্যান এবং তপস্যার দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। কাজেই স্ব-স্ব রাজ্যের ভার উত্তরাধিকারীদের হাতে দিয়ে মল্লির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, নারীদের প্রতি এই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য এবং মহাবীরের শিক্ষানুসারে ত্যাগের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় জৈন ধর্মা-

বলম্বী বহু নারীই সন্ন্যাসিনীর জীবন গ্রহণ করেছেন। জৈন সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘ বৌদ্ধ শ্রমণী-সঙ্ঘের চেয়ে প্রাচীনতর বলে অনুমান করা হয়। জৈনধর্মের কয়েক-জন উল্লেখযোগ্য সন্ন্যাসিনীর নাম লিপিবদ্ধ করা হল নিচেঃ—

(১) আর্যা চন্দনা ছিলেন মহাবীরের সমসাময়িক। তাঁর ধর্মভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। মহাবীরের প্রথমা শিষ্যা হ'য়ে জৈন সন্ন্যাসিনী-সম্প্রদায়ের অধিকর্ত্রী পদে বৃতা হ'য়েছিলেন তিনি।

(২) জয়ন্তী ছিলেন রাজা শতানীকের ভগ্নী। তিনি মহাবীরের উপদেশাবলী শ্রবণ করতেন। তাঁর সঙ্গে জীবন মৃত্যুর রহস্যেরও আলোচনা করতেন। অবশেষে তিনি রাজপ্রাসাদের ভোগৈশ্বর্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ে যোগদান করেন।

(৩) মৃগাবতী ছিলেন রাজা শতানীকের অন্যতমা মহিষী। তাঁর নাম সতীত্ব ও শৌর্যের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে। উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোৎ তাঁর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে শতানীকের রাজ্য কৌশাম্বী আক্রমণ করেন। যুদ্ধ চলা কালেই শতানীক পীড়িত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃগাবতী বুদ্ধি খাটিয়ে প্রচার করেন, রাজা অসুস্থ হয়ে আছেন। তিনি নিজে সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে শত্রুদের বিতাড়িত করেন। তারপর রাজার মৃত্যুসংবাদ সর্বসমক্ষে প্রচার করেন তিনি। কিন্তু শত্রুরা অদূরেই অপেক্ষা করছিল। এদিকে নিজের সৈন্যদলও তখন ক্লান্ত, বিশাল শত্রুসেনার সম্মুখীন হওয়ার মতো ক্ষমতা তাদের ছিল না। কাজেই মৃগাবতী কৌশল পরিবর্তন করে প্রচার করলেন যে, তিনি রাজা প্রদ্যোতের সঙ্গে যেতে রাজি আছেন, কিন্তু তার আগে রাজাকে মৃগাবতীর রাজ্যের সীমান্তে মাটির বাঁধ গড়ে দিতে হবে এবং মৃগাবতীর কিশোর পুত্র উদয়নকে কৌশাম্বীর সিংহাসনে স্বাধীন রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রদ্যোৎ এসব শর্ত পালন করার পর মৃগাবতী মহাবীরের ধর্মসভায় গিয়ে জানালেন যে, প্রদ্যোতের সম্মতি পেলে তিনি জৈন সন্ন্যাসিনী হতে ইচ্ছা করেন। প্রদ্যোৎ আগেই মহাবীরের অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, এবং তিনি ধর্মসভার মধ্যেই বসেছিলেন। একথা শুনে অতীত কার্যাবলীর জন্যে তাঁর মনে খুবই অনুতাপ দেখা দিল এবং তিনি উন্নত জীবন যাপন করবেন বলে মনস্থ করলেন। মৃগাবতীকে সাগ্রহে সন্ন্যাসিনী হওয়ার অনুমতি দিলেন তিনি, এবং কেবল তাই নয়, তাঁর কয়েকজন রাণীকেও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ে যোগ দিতে সম্মতি দিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন যে, মহাবীর স্বয়ং তাঁদের দীক্ষিত করেছিলেন।

(৪) মহাবীরের দেড়শ বৎসর পরবর্তী ব্যক্তি স্থূলভদ্রের সাতজন ভগ্নী, যক্ষ এবং অন্য সকলেই সন্ন্যাসিনী হ'য়েছিলেন।

(৫) যাকিনী মহত্তরা ছিলেন সপ্তম শতাব্দীর একজন তীক্ষ্ণধী বিদুষী নারী। জৈন ধর্মশাস্ত্রের প্রচারের জন্যে তিনি যা করেছেন তার তুলনা হয় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হরিভদ্র সূরিকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। হরিভদ্র যাকিনীকে নিজের গুরু বলে স্বীকার ক'রে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি জৈনধর্মের একজন প্রধান প্রবক্তা হ'য়ে নীতিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া প্রাচীন পুঁথির ভাষ্য ও বহু কাহিনীও রচনা করেছিলেন তিনি। জৈনধর্মের সংস্কারসাধনও তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তি নিজেকে যাকিনীর পুত্র বলে পরিচিত করতে বিশেষ গৌরব বোধ করতেন। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যাকিনীর প্রতিভা ছিল কতো উচ্চস্তরের।

(৬) গুণসাধবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। এই জৈন সন্ন্যাসিনী উচ্চ-আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্না বিদুষী নারী ছিলেন। ৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিদ্ধার্ষির রূপক রচনা "উপমিতভাব-প্রপঞ্চ-কথা" নামক গ্রন্থের প্রথম লিপি প্রস্তুত করেন।

(৭) ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে জিনভদ্রের "বিশেষ-আবশ্যক-ভাষ্য" নামক গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভাষ্যরচনাকালে মলধারী হেমচন্দ্রকে মহানন্দাশ্রী মহত্তরা এবং গণিনী বীরমতী নামক দুজন জৈন সন্ন্যাসিনী প্রভূতভাবে সাহায্য করেছিলেন।

(৮) ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে গুণসমৃদ্ধি মহত্তরা প্রাকৃত ভাষায় "অঞ্জনা-সুন্দরী-চরিত্র" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বৌদ্ধ শ্রমণীসঙ্ঘ পঞ্চম শতাব্দীর পর লুপ্ত হ'য়ে যায়। জৈন সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় কিন্তু এখনো টিঁকে আছে। তাঁরা ধর্মপ্রাণা, নিষ্ঠাবতী এবং আত্মোৎসর্গ-পরায়ণা। কোনো জীবিত প্রাণীর ক্লেশ না ঘটানোর উচ্চ আদর্শের জন্যে তাঁরা সুপরিচিত। উপবাসকে তাঁরা পুণ্য কর্ম বলে মনে করেন। উপবাস যতো দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাঁদের মতে পুণ্য ততো বেশী হয়। অনেক নারী, বিশেষ করে কর্ণাটকের জৈন নারীগণ "সল্লেখানা" নামে এক ব্রত পালন করতেন। 'সল্লেখানা'র অর্থ হল আমৃত্যু উপবাস। একে পরম পুণ্য বলে মনে করা হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

মি কাও বু—ব্রহ্মদেশের ধর্মপ্রাণা নারী

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামঞা প্রদেশ (দক্ষিণ ব্রহ্ম) এমন একজন রাণীর শাসনে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিল যাঁর জীবন ও রাজত্ব কাল আমাদের, বিশেষ ক'রে বর্মী নারীদের কাছে, গৌরবের বিষয়। তাঁর ইতিহাস একাধারে সুসমৃদ্ধি, শান্তি, স্নিগ্ধতা ও নির্ভীক বলিষ্ঠতার জন্যে বিখ্যাত। যদিও তিনিই একমাত্র রাজ্ঞী যিনি সিংহাসনে আরোহণ করে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন, তবু তিনি রাণী হিসাবে যতো না তার চেয়ে বেশী স্মরণীয় হ'য়ে আছেন মাতা হিসাবে। তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে এখনো তিনি জীবন্ত সত্তা, এখনো তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন এবং দুর্দিন দুঃসময়ে তাদের অজ্ঞাতসারে তারা তাঁর কথাই চিন্তা করে।

এতো প্রীতির সঙ্গে যিনি দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করে আছেন তাঁর জীবনী-চিত্র অঙ্কিত করা খুবই কঠিন। ব্যক্তিগত ভাবে লেখকের মনে তাঁর সম্বন্ধে যে চিত্র জাগ্রত আছে, তারই প্রতিফলন করা শুধু সম্ভব। তাঁর জীবনীর উপকরণ কিছুটা পাওয়া যায়, তেনাসেরিমে প্রাপ্ত 'মন' ভাষায় তালপাতার উপরে লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণীতে।

রাণী শুদ্ধমায়ের গর্ভে হংসবতোই (পেগু)-র রাজা রাজাধিরাতের এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করেছিল। এই কন্যাটির জন্ম হয় ৭৭৫ সালের মাঘ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে। ইংরাজী পঞ্জিকা অনুসারে এই দিনটি ছিল ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী।

কন্যার পিতার পিতৃস্বসা তাঁর নাম দিয়েছিলেন মি কাউ বু—মি অর্থ মাতা, কাউ অর্থ দৌহিত্রী, আর বু অর্থ সুন্দরী। বড় হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নামটির পূর্ণ তাৎপর্যই তাঁর ক্ষেত্রে সত্য হ'য়ে উঠেছিল। প্রকৃতই তিনি সুন্দরী দৌহিত্রী হিসাবে তাঁর পিতামহীর অবশিষ্ট জীবন মাধুর্যমণ্ডিত করে দিয়েছিলেন; এবং নিজের পরিণত বয়সে তিনি নিজে জীবন-পথে ক্লান্ত, আশ্রয় ও শান্তিকামী মানুষদের হৃদয়ে জননীর স্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর আমরা যারা তাঁর কয়েক শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছি সেইসব সন্তানদের কাছে তিনি "ক্যাক ড্যুঙ"-এর বিখ্যাত প্যাগোডায় অবস্থান ক'রে রেখে গেছেন উচ্চ চিন্তার প্রেরণা। তাঁর

আদর্শকে মনে রাখলে আমরা দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উচ্চতর জীবনে প্রবেশ লাভ করতে পারি।

তাঁর সাত বৎসর বয়সের সময় ড্‌ঘুঙ-এর (রেঙ্গুণের) রাজপুরী থেকে তাঁর পিতার পিতৃস্বসা দেখা করতে এলেন। তিনি মুখে কিছুটা নিঃস্পৃহভাব দেখাতে চাইলেও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের এই নবজাত কন্যাটির লাবণ্যে মুগ্ধ না হ'য়ে পারলেন না। তিনি রাজাধিরাতকে অনুরোধ করলেন যাতে এই কন্যাটিকে তাঁর সঙ্গে ড্‌ঘুঙের রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে দেন। সেখানে তিনি সযত্নে এই শিশুটিকে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে সুশিক্ষিতা করে তুলবেন। রাজাধিরাতের মত হল। তখন তাঁর পিতৃস্বসা নিজের রাজ্যে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী হিসাবে নিয়ে এলেন এই কন্যাকে। ড্‌ঘুঙের রাজপ্রাসাদ হল মি কাও বু-র নতুন গৃহ। অল্প বয়সে এসেছিলেন বলে নিজের অজ্ঞাতসারেই নতুন দেশের সংস্কৃতির আদর্শ অতি সহজেই তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। নরম উর্বরা ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ পড়লে যেমন হয় তেমনি তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী তাঁর জীবনকে প্রস্তুত করে মনঃশক্তির বিকাশে সাহায্য করতে লাগল। পরবর্তীকালে এই মন শতদল পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হ'য়ে ধর্মপ্রাণতার বিরল সৌরভে চারিদিক আমোদিত করে তুলেছিল।

অতিদ্রুত কয়েকটি বৎসর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেল। আনন্দের নিত্য উৎস মি কাও বু তাঁর পিতার পিতৃস্বসার অবশিষ্ট দিনগুলি মধুময় করে তুললেন; আর তিনিও তাঁর মৃত্যুকালে দ্বাদশবর্ষীয়া মি কাও বু-র হাতে ড্‌ঘুঙ রাজ্য সঁপে দিয়ে গেলেন। কিছুকাল পরে মি কাও বু-কে তাঁর পিতা রাজাধিরাত নিজের রাজ্য হংসবতইয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বয়স যখন কুড়ি বৎসর তখন তাঁকে রাজাধিরাত অন্য এক আত্মীয়, মাৎমা-র (মতবনের) রাজা স্মিঙ্‌ সেতুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। নববধূ হিসাবে মাৎমায় যাওয়ার পর পাঁচ বৎসর সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপন করে তিনটি সন্তানের জননী হলেন তিনি। এরপর ভাগ্যের কঠিন পরীক্ষায় পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনটি সন্তান নিয়ে বিধবা হলেন। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে ড্‌ঘুঙের কথা মনে পড়ল তাঁর, এবং সেখানেই ফিরে এলেন তিনি। এখানে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাঞা রামের রক্ষণাবেক্ষণে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন তিনি।

তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর পিতা হংসবতইয়ে রাজত্ব করছিলেন, কিন্তু কিছু-কালের মধ্যেই একটি ক্ষতস্থানে বিসর্প হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তখন মি কাও বু-র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বঞা কিম্‌ সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

রাজাধিরাতের মৃত্যুর পর ড্যগুঙে কিছুটা বিশৃংখলা দেখা দেয়। সেজন্যে মি কাও বু তাঁর সন্তানদের নিয়ে কনিষ্ঠের সঙ্গে হংসবতইয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণে বাস করতে লাগলেন।

ঘন ঘনই তিনি ক্যাক ড্যগুঙের প্যাগোডায় তীর্থদর্শনে আসতেন। এর জন্যে পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হত তাঁকে।

অবঅ রাজ্যের রাজা থিহথু এর আগেই চারজন সেনাপতির অধীনে একটি সৈন্যদল প্রেরণের গোপন পরিকল্পনা স্থির করে রেখেছিলেন। হংসাবতই এবং ড্যগুঙের মধ্যে এক নির্জন এবং গুপ্তস্থানে আত্মগোপন ক'রে থেকে মি কাও বু সেই পথে যাওয়ার সময় সদলে তাঁকে অপহরণ করে অবঅ-তে নিয়ে আসাই ছিল ঐ সৈন্যদলের উদ্দেশ্য।

ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছামত পথ অতিক্রম করার সময় মি কাও বু আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ্য করলেন যে চারপাশের অরণ্যের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে অনেক মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে। অচিরেই তিনি হ্রেষাধ্বনি ও বৃংহিত শুনতে পেয়ে আরো বিস্মিত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু পরিস্থিতিটা ভালো করে অনুধাবন করার আগেই তিনি নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখতে পেলেন। এই বিশাল সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর নিজের রক্ষীদল ছিল একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। ফলে শত্রুরা তাঁকে উত্তর দিকে অবঅ-এর রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল।

বর্মী ভাষ্য অনুসারে তিনি থিহথুর রাজধানী অবঅ-য়ে এসেছিলেন এইভাবে। রাজাধিরাতের মৃত্যুর পর তাঁর দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। থিহথু এসে শান্তিপূর্ণভাবে এই বিবাদের মীমাংসা করে দিলেন। সেজন্যে দুই ভাইই খুব কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন। এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার বাসনাতেই তাঁরা থিহথুর হাতে মি কাও বু-কে সম্প্রদান করলেন।

ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মি কাও বু থিহথুর প্রধান মহিষীর আসনে স্থাপিতা হলেন। পরিস্থিতির এই বিস্ময়কর জটিলতা যে কোনো মানুষের পক্ষেই কঠিন সমস্যা হ'য়ে দেখা দেয়; তিনিও নিশ্চয়ই এ সমস্যায় পড়েছিলেন। সৌভাগ্য-বশত বিদ্যানুশীলনের দিকে চিরকালই তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেজন্যে বিদ্যাদান ও জ্ঞানার্জনের কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে পেরেছিলেন। দৈনন্দিন জীবনে তিনি রাজপ্রাসাদের অন্যান্য নারীদের শিক্ষা ও পরামর্শ-দাত্রী হ'য়ে উঠেছিলেন। যে পাঁচবছর তিনি এখানে ছিলেন তার মধ্যে রাজবাড়ীর সাংস্কৃতিক মান অনেক উন্নত হ'য়ে উঠেছিল।

তাঁর অবঅ-য়ে আসার দু এক বৎসরের মধ্যে থিহথুর এক রাণী একটি হ্রদের

খননকার্য পরিদর্শনের সময় রাজাকে হত্যা করবার জন্যে একজন শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন। এর ফলে থিহথুর মৃত্যু ঘটায় তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করলেন, কিন্তু সেই রাণীই তাঁকে খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হত্যা করলেন। এরপর তাঁর পরিকল্পনা সার্থক ক'রে তাঁর নিজের গর্ভজাত পুত্র যখন সিংহাসনে বসলেন তখন ঐ রাণী খুবই উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু হতভাগ্য নতুন রাজার রাজত্বকাল হল খুবই স্বল্পস্থায়ী। সোহ্‌ণ্‌য়িন-এর রাজা অবঅ আক্রমণ ক'রে তরুণ রাজাকে হারিয়ে সিংহাসন অধিকার করলেন। এ'রই রাজত্বকালে চৌত্রিশ বৎসর বয়সে মি কাও বু রামঞ্ঞায় পালিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে পেলেন।

অবঅ-য়ে থাকার সময় নানাকাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেও, দীর্ঘকাল সেখানে থাকবেন একথা তাঁর মনে স্থান পেত না। কেননা তাঁর মন পড়েছিল দক্ষিণের দিকে যেখানে তাঁর সন্তানেরা রয়েছে। তাঁর পরিচারিকারা প্রায়ই দেখতে পেত তিনি দক্ষিণদিকের জানালার সামনে দূরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দিগন্তের ভাসমান মেঘদলের দিকে তাকিয়ে তিনি নীরবে প্রার্থনা করতেন, তারা যেন তাঁর ভ্রাতার কাছে তাঁর বার্তা দিয়ে জানায়, স্বগৃহে ফেরার জন্যে তিনি কী গভীরভাবেই না উন্মুখ হ'য়ে আছেন।

যেন তাঁর এই প্রার্থনার ফলেই হঠাৎ তাঁর নিজের দেশ থেকে দুজন ব্রহ্মচারী অবঅ-দর্শনে এলেন। রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁদের আহারে নিমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের কাছে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘটেছে, এখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হ'য়েছেন। তাঁদের কাছে মি কাও বু দেশে ফেরার জন্যে তাঁর প্রবল ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। ব্রহ্মচারীরা সেই অনুসারে উপায় খুঁজে বার করলেন।

হংসবতইয়ে ফেরার পর তাঁর ভ্রাতা তাঁকে আদরের সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাজপ্রাসাদের কাছে অন্য একটি গৃহে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বহুকাল তিনি শান্তিতে এই বাড়ীতে বাস করেছিলেন। তাঁর সন্তানগণও বহুকাল আগে তিনি যেমন তাঁর পিতার পিতৃস্বসার কাছে নিরুদ্বেগে বেড়ে উঠেছিলেন, তেমনিভাবে মানুষ হ'তে লাগল। এই সময়টা নিশ্চিন্ত পারিবারিক শান্তির মধ্যে কেটে গেল। সন্তানদের দেখাশোনার পর তাঁর হাতে যে সময় থাকত তা তিনি সাধুসন্ন্যাসী, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবায় ব্যয় করতেন। এদের জন্যে তাঁর যত্নের আর সীমাপরিসীমা ছিল না। আর এরই ফলে, তাঁর ভ্রাতা যখন কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলেন এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়সে

তিনি হংসবতইয়ের সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন রাজ্যের অধিবাসীরা তাঁকে পরম আস্থার সঙ্গে বরণ করে নিল।

তাঁর পুত্র অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হয়। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় একজন রাজপুত্রের সঙ্গে এবং কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয় ধম্মশেটি নামে একজন পণ্ডিতের সঙ্গে। তাঁর রাজত্বকালে ধম্মশেটি তাঁকে রাজকার্যে সবিশেষ সহায়তা করেছিলেন এবং তাঁরও ধম্মশেটির উপর খুবই আস্থা ছিল।

তাঁর কন্যা এবং রাজকুমার-জামাতাকে তিনি ফাসেম (বেসিন)এ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শহরের প্রতিরক্ষার জন্যে তাঁরা দুর্গ তৈরী করে সসৈন্যে অপেক্ষা করবেন এবং উত্তর দিক থেকে কোনো আক্রমণ ঘটলে তার প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু রাণী মি কাও বু-র কাছে সব রকম সুযোগসুবিধা পাওয়ার পর জামাতা-রাজকুমার হংসবতই আক্রমণের উপায় খুঁজতে লাগলেন: কেননা সেখানে ধম্মশেটির ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা তাঁর পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। এ সংবাদ অবশ্য আগেই ফাঁস হ'য়ে গেল এবং রাণী এই বিপদকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার ব্যবস্থা করলেন। রাণী তাঁর কন্যাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠালেন। কন্যা এলে তাঁকে প্রায় বন্দী করেই রাখা হল। এদিকে রাণীর সৈন্যদল ফাসেম আক্রমণ করে এক তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধে রাজকুমারকে নিহত ক'রে ফেললেন। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাজকুমারী অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হ'য়ে উঠলেন। তিনি ক্যাক ড্যুঙ প্যাগোডায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। সেখানে গিয়ে তিনি মাথার চুল কেটে ফেলে সাদা কাপড় পরে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসিনী রূপে বাস করতে লাগলেন।

একদিন পাল্‌কী চড়ে বেড়ানোর সময় মি কাও বু দেখতে পেলেন একজন বৃদ্ধ লোক বিপরীত দিক থেকে তাঁর দিকে আস্‌ছেন। বাহকেরা তাঁকে সরে যাওয়ার জন্যে চিৎকার করল। কিন্তু সেই লোকটি সরে গেল না, অবিচলিত ভাবে রাণীর দিকে এসে তাঁকে দেখে মন্তব্য করল, "ওহো, এ সেই বৃদ্ধা রাণী!" এই কথা বলে তৎক্ষণাৎ সে মিলিয়ে গেল, কেউই বলতে পারল না কোন দিকে গেল সে। রাণী কিন্তু মনে মনে বুঝলেন, কোনো করুণাময় দেবতা দয়া ক'রে মানুষের দেহ ধারণ ক'রে তাঁকে বন্ধুভাবে মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন যে তিনি বৃদ্ধা হ'য়ে যাচ্ছেন এবং এখন অবসর নিয়ে শান্তিময় উপাসনার জীবন গ্রহণ করাই তাঁর উচিত।

কয়েক বৎসর পরে তিনি মন্ত্রীদের জানালেন যে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করবেন, এবং ধম্মশেটিকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন। এইভাবে

ধম্মশেটি (রামাধিপতি) হংসবতইয়ের রাজা হলেন। তাঁর রাজত্বকাল শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ হয়েছিল। তিনি ন্যায়বিচারী ও সুশাসক ছিলেন। ব্রহ্মদেশের রাজাদের সুদীর্ঘ তালিকায় অতি সুশাসক হিসাবে তাঁর নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সময়ের পক্ষে অনুপযোগী বহু আইন পরিবর্তন ক'রে তিনি নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী বহু নতুন আইন প্রণয়ন করেছিলেন। এই-রকম শান্তিময় প্রাচুর্যের যুগেই সাধারণত ধর্ম ও শিল্পকলার প্রসার ঘটে। রামঞায় আজ যে সব সুন্দর স্মৃতি-সৌধ দেখা যায় সেগুলিও এই যুগেই তৈরী করা হ'য়েছিল।

ড্যগুঙ প্যাগোডায় চলে যাওয়ার আগে মি কাও বু ধম্মশেটিকে এই বলে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন—"ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার সঙ্গে রাজত্ব করবে; রাজাদের জন্যে 'ধর্মে'র যা বিধান তারই উপর তোমার জীবন ও কার্যাবলীর ভিত্তি স্থাপন করবে—'নির্বাণের দ্বার তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হ'য়ে যাবে তাহলে।" এই কথাগুলি কি জীবনের এক গভীরতর সত্যকে উদ্ঘাটিত করে না? এটা কি সত্য নয় যে, ন্যায়পরায়ণতা গুণটি অনাসক্তি ও নির্ভীকতারই সন্তান? অনাসক্তির ফলে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে নির্ভুলভাবে বিচার করা সম্ভব হয়; সেজন্যে ন্যায়বিচারের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। কিন্তু নির্ভীকতা লাভ করব আমরা কী উপায়ে? অহম্‌ভাব যে পরিমাণে কম প্রবল হবে নির্ভীকতাও সেই পরিমাণে বেড়ে চলবে। এবং অহম্‌কে অতিক্রম করার সহজতম উপায় হল কোনো আদর্শের দিকে নিজেকে বিকশিত করে তোলা। এইজন্যে অনাসক্তির ফলে স্বচ্ছ এবং নির্ভুল বিচার সম্ভব হয় এবং নির্ভীকতার ফলে বিচারলব্ধ সিদ্ধান্তকে কর্মে রূপায়িত করার শক্তি ও সাহস পাওয়া যায়। কাজেই এই দুই পিতা-মাতার তুল্য গুণ থেকেই ন্যায়পরায়ণতার জন্ম। যাই হোক, আমাদের মধ্যে দয়ার বিকাশ ঘটবে কী উপায়ে? এটা সেই পরিমাণেই বাড়ে বা কমে, যে পরিমাণে আমরা নিজেদের অন্যের অবস্থায় আরোপ করতে পারি। ধরা যাক, 'ধর্মের বিধানগুলি' একজন রাজা। তাহলে তিনিই হচ্ছেন সেই শক্তি যা অত্যাচার ও আক্রমণকে প্রতিহত ক'রে বিপন্ন অত্যাচারিতগণকে রক্ষা করতে পারে। রাজার আসনে বসানোর সম্মান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপর সংখ্যাহীন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এবং তার ফলে এসেছে অন্তহীন কর্মোদ্যোগ।

মি কাও বু রাজকার্য যে ধম্মশেটির উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন তার কারণ অন্যত্র এক আহবান শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। রাজসিংহাসন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধম্মশেটির উপর কর্মের গুরু দায়িত্ব নেমে এসেছিল, কিন্তু এই কর্ম যেন কেবল

রাজসুখ লাভের উপায় না হয়ে অন্য লক্ষ্যে নিযুক্ত হয়, এইটেই ছিল মি কাও বু-র বাণী। আর এর দ্বারা তিনি কি এই কথাই জোর দিয়ে বলতে চাইছিলেন না যে কর্মই নির্বাণ লাভের উপায়?

জনসাধারণ অত্যন্ত দুঃখিত মনে তাঁর বিদায়-ক্ষণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিছুতেই তারা প্রবোধ মানতে চাইছিল না। সারা নগরীর উপর বিষাদের ছায়া নেমে এল। মি কাও বু তাঁর বিদায় সংবাদে জনসাধারণের গভীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে নগরের মধ্যে একজন ঘোষক পাঠিয়ে ঘোষণা করলেন যে, যারা ইচ্ছা করে তারা তাঁর সঙ্গে যেতে পারে। তাঁর যাওয়ার সময় দেখা গেল নগরের জনসংখ্যার তিনচতুর্থাংশ তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। এত লোক সঙ্গে নেওয়া মস্ত বড় দায়িত্বের ব্যাপার ছিল, কিন্তু তিনি তাদের যেতে দিলেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি।

এরপর শুরু হল মি কাও বু-র সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গের জীবন, আর এইভাবে দশ বৎসর অতিবাহিত হল কর্ম ও উপাসনার মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্যাগোডার পুনর্গঠনে মন দিলেন তিনি। শিল্পী তাঁর ছবির মধ্যে যে ভাবে কল্পনা ও আবেগকে ঢেলে দেন, সেইভাবে তিনি কাজ করতে লাগলেন। এই সময় পর্যন্ত এই প্যাগোডা আকারে যেমন ছোট ছিল তেমনি এতে কোনো সোনালী রঙের কাজও ছিল না। এখন মি কাও বু তাঁর সমস্ত সময় ও সামর্থ্য দিয়ে একে তাঁর মনের মতো আকার ও আকৃতি দিয়ে সাজিয়ে তুলতে লাগলেন। তখন হয়তো তিনি এটা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু এখন আমরা স্পষ্টই অনুমান করতে পারি যে, অনাসক্ত উপাসনাময় জীবনের দিকে তাঁর মন ফিরিয়ে সেই বৃদ্ধবেশী দেবতা নিশ্চয়ই জানতেন, মি কাও বু-র দ্বারাই প্রভুর মন্দির রূপায়িত হ'য়ে উত্তরপুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

ক্যাক ড্যুঙ (অর্থাৎ "শ্বেত ড্রাগন") প্যাগোডা এখন যেমন মাধুর্যময় রেখা ও বৃত্তাংশে গঠিত তার গম্ভীর সৌন্দর্য মি কাও বু-র অন্তরাত্মারই প্রতিচ্ছবি। এতে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য যেমন প্রকাশিত হ'য়েছে তেমনি অনুধাবন করা গেছে যে দৃঢ়তাই সৌন্দর্যের মূলভিত্তি।

পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম সমাধা করে তিনি লোকান্তর গমন করেন। এই কর্মের ফল প্রভু তথাগতকে সমর্পণ ক'রে তিনি নির্বাণ প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শেষ সময়ে তিনি তাঁর শয্যা জানালার কাছে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, যাতে তিনি ঐ প্যাগোডার দর্শন লাভ করতে পারেন। চোখের সামনে প্যাগোডা, মনে মনে তথাগতের ধ্যান—এই

অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করলেন তিনি। এইভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল সেই মহামানবীর জীবন। শুরুতে এ জীবন ছিল সুখী ও নিশ্চিন্ত, পরে অন্যান্য মানুষের মতোই এল যন্ত্রণার অগ্নিপরীক্ষা, কিন্তু পরে সেই অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, হৃদয়কে প্রসারিত ক'রে ভালোবাসার ক্ষমতা বাড়ানো এবং সেই সঙ্গেই অধিকারবোধ কমানো জীবনের পরম আদর্শ।

ব্রহ্মদেশে মি কাও বু সাধারণতঃ শিন সঅ বু নামে পরিচিত। পাঁচ শতাব্দী অতিক্রান্ত হ'য়ে গেলেও এই নাম আজও পরম প্রীতির সঙ্গে স্মরণে রেখেছে সকলে। তাঁর চরিত্র মাধুর্য ও মহত্ত্বের জন্যে তিনি এখনো সমগ্র ব্রহ্মদেশে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রী হ'য়ে আছেন। এমন কি যেখানে তিনি বন্দিনী হ'য়ে ছিলেন সেই অঞ্চলেও লোকেরা এখনো তাঁর জীবনের অনেক মর্মস্পর্শী ঘটনা নাটকাকারে মঞ্চস্থ করে থাকে, আর এইসব নাটকের মহৎ শিক্ষায় দর্শকদের চিত্ত উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে।

সুদূর কালের দিগন্তে দৃষ্টিপাত ক'রে এখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি তাঁকে যে অবঅ-য়ে বলপূর্বক অপহরণ করা হয়েছিল, তার অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও জীবনের দিক দিয়ে সেটা মি কাও বু-র পক্ষে মঙ্গলজনকই হ'য়েছিল। যদি তিনি সুখী দাম্পত্যজীবনের আশ্রয় ও নিশ্চিন্ততা পেতেন তবে জোর করেই বলা যায়, তিনি সাধারণ যে কোনো নারীর মতোই অনুল্লেখযোগ্য জীবন যাপন করে মৃত্যু বরণ করতেন। কিন্তু তিনি যে এইভাবে ভাগ্যের ক্রূর ভ্রূকুটিতে দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে পড়েছিলেন, তার ফলে কঠিন বাস্তবের স্বরূপ তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত হ'য়ে গিয়েছিল। আর এই পরিস্থিতিকে ভাবাবেগ বর্জিত ভাবে আয়ত্তে আনার জন্যে এবং কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে নিজের দুর্দশাকে ভোলার প্রয়াসে তিনি অজ্ঞাতসারে হলেও সুনিশ্চিত ভাবেই নিজের জন্যে নির্বাণের পথ উন্মুক্ত করতে পেরেছিলেন। এদিক থেকে দেখলে বলা যায়, থিহথু আসলে নিয়তির হাতে ক্রীড়নক ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর জন্যেই মি কাও-বু জীবনের কঠোর সত্যের সম্মুখীন হ'তে পেরেছিলেন। এই নির্মম পরিস্থিতি থেকে তিনি অপরের মঙ্গল চিন্তার দ্বারাই পরিত্রাণের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন। এইভাবেই তাঁর অন্যান্য শোক সন্তাপও যেন এক মূল লক্ষ্যেরই পরিপূরক হ'য়ে উঠেছিল।

অত্যন্ত কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যেও সাধারণ নারীদের মতো ভেঙে না পড়ে মি কাও বু নিজের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত রেখে দৃঢ় ও অবিচলিত থাকতে পেরেছিলেন। যখন তাঁর হৃদয় যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাচ্ছিল তখনো নীরবে অন্যের

সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পেরে তিনি যে শান্ত ত্যাগের মহিমা প্রকাশ করে গেছেন, তাতে আমরাও আমাদের জীবনের দুঃখময় মুহূর্তগুলিতে সাহস ও শক্তি খুঁজে পাই। নিঃসঙ্গ যন্ত্রণার দিনগুলিতে যখন বেদনা ও যন্ত্রণার গুরু-ভারে আমাদের হৃদয় পিষ্ট হ'তে থাকে, তখন তিনি যেন আকাশ-প্রদীপের মতো প্রতিভাত হ'য়ে আমাদের দুঃখভোগ ও সহিষ্ণুতার ভিতর শক্তি সংগ্রহ করতে উৎসাহ দেন। আর চরিত্রের ক্রমবিকাশের পথও তো এইটেই।

নাম আর যশ, কিম্বা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, অথবা সংসারে আর যা কিছু পাওয়া সম্ভব সবই চরিত্রের দৃঢ়তার তুলনায় তুচ্ছ। দৃঢ়তার অভাবে জগতের সর্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তুও সৌন্দর্যহীন হ'য়ে পড়ে। আর দৃঢ়তা থাকলে জীবনের অতি সাধারণ তুচ্ছ বস্তুও লাবণ্যে মহৎ হ'য়ে ওঠে।

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টধর্মের ধর্মসাধিকাগণ

অষ্টাদশ অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্মে নারীর স্থান

ভূমিকা

পীথাগোরাসের মত ছিল এই যে, "নারীজাতি ধর্মভাবের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট।" [১] শোনা যায়, তিনি তাঁর নীতিশাস্ত্রের সারমর্মও থেমিস্ টোক্লিয়া [২] নামে জনৈকা ডেল্‌ফিক নারী-পুরোহিতের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যে ধর্মের ক্ষেত্রে নারীর স্থান সেই সুদূর অতীতেই স্বীকৃত হয়েছিল, প্লেটোও তাঁর সময়ে 'সিম্পোসিয়াম' নামক গ্রন্থে ডিয়োটিমা ও সক্রেটিস অধ্যায়ে পীথাগোরাসের ঐতিহ্যকেই সুসংহত করেছিলেন দেখা যায়। আরো পরে, খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, খ্রীষ্টীয় গির্জার প্রাচীন ধর্মযাজকগণ গ্রীক দার্শনিক চিন্তার প্লেটো প্রবর্তিত ঐতিহ্যেরই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। নতুন আধারে পুরনো বস্তুর মতো তাঁরা ঐ নতুন ধর্মের মানস-প্রসারের জন্যে প্রাচীন গ্রীক রীতি গ্রহণ করেছিলেন। যতোদূর পর্যন্ত এই প্রাচীন চিন্তাধারা নতুন ধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্যের[৩] সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চালানো যায়, ততোদূরই তাঁরা ঐ চিন্তাধারাকে ব্যবহার করেছিলেন।

এরদ্বারা অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে খ্রীষ্টধর্মের অতুলনীয় চৈতন্যের প্রসার ঘটেছিল প্রাথমিক ঐ গ্রীক ভারবূপের ব্যবহারের দ্বারাই। মোটেই তা নয়, বরং নারীত্বের যে উচ্চস্থান খ্রীষ্টধর্মে দেওয়া হয়েছে তা অন্য-নিরপেক্ষভাবে অনেক আগেই ঘটে গেছে। জগতে এ ধর্ম যে ভাবে অভ্যুদয় লাভ করেছে সেই আদি পরিস্থিতিই এর সব থেকে বড় প্রমাণ—অর্থাৎ এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে নরদেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'তে পেরেছিলেন তার জন্যে একজন নারীর স্বাধীন সম্মতির প্রয়োজন ছিল। আবার কুমারীত্বকেও যে খ্রীষ্টধর্মে কী অতুলনীয় শ্রদ্ধার আসনে স্থান দেওয়া হয়, তাও এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে

---

১ Oroton-এর নারীদের প্রতি এক পত্রে উল্লিখিত; Diog. Laert vita pyth; 8.1.10.

২ ঐ; V (J. E. Harrison কৃত Prolegomena to the study of Greek Religion গ্রন্থের ৬৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৩ দ্রষ্টব্য—A. J. Festugiere : Contemplation at vie Contemplative selon Platon, ৫ম পৃঃ "খ্রীষ্ট প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন এক প্রাচীনতর পদ্ধতিরই পুনর্জীবন দান করেছিল—তার কাঠামো খুঁজতে গেলে প্লেটো পর্যন্ত যেতে হয়। যখন ধর্মযাজকেরা তাঁদের mystique সম্বন্ধে ভাবেন, তখন প্লেটোর মতেই ভাবেন।"

যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে বর্ণিত নারী নিজেও ছিলেন একজন কুমারী। সেইজন্যে যখন এইসব উচ্চস্তরের বাস্তব সত্যের দার্শনিক ভাষ্য রচনা প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছিল তখন শতাব্দীব্যাপী অনুশীলনে গঠিত প্লেটোপন্থী গ্রীক-ঐতিহ্য অযোগ্য আধার বলে বিবেচিত হয়নি। এটা প্রায় সেইরকমই যেমন 'নাজারেথের কুমারী' 'মেরী' তাঁর কুমারীসত্তা দিয়ে নিজেও তাঁর স্বকীয় দেহে ঐ ধর্মের প্রবর্তক যীশুর জন্যে একটি আধার সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া ধর্মশাস্ত্রের বিবরণ থেকে জানা যায়, খৃীষ্টের নরদেহের জীবন ও কর্মের শেষ অধ্যায়ে অন্য কয়েকজন নারীরও নিশ্চিত অবদান ছিল।

প্রারম্ভের এই ঐতিহ্য থেকে এটা সহজেই আশা করা যায় যে, খৃীষ্টীয় গির্জার ইতিহাসে সর্বদেশেই ধর্মশীলা নারীর ভাস্বর মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এবং এই সব নারীর বেশীর ভাগই যে কুমারীত্বের দুর্লভ মহিমায় দীপ্তিময়ী হ'য়ে উঠবেন, তাও স্পষ্ট বোঝা যায়। কাজেই এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, খৃীষ্টীয় গির্জা চিরদিনের মতো এখনো এইসব ভাস্বর চরিত্রের নারীদের উচ্চ মর্যাদায় শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে এবং তার অনুবর্তীদের বলে, এঁদের চরিত্র অনুধাবন ক'রে নিজেরা যাতে উন্নত হয় ও এঁদের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

এই ধরণের শ্রদ্ধার অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এসেছে এই থেকে যে, গির্জা স্বীকার করে—ঈশ্বরের মহিমময় সৃষ্টির একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে—সেজন্যে প্রতিটি শক্তির 'ব্যক্তিত্বে'র মহিমাও গির্জার দ্বারা স্বীকৃত। এ শ্রদ্ধা মানবজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু খর্বতা তুচ্ছতা—যা জীবনধারণের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী—সে সবকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ এখানে স্ত্রীপুরুষের কোনো পার্থক্যের কথা ওঠে না। আর শুধু তাই নয়, তার চেয়েও বেশী। কারণ প্রারম্ভের যে পরিস্থিতির কথা আগে বলা হ'য়েছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের নরদেহ গ্রহণ, তার কথা মনে রাখলে বোঝা যায়, নারীর প্রতিই গির্জার যেন বেশী পক্ষপাত। কেন না, একজন নারীকেই তো ঈশ্বর তাঁর নরদেহ গ্রহণের উপযুক্ত সেই "অগ্নিময় বিন্দু" হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন—সেই নারীর মাহাত্ম্যেই তো ঈশ্বর হ'য়েছিলেন মানুষ!

ফলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই খৃীষ্টীয় গির্জার বিধান ছিল যে, যে সব নারী তাঁদের স্বাধিকার প্রয়োগ ক'রে বিশেষরূপে দীক্ষিত হ'য়ে গভীরতর ধর্ম-জীবনের অনুশীলন করতে চাইবেন, তাঁদের সাদরে গ্রহণ করা হবে। সেইজন্যে সন্ন্যাসীদের মঠের মতো ক্রমে নারীদের জন্যেও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমদিকে খৃীষ্টান নারীদের বেশীর ভাগ অখৃীষ্টানদের মতোই বিবাহ ও মাতৃত্বের

সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এমন নারীর উদ্ভব ঘটতে লাগল, যাঁরা অন্যরকম জীবন চাইতেন। গির্জা এঁদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিল যে, তাঁরা নিজের পরিবারের মধ্যে বাস করেই কুমারীত্বের ব্রত পালন করবে।[১] কারণ তখন ছিল অত্যাচার ও উৎপীড়নের যুগ। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন কমে এলে গির্জা প্রকাশ্যভাবে কাজ করার প্রতিষ্ঠা পেল। তখন অন্য অনেক কর্মতৎপরতার মধ্যে পুরুষদের মঠের মতোই ব্যাপক ভিত্তিতে নারীদের জন্যেও মঠ স্থাপন করা হল। নির্জন শান্তির মধ্যে পূর্ণতরভাবে অধ্যাত্ম-জীবনের অনুশীলন করা সম্ভব হবে এই ছিল মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য।

প্রথমে যে কোথায়, কবে, কার দ্বারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'য়েছিল তা অবশ্য জানা যায় না। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। যথা—(ক) মধ্য মিশরে ২৭১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট এণ্টনী দি হার্মিটের ভগ্নী (নাম অজ্ঞাত) এর প্রতিষ্ঠাত্রী; (খ) আলেকজান্দ্রিয়ায় মধ্য—চতুর্থ শতাব্দীতে সেণ্ট সিন্‌ক্লেটিকা এর প্রতিষ্ঠাত্রী; (গ) আনাতোলিয়ার এনেসি নামক স্থানে ৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে সেণ্ট ম্যাক্রিনা এর প্রতিষ্ঠাত্রী; অথবা (ঘ) বেথ্‌লেহেম্‌-এ ৩৮৮—৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট জেরোমের বন্ধু ও শিষ্য সেণ্ট পালা ও ইউস্টোচিয়াস এর প্রতিষ্ঠাত্রী।

স্থাপিত হওয়ার পর থেকে গির্জার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসিনীদের মঠও ক্রমবিস্তার লাভ করতে থাকে। সন্ন্যাসীদের মঠের সঙ্গে এই মঠগুলির মর্যাদা ও প্রসারে কোনো পার্থক্য ছিল না। এসব মঠে সন্ন্যাসিনীদের দীক্ষা এবং জীবন-ইতিহাস ও অন্যান্য দলিলপত্র দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় তাঁদের অধ্যাত্ম অগ্রগতি হত খুবই উচ্চস্তরের। এঁদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনের বিষয়েই পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বলা সম্ভব হ'য়েছে। তা সত্ত্বেও সেণ্ট টেরেসা এবং এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাডেগুণ্ড অব পোইটিয়ার্স; সপ্তম শতাব্দীতে সেণ্ট ওয়েবর্গ, সেণ্ট এথেলড্রেডা, সেণ্ট এথেলবার্গা, সেণ্ট হিল্‌ডা; দ্বাদশ শতাব্দীতে সেণ্ট হিলডেলার্ড অব্‌ বিঞ্জেন; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেণ্ট ক্লেয়ার

---

১ যে সব প্রাচীন খ্রীষ্টান লেখক ও ধর্মযাজক কুমারীত্বের বন্দনা করে নিবন্ধ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য—Atherzagoras (২য় শতাব্দী); Tertullian, Mirzucius Felix এবং St. Cyprian (৩য় শতাব্দী); St. Methodius of Olyumpus, St. Athanasius, Basil of Arzeyria, St. Gregory of Nyssa, St. Jerome, St. Ambrose (৪র্থ শতাব্দী); St. Augustine (৫ম শতাব্দী)। শেষোক্ত দুইজন কুমারীত্বের ব্রত বিশেষভাবে সমর্থন করে গেছেন।

(সেণ্ট ফ্রান্সিসের সঙ্গী); চতুর্দশ শতাব্দীতে সেণ্ট ব্রিজিড অব সুইডেন; পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেণ্ট ফ্রান্সেস অব্ রোম, সেণ্ট কোলেট ও ফ্রান্সেস অব্ ব্রিটানী, সেণ্ট ক্যাথারিন অব্ বোলোনা; সপ্তদশ শতাব্দীতে সেণ্ট মেরী ম্যাগডালেন ডিপাৎসি, সেণ্ট জেন—ফ্রাঁসয় দ্য শাঁতাল এবং মেরী দ্যলা ইনকারনেশান (মাদাম আকারি)। এঁদের অনেকেই (যথা সেণ্ট কোলেট, সেণ্ট ক্যাথারিন অব্ বোলোনা এবং শেষোক্ত তিনজন) উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

এছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে যাঁদের নাম মনে আসে তাঁদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য—সেণ্ট জেনে ভিয়েভ (প্যারিস), সেণ্ট ক্যাথারিন অব্ জেনোয়া, সেণ্ট রোজ অব্ লিমা এবং সেই বিস্ময়কর 'অধ্যাত্ম আবির্ভাব,' যাঁকে সেণ্ট জোন দ্য আর্ক বলা হয়। (তাঁর মধ্যে কুমারী সত্তা এমন মহানভাবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল যে তাঁর অধীনস্থ সৈন্যগণ সকলের কাছেই তিনি "দি মেড্" বা "কুমারী" নামে পরিচিতা ছিলেন।)

অবশ্য কেবল যে নির্জনবাস বা মঠবাসিনীর দীক্ষিত জীবনেই খ্রীষ্টান নারীগণ অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন তা নয়। খ্রীষ্টীয় গির্জা ব্যক্তি-আত্মার স্বাধিকার স্বীকার ক'রে বিবাহকে অন্যতম সংস্কার হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং তার ফলে এই বহু-আচরিত বিবাহের পথেও যে ঠিক সেই একই স্তরের অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ করা যায় তা স্বীকার করেছে। বিবাহকে ব্যক্তির জীবনে অন্যতম সংস্কার হিসাবে গ্রহণ করার ফলে নারীগণ আর স্বামীদের সম্পত্তি, এমন কি অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে সত্তাহীন বলে বিবেচিত হন না। নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় বিবাহ করার ফলে নারী যে কতকগুলি বাস্তব দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা ঠিক, এবং হয়তো প্রথমে সেই দায়িত্বের গুরুত্ব তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠাই কঠিন হয়। তবু বিবাহিতা নারী যদি অধ্যাত্ম সিদ্ধির দিকে উন্মুখ হন তবে তাঁর সমস্যা কুমারী ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীদের সমস্যার চেয়ে অনেক সরল হ'য়ে থাকে। সে যাই হোক, গির্জার ইতিহাসে দেখা যায় ধর্মশীলা বিবাহিতা নারীর সংখ্যাও কম নয়। বিবাহিতা হ'য়েও যাঁরা পুণ্যাত্মা বলে খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ—জার্মানীর সম্রাজ্ঞী সেণ্ট মেকটিলডিস্; স্কটল্যাণ্ডের রাণী সেণ্ট মার্গারেট; ফ্রান্সের রাণী সেণ্ট ব্লাঁশে অব কাস্তিল (ইনি সেণ্ট লুই-য়ের জননী); পোর্তুগালের রাণী সেণ্ট এলিজাবেথ (অথবা ইসাবেল); হাঙ্গেরীর রাণী সেণ্ট এলিজাবেথ; পোল্যাণ্ডের সেণ্ট হেজউইল (অথবা জাজুইল)। এছাড়াও সাধারণ নারীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্নামারিয়া টাইগি, যিনি পরে সেণ্ট জেন

ন্য শাঁতাল নামে পরিচিতা হ'য়েছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার আগে ইনি পত্নী ও জননীরূপে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। ইনি এবং বার্বে আকারি মঠবাসিনীর জীবনে আসার আগেই তাঁদের গার্হস্থ্য জীবনেই ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন। সেণ্ট ক্যাথারিন অব জেনোয়া তাঁর যুগের তো বটেই অন্য যে কোনো যুগের পক্ষেই একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মশীলা নারী ছিলেন। তিনি দাম্পত্য জীবনে প্রথমে খুবই অসুখী ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর স্বামীর স্বভাবে আমূল পরিবর্তন তিনি দেখে যেতে পেরেছেন।

অবশ্য ব্যতিক্রম যে কিছু নেই তা নয়। সেজন্যে বিবাহরূপ সংস্কারের বিষয়ে গির্জার নীতিপদ্ধতি কী, তার কিছুটা আলোচনা করা দরকার। গির্জার শিক্ষা এই যে, বিবাহ-বন্ধনের আগা-গোড়াই এক পবিত্র ধর্মগত 'সংস্কারে'র আভায় উদ্ভাসিত। সন্তান জন্ম এবং সন্তান জন্মের জন্যে নরনারীর দৈহিক মিলন সেই-জন্যে একই কল্যাণকর সংস্কারের মধ্যে বিধৃত। আর সেইজন্যেই গির্জা তার অনুবর্তী নরনারীর বেশীর ভাগের পক্ষেই বিবাহ বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে কার্য-করী করতে বলে। তবু, এসব সত্ত্বেও, খ্রীষ্টান গির্জার মত এই যে, বিবাহরূপ সংস্কারের প্রকৃত সত্তা কেবল দৈহিক আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গির্জা এই কথাই বলে যে, বিবাহরূপ সংস্কার হল এমন একটি অবস্থা যেখানে দুটি নরনারী তাদের স্বাধীন ইচ্ছার বশে পরস্পরের জীবনসঙ্গী হিসাবে একটি প্রেমময় সম্পর্ক স্বীকার করে নেয়, এবং সেই বন্ধনের মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক থাকতেও পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। এইজন্যে গির্জা অনেকক্ষেত্রে, বিবাহ-রূপ সংস্কারের পূর্ণ উদ্‌যাপনের জন্যে যৌন সংসর্গ দরকার, এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সেণ্ট অ্যাকুইনাসের মতের সঙ্গে একমত হ'য়ে গির্জা বরং বিবাহ সম্পর্কে বিপরীত কথাই বলেছে। বাস্তবিক, এ রকম না হবেই বা কেন? যীশুখ্রীষ্ট একজন কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা স্বীকার করার পর গির্জাকে স্বীকার করতেই হয়, পুণ্যময়ী মাতা মেরী এবং সেণ্ট যোসেফের সম্পর্কের মাধুর্য দৈহিক সম্পর্কের মধ্যে না খুঁজে অন্যত্র খুঁজতে হবে—কারণ—এঁদের মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেইজন্যে খ্রীষ্টধর্মের পুণ্যবান ব্যক্তিদের তালিকায় এমন দম্পতির অভাব দেখা যায় না, যাঁরা উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে নিজেদের দাম্পত্য বন্ধনকেও অনুরূপভাবে গ্রহণ করেছেন; এবং যেহেতু তাঁরা আজীবন কৌমার্যের সঙ্গে বাস করবেন এটা আগেই স্থির ক'রে নিয়েছেন, সেজন্যে বিবাহের সময়েই তাঁরা কৌমার্যকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হ'য়েছেন। কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

যথা—একাদশ শতাব্দীতে "হোলি রোমান এম্পায়ারে"র সম্রাট দ্বিতীয় সেণ্ট হেনরী ও সম্রাজ্ঞী সেণ্ট কানেগাণ্ডা, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পোল্যাণ্ডের রাজা বোল্স্ল ('দি চেষ্ট' নামে অভিহিত) এবং রাণী কানেগাণ্ড; চতুর্দশ শতাব্দীতে আরিয়ানোর কাউণ্ট সেণ্ট এল্জিয়ার দ্য সাব্রান এবং ডেনফিন দ্য গ্ল্যাণ্ডিয়েড দ্য পায়—মিচেল; তাছাড়া ঐ শতাব্দীতেই সুইডেনের রাজকুমারী (সুইডেনের সেণ্ট ব্রিজিডের কন্যা), সেণ্ট ক্যাথারিণ এবং এগগার্ট লাইডারসেন দ্য কাইরেন; এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে করবারা-র অ্যাঞ্জেলিনা এবং সিভিটেলার কাউণ্ট।

আশা করা যায়, খ্রীষ্টীয় গির্জার আত্মবিকাশের ইতিহাসে নারীর স্থান কতো উচ্চস্থান অধিকার করে আছে, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে।

উনবিংশ অধ্যায়

ম্যাক্রিনা

সর্বজনমান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে যেভাবে ‘সাধক’ বলে গ্রহণ করা হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় সে রকম সাধকের অভ্যুদয় ঘটে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের পর। গ্রীক এবং রোমান-গার্হস্থ্য জীবন বহুদিক দিয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ হলেও নারীদের এমন সুযোগ-সুবিধা দিত না যাতে তাঁরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন ক'রে সমাজে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। অবশ্য এ রীতির কভকগুলি সুস্পষ্ট ব্যতিক্রমও ছিল। যেমন, পেরিক্লিসের প্রেয়সী আস্পাসিয়া নিজের রসবৈদগ্ধ্য ও বুদ্ধির দ্বারা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে এথেন্সের সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু আস্পাসিয়ার ব্যক্তিত্ব সুসংহত ও সুপরিণত হলেও তিনি ধর্মসাধিকা ছিলেন না। এথেন্সবাসীগণ তাঁদের নারীদের সংসার সীমাতেই আবদ্ধ রাখতেন। এবং পেরিক্লিস নিজেই একবার বলেছিলেন যে, নারীদের পক্ষে সব থেকে ভালো কাজ হল তাঁদের সুনামকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে না দেওয়া। স্পার্টাতে নারীদের পুরুষের সঙ্গেই সমাধিকার দেওয়া হত। কিন্তু তাঁদের উপর দায়িত্ব ছিল তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের কঠোর, এমন কি বর্বর ধরনের নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেন। কাজেই নারীদের সম্বন্ধে স্পার্টাবাসীদের ধারণা ছিল এই রকম যে, নারী হবেন এমন কঠোর জননী যিনি তাঁর পুত্রকে বলবেন, হয় সে যুদ্ধ জয় করে ঢাল-হাতে ফিরে আসবে, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে ঢালের উপর শুয়ে ফিরে আসবে। রোমান-দের আদর্শ নারীও ছিল এরই নামান্তর। নারীগণ হয় গ্রাক্চির জননী কর্ণেলিয়ার মতো উদ্ধত প্রকৃতির শৃঙ্খলা-রক্ষয়িত্রী হতেন, অথবা হতেন বিবর্ণ সাধারণ একজন কেউ, কিংবা ক্রীতদাসী, অথবা সিসারোর শত্রু ক্লডিয়াসের, (ক্যাটুলাসের গীতি কবিতার লেসবিয়া)—ভগ্নী ক্লডিয়ার মতো চতুরা সমাজপরিত্যক্ত নাগরী স্ত্রীলোক।

তা সত্ত্বেও গ্রীক এবং রোমান সাহিত্যে মাঝে মাঝে আমরা এমন নারীর সাক্ষাৎ পাই যাঁদের সাধিকাসুলভ অনেক গুণ ছিল। তাঁরা শান্ত ও ভক্তিপূর্ণভাবে জীবন-যাপন করতেন এবং খ্যাতির মুখাপেক্ষী না হয়ে বহু কিছু সহ্য করে গেছেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি প্রবচন আছে, তাতে মর্মান্তিক সংক্ষিপ্ততার সঙ্গে ভালো ঘরনীর বিষয়ে বলা হয়েছে—“সে ঘর সংসার দেখত,

সে চরকা কাটত। আমি কথা বলেছি। বিদায়!" শতাব্দীর পর শতাব্দীর ওপার থেকে এই শান্ত ভক্তির ক্ষণিক আভাস উদ্ভাসিত হয় আমাদের চোখের সামনে, যখন আমরা দেখি—হোমারের পেনেলোপির চরিত্র, বা আন্টিগোনের ভগ্নী ইস্‌মেনের চরিত্র। এবং আগাস্টাসের সময়কার একটি লাটিন উদ্ধৃতিতেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাতে সমাধি প্রস্তরে লেখা এক দীর্ঘ কবিতায় ভেস্পিলো নামে এক মৃতদার ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী তুরিয়ার বিষয়ে বলেছেন যে, তুরিয়ার কোনো সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় তিনি স্বামীকে সন্তানলাভের জন্যে আরেকটি স্ত্রী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন; তিনি জানিয়েছিলেন, ঐ বিবাহের সন্তানদের তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসবেন; সংসারে তিনি তাঁর নিজের স্থান এই নবপরিণীতাকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রীধন-সম্পত্তিও তাঁকে ভাগ ক'রে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ভেস্পিলো আরো বলেছেন যে, এই অনুরোধ তিনি সভয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, বরং তিনি আগে মারা গিয়ে তুরিয়া তাঁর পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করুন এই তিনি চান। কিন্তু হায়, তুরিয়া আজ আর নেই, তিনি একা।

সেণ্ট ম্যাক্রিনার জীবন এই স্তরের ভক্তি ও সাধিকা-সুলভ আত্মসমর্পণের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু খ্রীষ্টান জগতের সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ প্রচারিত হওয়ার ফলে এই আত্ম-সমর্পণের ধারাটি অন্য খাতে প্রবাহিত হ'য়েছিল। তাঁর নামের অর্থ হল "কল্যাণী"। গ্রীক রীতি অনুযায়ী তাঁর পিতামহীর নাম অনুসারেই এভাবে তাঁর নাম রাখা হয়। তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের একমাত্র উৎস হল তাঁর ভ্রাতা গ্রেগোরি অব নীসার এক চিঠি। আণ্টিওকের অলিম্পিয়াস নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে লিখিত এই চিঠিতে গ্রেগোরি তাঁর ভগ্নীর জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এ ধরনের অন্য আরো বহু জীবনীর মতোই এই জীবন কাহিনীও রচনার দিক থেকে ভারসাম্যহীন; এতে ম্যাক্রিনার জীবন সম্বন্ধে বিরক্তিকর ভাবে কম সংবাদ দিয়ে তাঁর মৃত্যু এবং শেষকৃত্যের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা প্রায় সেইরকমই, যেমন ঘটেছে যীশুর ক্ষেত্রে। তাঁর বিচার এবং মৃত্যুর বর্ণনাই প্রত্যেক সুসমাচার গ্রন্থের অধিকস্থান জুড়ে আছে, তাঁর জীবনের বিষয়ে অন্যান্য যেসব খবর জানার জন্যে আমরা সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলাম সে সব বিষয়ে কোনো কথাই বলে না। যাই হোক, গ্রেগোরি রচিত তাঁর ভগ্নীর জীবনীটি ডব্লু, কে, লাউদার ক্লার্ক, বি, ডি কর্তৃক অনূদিত হ'য়ে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এস, পি, সি, কে—কর্তৃক প্রকাশিত হ'য়েছে।

গ্রেগোরি অব নীসা জন্মগ্রহণ করেন ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। সম্ভবত কাপাডোমিয়ার অন্তর্গত সীজারিয়াতে তাঁর জন্ম হ'য়েছিল। তাঁদের দশজন ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে ম্যাক্রিনা ছিলেন জ্যেষ্ঠা, এবং গ্রেগোরি ছিলেন কনিষ্ঠ দুজনের মধ্যে একজন। কাজেই সম্ভবত ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ম্যাক্রিনা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। ভ্রাতাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন সেন্ট বেসিল দি গ্রেট, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিটার হয়েছিলেন সেবাস্টের বিশপ। একটি পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক কৃতিত্বের পরিচায়ক বটে! পরিবারটির অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই ছিল, সংসার চলত জমিদারীর আয়ে এবং এই পরিবারটি খ্রীষ্টানও হ'য়েছিল অন্তত দুইপুরুষ আগে। কারণ একটি উল্লেখ থেকে জানা যায়, ম্যাক্রিনার পিতামহী, যাঁর নামও ছিল ম্যাক্রিনা, তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসের জন্যে বহু উৎপীড়ন সহ্য করেছেন—বলা হ'য়েছে "উৎপীড়নের সময় তিনি খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার কথা বলেছেন প্রায় 'ব্যায়ামবীরে'র মতো সজোরে।"[১] গ্রেগোরির মাতা ছিলেন অসামান্যা রূপবতী নারী। কুমারী জীবনের দিকে তাঁর আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর বহু পাণিপ্রার্থীর মধ্যে কেউ না কেউ তাঁকে অপহরণ করতে পারে এই আশংকা থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্যে বিবাহে সম্মত হ'য়েছিলেন।

ঐ যুগের খ্রীষ্টান জগতে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি আকর্ষণের পরিমাণ বুঝতে গেলে আরো কতকগুলি ব্যাপার জানা দরকার। যীশুর নিজের জীবনেই ব্রহ্মচর্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। 'নীতিবাদে'র[২] মাধ্যমে এই ব্রহ্মচর্য হয়তো বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিল তাছাড়া খ্রীষ্টধর্মের বৈরাগ্য ভাবের জন্যেও ইহজগতের সম্বন্ধে অবজ্ঞার মনোভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গভীরতর কারণ বোধহয় মানুষের এই দৃঢ়মূল বিশ্বাস যে, দেহ ও দেহসঞ্জাত কামনা বাসনা এবং বাহ্য জগতের মায়া-প্রহেলিকাকে দমন করে অথবা সংযত রেখেই সত্যকার আত্মিক জীবন লাভ করা যায়। উপনিষদ ও বুদ্ধদেবের মূলগত নীতিও এইটেই। প্লেটো মনে করেন, আত্মার প্রকৃত সুখ উদ্ভূত হয় তখনই যখন কামনা বাসনাকে দমিত করে শান্ত রাখা যায়, অর্থাৎ দেহ যখন সব থেকে বিকারহীন অবস্থায় থাকে। এই শুভবুদ্ধি সর্বদাই পাশ্চাত্যের সন্ন্যাসধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মূলকেন্দ্র ও প্রেরণার উৎস ঈজিপ্টে। সেখানে

---

১ ৯৬২-'এ' (উল্লেখটা পাওয়া যায় গ্রেগোরির বর্ণনায়। দ্রষ্টব্যঃ Migne's Patrologia Graceia, XLVI. P. 960 f.f.)

২ এবিষয়ে আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য আলবার্ট শুইউজার, The Queser of the Historical Jesus ১৭শ অধ্যায় (১৯০৬ সংস্করণ)।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে লিখিত সেণ্ট জনের সুসমাচারের অংশবিশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় জানা গেছে সেই অতোকাল আগেই সেখানে খ্রীষ্টানদের মঠ ছিল।[১]

মঠস্থাপনের দুটি পর্যায় ছিল ঃ প্রথমে ছিলেন 'নির্জনবাসী' অথবা "মরুভূমির মানুষগণ," যাঁদের মধ্যে থিবিস-এর পল ছিলেন প্রথম। তারপর হল সম্প্রদায় বা "সিনোরিয়া" গঠন—আর সেই সময় অ্যাণ্টনীই[২] (২৫০—৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন প্রথম যিনি নিজের শিষ্যদের একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ করেন। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের সম্প্রদায়-গঠন সম্পূর্ণ করেন সেণ্ট পাখোম বা পাকোমিয়াস (মৃত্যু, আনুমানিক ৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দ), তিনি তাঁর অনুরাগী শিষ্যদের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় সংগঠিত করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের সকলেই কোনো না কোনো শিল্পবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এটা হল সন্ন্যাসধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ। এর ফলে জগতে অনেক বৃহৎ মঙ্গলকার্য সাধিত হয়েছে। আর এই ধরনের দৈহিক শ্রম ও তপস্যার জীবন প্রাচ্যেও প্রভূতভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। বুদ্ধদেবের আদর্শ ঠিক এতো বাস্তবপন্থী ছিল না, কারণ তিনি পূর্ণ দারিদ্র্য গ্রহণ করতেই উপদেশ দিতেন। কিন্তু জাপানের 'জেন' বৌদ্ধগণ কর্মের সঙ্গে তপস্যার ভার-সাম্যের উপর জোর দিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে পাখোমের পথই গ্রহণ করেছেন্। অধ্যাপক ডি. টি. সুজুকি বলেন, "সমস্ত প্রার্থনা গৃহেই সন্ন্যাসীদের জীবন-কর্মকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই কর্ম অত্যন্তই বাস্তবপন্থী এবং প্রধানত এতে কায়িক শ্রমেরই আধিক্য—যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা, রান্না করা, জ্বালানী সংগ্রহ করা, মাঠে চাষ করা বা গ্রাম থেকে গ্রামে ভিক্ষা সংগ্রহ করে ফেরা। কোনো কাজকেই এ'রা অমর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করেন না। এ'দের মধ্যে সুন্দর একটি ভ্রাতৃত্ববোধ ও গণতান্ত্রিক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে কোনো কাজকে যতো কঠিন, যতো নীচু বলেই মনে করা হোক না কেন, এ'রা তাতে পিছপা হন না।"[৩]

---

১ সুসমাচারের এই অংশটি ম্যাঞ্চেস্টারে রাইল্যান্ড লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। (Ryl. Pap. 457)। New Testament-এর যে অংশগুলি এখনো আছে তার মধ্যে এইটেই প্রাচীনতম।

২ দ্রষ্টব্য এই প্রবন্ধটি—The Captive Church and Egyptian Quonasticism, by De Lacy O' Leary, in the Legacy of the Egypt (ed. S. R. K. Glanville), Ph. 317-31.

৩ D. T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, Vol. I, p. 304.

তাঁদের একটি প্রিয় প্রবচন হল, "যেদিন কাজ করা হবে না সেদিন খাওয়াও চলবে না।" এরপর অধ্যাপক সুজুকি মন্তব্য করেছেন, "হাতকে যদি না মস্তিষ্কের কাজকে বাস্তবরূপায়িত করতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তবে রক্ত শরীরের মধ্যে সমভাবে সঞ্চালিত হতে পারে না, কোথাও কোথাও বিশেষভাবে মস্তিষ্কের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়তে থাকে। ফলে কেবল যে শরীরেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হ'য়ে যাবে তা নয়, মনেরও তামসিক ভাব ও জড়ত্ব দেখা দেবে। তখন চিন্তাগুলো হবে এলোমেলো, হাওয়ায় ভাসমান মেঘের মতো। তখন সম্পূর্ণ জেগে থাকার অবস্থাতেও মন আজগুবি চিন্তা ও দুঃস্বপ্নে ভরে ওঠে, যার কোনো বাস্তব ভিত্তিই থাকে না।[১] এ বিপদের বিষয়ে ব্রাদার লরেন্স প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ খুবই সচেতন ছিলেন। আর পণ্ডিতবর একহার্টও বলেছেন, "ধ্যানের দ্বারা যা মানুষ গ্রহণ করে প্রেমের ভিতর দিয়ে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।"

বহুকাল পর্যন্ত ঈজিপ্ট অজস্র তপস্বী সন্ন্যাসীর লীলাক্ষেত্র হিসাবে প্যালেষ্টাইনের চেয়েও বেশী পুণ্য স্থান হিসাবে পরিগণিত ছিল। ভূমধ্য-সাগরোপকূলের সব দিক থেকেই খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীগণ ঐ তপস্বীদের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ঈজিপ্টে যেতেন। এই দর্শন প্রার্থীদের মধ্যে গ্রেগোরি অব নীসার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ম্যাক্রিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেণ্ট বেসিলও ছিলেন অন্যতম। তিনি পাখোম প্রবর্তিত কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা পান এবং পণ্টাসে নিজেদের জমিদারীর কাছে ঐরকম একটি ছোট সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করবেন বলে স্থির করেন। এই কাজে তিনি তাঁর বন্ধু গ্রেগোরি অব নাজিয়ান্‌জাস্‌কে ডেকে পাঠান, এবং এইভাবে গ্রীক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটল। ইরিস নদীর অপর পারে তাঁদের জমিদারীর মধ্যে বাস ক'রে বেসিলের মাতা এমেলিয়া এবং ভগ্নী ম্যাক্রিনা আগেই তাপসীর জীবনের দিকে যথেষ্ট আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। ফলে অচিরেই সেখানে একটি যুগ্ম মঠের স্থাপনা হয়—তার পুরুষদের অংশের অধ্যক্ষ হন ম্যাক্রিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিটার, এবং নারীদের অংশের প্রধানা হন ম্যাক্রিনা স্বয়ং। ব্রাদার গ্রেগোরি তাঁর ভ্রাতা বেসিল কর্তৃক তাঁর বিশপগিরির স্থান নীসাতে আহূত হওয়ার আগে এইখানেই নির্জন জ্ঞানানুশীলনে কালাতিপাত করেছিলেন। বেসিল ৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এর পরেই গ্রেগোরি অ্যাণ্টিঅকে একটি কাউন্সিলের সমাবেশে যোগ দেন। এবং অনতিবিলম্বে ম্যাক্রিনার মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

---

১ D. T. Suzuki, Essays in Zen Buddhism, Vol. I, p. 302.

তিনি যখন সেখানে ছিলেন সেই সময় ম্যাক্রিনা লোকান্তরিতা হন। গ্রেগোরি সন্ন্যাসী অলিম্পিয়াসকে চিঠি লেখার ভনিতায় ম্যাক্রিনার একটি জীবনালেখ্য রচনা করেন।

প্রাচীনকালের অনেক জীবনচরিতের মতোই গ্রেগোরির এই সংক্ষিপ্ত বিবরণীও শিল্পকর্মের সমস্ত সংজ্ঞা উপেক্ষা করেছে। এতে অসম-অনুপাতে ম্যাক্রিনার মৃত্যুকে বেশী জায়গা দেওয়া হয়েছে (মৃত্যুশয্যার দৃশ্য বরাবরই খ্রীষ্টান লেখকদের বেশী ফেনিয়ে লিখতে প্রলুব্ধ করেছে), এবং ম্যাক্রিনার প্রথম জীবনের বিশদ বিবরণের পরিবর্তে ভাষার বর্ণচ্ছটায় সব ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এই জীবনীতে এমন একজন নারীর সাক্ষাৎ পাই যাঁর চরিত্র কঠোর অথচ কোমল, দৃঢ় অথচ রূঢ় নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিপ্রখর—অর্থাৎ নারীত্বের যা সর্বোচ্চ আদর্শ তাই। এসব আমরা জানতে পারি পরোক্ষ উল্লেখ থেকে। যেমন, গ্রেগোরি বলেছেন, ম্যাক্রিনা "দর্শনে"র দ্বারা মানবিক গুণাবলীর উচ্চতম শিখরে উন্নীত করেছিলেন নিজেকে।[১] বেদান্তের অনুশীলকের কাছে এই "দর্শন" কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চতুর্থ শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্মের বাণী ছিল এই যে, শুধু বুদ্ধির দ্বারা সত্যকে লাভ করা যায় না, সত্যকে জানার জন্যে দরকার শান্তচিত্তে ধ্যানযোগ, যার ফলে বুদ্ধির অগম্য বিরাটতর সত্যের বিষয়ে উপলব্ধি ঘটে। এটা তখন সম্ভব হয়েছিল সুসমাচারের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের যে সমন্বয় ওরিগেণ করেছিলেন তার ফলে এবং বিশেষ করে হিন্দু চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ তপস্যার আদর্শটি খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যেই জন্মলাভ করায়। দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনার প্রারম্ভ হিসাবে এই যোগাভ্যাসের উপদেশকেই সুনিয়ন্ত্রিত সুন্দর জীবন-যাপনের পক্ষে ভারতবর্ষের বিশেষ অবদান বলা যেতে পারে। এবং এখানে, এই চতুর্থ শতাব্দীর গ্রীক জগতেও 'দর্শন' কথাটিকে আমরা ঠিক অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হ'তে দেখি।

ম্যাক্রিনার জন্মের পরে এক দৈবদর্শনে জনৈক দেবদূত উপস্থিত হ'য়ে শিশুটিকে থেক্‌লা বলে আহ্বান করেন। থেক্‌লা হলেন সেই কুমারী যিনি পৌরাণিক মতে সেণ্ট পলের সমসাময়িক। ('আক্টস্ অব পল এণ্ড থেক্‌লা' বইখানা এ জাতীয় সমস্ত গ্রন্থের চাইতেই বেশী প্রামাণিক)। এর দ্বারা এই বোঝা গিয়েছিল যে শিশুটি কুমারী জীবন যাপন করবে। তাছাড়া তার মাতা অসাধারণ সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও "পবিত্র এবং অকলঙ্ক জীবন এত পছন্দ করতেন

---

১ 960 C

যে তিনি বিবাহ করতে রাজি ছিলেন না।"[১] শিশুকাল থেকেই ম্যাক্রিনাকে তাঁর মাতা সযত্নে শিক্ষাদীক্ষা দিতেন। কারণ তিনি মনে করতেন ম্যাক্রিনার মতো সুকুমারমতি বালিকার পক্ষে সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি "অমার্জনীয় ও অব্যবহার্য"। ঐ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত গ্রীক শিক্ষা প্রণালীর মতোই গঠিত হত কাব্যপাঠের দ্বারা। তার মধ্যে প্রাধান্য ছিল হোমার এবং বিয়োগান্ত নাটকগুলির। এসব কাব্যে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলির বর্ণনা নারীদের চেয়ে পুরুষের শিক্ষার পক্ষে বেশী উপযোগী। কাজেই এসবের পরিবর্তে ম্যাক্রিনাকে ওল্ড টেষ্টামেন্ট-এর সুসমাচারগুলি, বিশেষভাবে সল্টার শিক্ষা দেওয়া হত। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি ছিল ম্যাক্রিনার সর্বসময়ের সঙ্গী—"যখন তিনি শয্যাত্যাগ করতেন বা সংসারের কাজে হাত লাগাতেন, কিংবা বিশ্রাম করতেন, অথবা আহার করতেন, বা খাওয়া শেষ ক'রে উঠতেন, এবং ঘুমাতে যেতেন অথবা রাত্রিতে প্রার্থনার জন্যে উঠতেন।"[২]

ম্যাক্রিনা একজন আশ্চর্য প্রতিশ্রুতিবান যুবকের বাগ্‌দত্তা হ'য়েছিলেন, কিন্তু বিবাহ হওয়ার আগেই সেই যুবকটির মৃত্যু ঘটে। এরপর তাঁর স্মৃতির প্রতি ম্যাক্রিনার একনিষ্ঠ ভক্তি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় রামকৃষ্ণের প্রতি সারদা দেবীর অবিচল নিষ্ঠা। অবশ্য এই শেষোক্ত ক্ষেত্রের নিষ্ঠা ছিল মানবদেহধারী এক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ম্যাক্রিনার একনিষ্ঠতা ছিল অপরাজেয় এক স্মৃতির প্রতি। "ম্যাক্রিনা মনে করতে লাগলেন, যাঁর সঙ্গে তিনি বাগ্‌দত্তারূপে যুক্ত হ'য়েছিলেন তিনি মারা যাননি, ঈশ্বরের কাছে জীবিত আছেন, তাঁর পুনরুত্থানের আশা আছে, কাজেই তিনি শুধু অনুপস্থিত, মৃত নন; এই বর, যিনি বিদেশে গেছেন, তাঁর প্রতি বিশ্বাস না রাখা অপরাধ।"[৩] এই যুবকটির মৃত্যুর পর ম্যাক্রিনা খুব কমই তাঁর মাতার কাছছাড়া হতেন। এক শান্ত জীবনের মধ্যে নিজেকে সংহত করে নিয়ে তিনি তাঁর মাতার সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে লাগলেন। এবং "তাঁর নিজের জীবন দিয়ে তাঁর মাতাকে তিনি প্রভাবিত করলেন, তিনিও সেই একই লক্ষ্য 'দর্শনে'র দিকে এগিয়ে এলেন, এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণতর অধ্যাত্মজীবনের দিকে আকৃষ্ট হলেন।"[৪] ম্যাক্রিনা তাঁর মাতার জন্যে স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করতেন। অবশ্য একাজকেই তিনি তাঁর প্রধান কাজ বলে গ্রহণ করেননি তাও গ্রেগোরি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন। তিনি রান্না করতেন "ধর্মের অঙ্গীয় উপাসনা ইত্যাদি শেষ ক'রে আচমন করার পর। কেননা তিনি

১ 962 A
২ 964 A
৩ 964 D
৪ 966 B

মনে করতেন, ধর্মকর্মের বিষয়ে তাঁর এই আগ্রহ তাঁর জীবনের আদর্শের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এসব কাজ শেষ করার পর হাতে যে সময় থাকত তাতেই তিনি নিজের যত্নে মাতার জন্যে খাদ্য তৈরী করতেন"। [১]

যখন ম্যাক্রিনার ভ্রাতা বেসিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'য়ে বাগ্মিতার গৌরবে অহম্মন্য হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন নিজের ধারণায় তিনি স্থানীয় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর হলেও, তাঁর উপর ম্যাক্রিনার প্রভাব এতো গভীর হ'য়েছিল যে, "তিনি এ সংসারের সব গৌরব ও বাগ্মিতার খ্যাতি দূরে ফেলে দিয়ে এমন কর্মময় জীবন গ্রহণ করলেন, যাতে মানুষ নিজের হাতে পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়।" [২] ভ্রাতার এই পরিবর্তন বোধহয় এককভাবে বলতে গেলে ম্যাক্রিনার প্রভাবের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা-নিবেদন। তাঁর প্রভাবে তাঁর নিজের ভ্রাতার জীবনই পরিবর্তিত হ'য়ে অন্তঃসৌন্দর্যে সুষমাময় হ'য়ে উঠল। সারদা দেবীর মতো তিনি সেই আশ্চর্য প্রভাবে সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যার বিষয়ে আলবার্ট শ্যুইটজার এই স্মরণীয় কথাগুলি লিখেছেন, "আত্মিক দিক থেকে আমরা সকলেই বেঁচে আছি তারই উপর যা আমরা জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে অন্যের কাছ থেকে পেয়েছি। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলি যে আসছে সে বিষয়ে আগে কোনো ঘোষণা থাকে না, অকস্মাৎ এসে পড়ে। তাদের কোনো চোখধাঁধানো জাঁকজমকও থাকে না, অগোচরেই এরা এসে চলে যায়। বাস্তবিক অনেক সময় তাদের গুরুত্ব আমরা টের পাই তখনই যখন আমরা অতীতে ফিরে তাকাই। ঠিক যেমন কোনো সঙ্গীতের সুর বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য আমাদের নাড়া দেয় প্রথমে তাদের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে। আমরা নম্রতা, বিনয়, দয়া, ক্ষমাশীলতা, সততা, একনিষ্ঠতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয়ে যতোটুকু যা নিজের চরিত্রে পেয়েছি অন্য কোনো না কোনো মানুষের চরিত্রে বা কাজে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে—তা ছোটর মধ্যেই হোক কিংবা বড় ব্যাপারেই হোক। একটি চিন্তা যা কর্মে রূপায়িত হ'য়েছে তা যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো আমাদের ভিতরে ছুটে এসে একটি নতুন শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।" [৩]

পরবর্তী যে ঘটনায় ম্যাক্রিনার চরিত্রবল প্রকটিত হয়েছিল তা হল তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্রেটিয়াসের মৃত্যু। পরিবারের মধ্যে তিনি দৈহিক শক্তি, সৌন্দর্য ও

---

১ 966 A

২ 966 C

৩ Memoirs of Childhood and Youth, pp. 89-90.

দৃঢ়তায় ছিলেন অনন্য, তিনি "সবকিছুতেই হাত লাগাতে পারতেন"। ঋষিকল্প জীবনের দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী, তাই ক্রিসাপিয়াস নামে একজন পরিচারক মাত্র সঙ্গে ক'রে তিনি ইরিস নদীর তীরে এক অতিসুন্দর পার্বত্য স্থানে চলে গিয়েছিলেন। (এতে মনে পড়ে ভারতীয় ঋষিদের কথা, যাঁরা অধ্যাত্ম সাধনার জন্যে সর্বদাই অত্যন্ত সুন্দর স্থান বেছে নিতেন।) নক্রেটিয়াস এবং ক্রিসাপিয়াস দুজনেই মৃত্যুবরণ করেন, "তাঁদের রক্ষণাধীন বৃদ্ধ মানুষদের জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করতে গিয়ে।" এর দ্বারা হয়তো ভিক্ষা করতে যাওয়ার কথাই বোঝানো হ'য়েছে, যেমন যেতেন বুদ্ধদেব এবং প্রাচীন সন্ন্যাসীগণ। আর এটাও লক্ষণীয় যে, তাঁর নির্জনবাসের মধ্যেও নক্রেটিয়াস কয়েকজন দরিদ্র রুগ্ন বৃদ্ধের দায়িত্ব নিজের উপর তুলে নিয়েছিলেন। উচ্চস্তরে অতিন্দ্রীয় সাধনায় ভক্তির আদর্শ সর্বদাই প্রভাব বিস্তার করেছে। এই মর্মান্তিক শোকে ম্যাক্রিনা নিজে যে অত্যন্তই কাতর হ'য়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য, তবু তিনি এর যন্ত্রণা সহ্য করে তাঁর মাতার মনকে এমনভাবে প্রবুদ্ধ করে তুললেন যাতে তিনি দুঃখকে অতিক্রম করে গেলেন অতি সহজে।[১]

এরপর গ্রেগোরির পত্রে আছে তপশ্চর্যায় ম্যাক্রিনা ও তাঁর মাতা কতোদূর অগ্রসর হ'য়েছিলেন, তারই আলেখ্য।[২] তাঁরা তাঁদের পরিচারিকাদের মতোই একরকম সাজসজ্জা করতেন, একই খাদ্য গ্রহণ করতেন, একধরনের মোটা কাপড় পরতেন, একই জাতের বিছানায় শুতেন। "সংযমই ছিল তাঁদের বিলাসিতা, আত্মবিলোপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল গৌরব। দারিদ্র্য এবং ধুলোর মতো সমস্ত বাহুল্যকে ঝেড়ে ফেলাই ছিল তাঁদের সম্পদ। বাস্তবিক, এজীবনে মানুষ যতো কিছুর জন্যে উন্মুখ থাকে, তার কোনো কিছুই তাঁদের কাছে অপরিহার্য ছিল না।" মনে হয় কখনো কখনো তাঁরা দিব্যভাব উপলব্ধি করতেন, যাকে হিন্দুমতে বলে সমাধি; কেননা ঐ পত্রে দেখা যায়, "এই দেহে বাস ক'রেও তাঁরা যেন অতীন্দ্রিয় সত্তা হ'য়ে যেতেন, দেহের ভার তাঁদের আর পীড়িত করত না, তাঁদের আত্মা যেন ঊর্ধ্বাকাশে উদ্‌গতি লাভ করত, আর সেখানে তাঁরা ঐশী শক্তিবর্গের সঙ্গে পরমানন্দে বিচরণ করতেন।"[৩]

এরপর দ্রুতভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে কনিষ্ঠ পিটার, মাতা এবং বেসিলের মৃত্যুর ঘটনা। এইসব একের পর এক মৃত্যুর মধ্যেও ম্যাক্রিনা কীভাবে ঊর্ধ্বে

---

১ 970 B

২ 970 C.

৩ 972 A

উঠে সহিষ্ণুতার জীবন্ত প্রতিমা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা দেখে আমরা বিস্মিত হই। মাতার মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে তাঁর পুত্রকন্যারা শোকসন্তপ্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পত্রে দেখা যায়, "তবু তাঁরা পারলৌকিক কাজ শেষ করার পর আরো দৃঢ়ভাবে 'দর্শন'কে আঁকড়ে ধরলেন; নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে অধ্যাত্মপথে এমন সার্থকতা অর্জন করলেন যাতে তাঁদের পূর্বমহিমা ম্লান হ'য়ে গেল।[১]

বেসিলের মৃত্যুর পর গ্রেগোরি তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কী করে যেন তাঁর মনে হচ্ছিল হয়তো ম্যাক্রিনার স্বাস্থ্য ভালো নেই। তিনি পত্রে উল্লেখ করেছেন, পথে যেতে যেতে তিনি কয়েকবার বিভীষিকা দেখেছিলেন। কিন্তু পত্রে এটা স্পষ্ট করে বলা না হলেও এটা যথেষ্টই মনে হয় যে, ম্যাক্রিনার অসুস্থতা তাঁর শোকতাপেরই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। কেননা দেখা যায়, বাড়ী এসে যখন গ্রেগোরি তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করলেন তখন দেখতে পেলেন ম্যাক্রিনা "ভয়ানক রকম দুর্বল। তিনি বিছানায় বা খাটে শুয়ে নেই, পড়ে আছেন মেঝের উপর। একখানা তক্তার উপর চট বিছিয়ে দেওয়া হ'য়েছে মাত্র, অন্য একটি কাঠ দিয়ে তাঁর মাথা উঁচু করে বালিশের মতো করা হ'য়েছে। তাতে তাঁর ঘাড়ের মাংসপেশী কিছুটা হেলানো অবস্থায় ছিল এবং এর ফলে অনেকটা আরামের সঙ্গে তিনি ঘাড় উঁচু করে থাকতে পারছিলেন। এই অবস্থায় তিনি যখন আমাকে (গ্রেগোরিকে) দেখতে পেলেন, তিনি কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু জ্বরে তাঁকে এমনই দুর্বল ক'রে ফেলেছিল যে দরজা পর্যন্ত এসে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করতে পারলেন না। তিনি মেঝের উপর দুই হাত রেখে ঐ তক্তার বিছানার উপর যতোটা সম্ভব ঝুঁকে বসে আমার পদমর্যাদার অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন।"[২] এইটেই তাঁর ভগ্নীর সম্পর্কে গ্রেগোরির সবচেয়ে তথ্য সমৃদ্ধ বর্ণনা; তাঁর পত্রের বাকী বর্ণনা শোচনীয় রকম সংক্ষিপ্ত এবং অ-নিখুঁত। তার ফলে প্রথাসিদ্ধ বর্ণনা ও অস্পষ্ট আপ্তবাক্যের ভিড়ে আমাদের পথ তৈরী করে চলতে হয়। বলা বাহুল্য তিনি বর্ণনার সূক্ষ্ম-কাজের চেয়ে মোটা দাগের প্রচারমূলক বাগ্মিতায় বেশী পারদর্শী ছিলেন।

ম্যাক্রিনা কাতরোক্তি থামিয়ে তাঁর নিশ্বাসের কষ্ট গোপন করতে চেষ্টা করলেন। তিনিই প্রথমে কথা বলতে শুরু করলেন, এবং বেসিলের মৃত্যুতে গ্রেগোরি খুব মর্মাহত দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তারপর তিনি এমন ভাবে ধর্মালোচনায়

১ 974 B
২ 976 D

ব্যাপৃত হলেন যে গ্রেগোরি বিস্মিত না হ'য়ে পারলেন না। "জ্বরে তাঁর শক্তি শুষে নিয়ে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। তবু তিনি তাঁর দেহকে যেন শিশিরসিঞ্চিত করে শক্তি সংগ্রহ করছিলেন। এইভাবে তাঁর মনকে মুক্ত রেখে পুণ্য চিন্তায় বিভোর হ'য়ে ছিলেন তিনি, তাঁর দৈহিক দুর্বলতা তাঁকে একটুও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। ......আত্মার স্বধর্ম কী এবিষয়ে আলোচনা করতে করতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে তিনি দেহধারণের কারণ, কেন মানুষের সৃষ্টি, কী ভাবে মানুষ নশ্বর, মৃত্যুর উৎপত্তি এবং মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবনে ফিরে আসার প্রকৃতি কী—এইসব বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।"[১] তাঁর এই শোচনীয় অবস্থাতেও তাঁর প্রথম চিন্তা হ'য়েছিল ভ্রাতার এবং ভ্রাতার সঙ্গীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান, এবং তখনি তিনি তাঁদের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর এক সময় তিনি তাঁর বাল্যের কথা বললেন। গ্রেগোরি পত্রে লিখেছেন, "তিনি কখনো কোনো মানুষের কাছে সাহায্য চাননি, আর লোকেরাও সদয় দানের দ্বারা তাঁর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার কোনো ব্যবস্থা করে দেয়নি। প্রার্থনা করলে যে নামঞ্জুর করা হত তা নয়, কিন্তু কখনোই তিনি সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাননি। কিন্তু ঈশ্বরের গোপন আশীর্বাদে তাঁর সৎকাজের ছোট ছোট বীজ ক্রমে বিপুল মহীরূহে বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল।[২] পত্রের পরবর্তী অংশ, প্রায় তিনভাগের একভাগ জুড়ে রয়েছে ম্যাক্রিনার মৃত্যু ও সমাধির বিবরণ। তাঁর শবযাত্রায় বহু উপকৃত ব্যক্তি অনুগমন করেছিলেন।

আমাদের কাছে তাঁর চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধ হল স্বনামধন্য দুই ভ্রাতা সেণ্ট বেসিল ও সেণ্ট গ্রেগোরি অব নীসার জীবন। এঁরা দুজনেই তাঁদের ধর্মজীবনের প্রধান নির্দেশ পেয়েছিলেন ম্যাক্রিনার কাছ থেকেই, এবং দুজনেই তাঁরা ছিলেন পূর্বাঞ্চলের খ্রীষ্টান গীর্জার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এইভাবেই কর্মের মধ্যে অন্যের প্রভাব জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। শ্বাইটজারের ভাষায় বলা যায়, "আমাদের মধ্যে কেউই জানে না যে তার জীবন কী রকম প্রতিক্রিয়া আনবে, এবং অন্যকে সে কীই বা দেবে: এটা আমাদের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং তাই থাকাই উচিত। তবে হঠাৎ কখনো কখনো এই ফলাফলের সামান্য অংশ আমরা দেখতে পাই, আর তা এইজন্যে যে আমরা যাতে আশা না হারাই। শক্তি যে কী ভাবে কাজ করে তা রহস্যাচ্ছন্ন ব্যাপার।"[৩]

---

১ 978 C
২ 982 A
৩ Memoirs of Childhood and Youth, p. 91.

বিংশ অধ্যায়

কিলডেয়ারের ব্রিজিট

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীগুলিতে আয়ার্লাণ্ড ছিল পাশ্চাত্য জগতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র. এবং ইউরোপের মধ্যে ঐ দেশই ছিল শিক্ষার দিক দিয়ে সর্বোন্নত। ধর্ম এবং শিক্ষা ছিল সেকালে একই ব্যবস্থার এপিঠ ওপিঠ, এবং শিক্ষাব্যবস্থা তখন পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের কর্তৃত্বাধীনেই ছিল। জাহাজবোঝাই বিদ্যার্থীরা তখন শিক্ষার জন্যে ঐ দ্বীপে আসতেন। এবং তাঁদের মধ্যে ছিলেন রোমান, গল অর্থাৎ ফরাসী, জার্মাণ, ঈজিপ্টবাসী, একজন ইংরেজ রাজা এবং একজন ফরাসী রাজা। মহাত্মা বীড লিখে গেছেন যে যখন পীতরোগের মহামারী থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ইংরেজগণ আয়ার্লণ্ডে পালিয়েছিল তখন, "আইরিশগণ স্বেচ্ছায় তাদের সকলকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বিনা খরচায় তাঁদের খাদ্য, পড়াশোনার জন্যে পুস্তক এবং বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।" শিক্ষা যে কেবল ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারেই দেওয়া হত তা নয়, কবিতা, সাহিত্য, আইন এবং চিকিৎসাবিদ্যাও পড়ানো হত। সর্বোচ্চ বিদ্যা লাভ করার জন্যে বারো বছর ধরে বিদ্যাশিক্ষা করতে হত। বিদ্যাবত্তাকে এতো গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা হত যে যাঁরা সর্বোচ্চ বিদ্যায় পারঙ্গম হতেন তাঁরা ভোজ সভায় রাজার পাশেই স্থান পেতেন। সুপণ্ডিত আইরিশগণ সারা ইউরোপেই পরিব্রাজন করতেন, আর সেটা শুধু ধর্মযাজক হিসাবেই নয়, ইউরোপের সংস্কৃতিকেন্দ্রগুলিতে তাঁদের আচার্য ও শিক্ষকরূপে সাগ্রহে বরণ করে নেওয়া হত।

বলা হ'য়ে থাকে, পঞ্চম শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের পর আয়ার্লণ্ড 'লৌহ যুগ' থেকে 'সুবর্ণ যুগে' অতিক্রান্ত হ'য়েছিল। বহু-ঈশ্বরবাদী 'পেগান' সংস্কৃতি চিন্তাধারা ও লক্ষ্যস্থলের প্রভাবে সমৃদ্ধতর হ'য়ে উঠেছিল। জনসাধারণ বহু-ঈশ্বর উপাসক পেগানবাদ থেকে একেশ্বরবাদী হ'য়ে একটি ঈশ্বরের ভজনা করতে লাগল। দেশের লোক উন্মত্ত রণক্ষেত্র থেকে শান্তিপূর্ণ কর্মোদ্যোগের দিকে আকৃষ্ট হল। ল্যাটিন ভাষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যও বিকশিত হতে লাগল। ল্যাটিন বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে সেল্‌টিক প্রভাবের সমন্বয়ে একটি নতুন ও সুন্দর লিপির উদ্ভব ঘটল। ফলে যেসব ইতিহাস ও পুরাণগাথা এতদিন বংশপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ চারণ-কবিদের দ্বারা মুখে মুখে প্রচলিত থাকত, তা লিপিবদ্ধ হল। এইভাবে আয়ার্লণ্ডের এই 'সুবর্ণ যুগে' পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কয়েকখানি জ্ঞানসমৃদ্ধ পুঁথি লিপিবদ্ধ হল, যার দু'একখানি এখনো

টি‌ঁকে আছে। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ এবং এনামেলের কারুশিল্পীগণ তাদের অলংকরণের কাজের সূক্ষ্মতা ও দক্ষতায় সর্বখ্যাত হ'য়েছিল এবং সমাজেও তাদের জন্যে সম্মানের আসন ছিল। খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গ ও ভূইঞারা তাঁদের অন্তহীন অন্তর্যুদ্ধের উত্তেজনা কমিয়ে অনেকটা শান্তিপ্রিয় হ'য়ে উঠলেন। মানুষ তখন তার গৃহসংসার নিয়ে এক আদর্শ অস্তিত্বের মধ্যে সার্থকতা লাভ করল—যে জগতে কৃষক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভূমিকর্ষণ করত, সৈনিকেরা পশুপালন করত এবং যেখানে শিল্পকলা ও নানাবিদ্যার চর্চা হত ও উৎসাহ দেওয়া হত।

এই যুগসন্ধির কালে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা কি রকম ছিল তা জানতে গেলে খ্রীষ্টধর্মের আগমনের আগে কী অবস্থা ছিল তা জানাও অবশ্যই দরকার। কারা এই আইরিশগণ? আর তাদের সংস্কৃতিই বা ছিল কী ধরনের? এর উত্তরে বলা যায়, পঞ্চম শতাব্দীর আইরিশগণ ছিল 'সেল্ট' জাতীয় লোক। সম্ভবত তারা মধ্য ইউরোপ থেকে পশ্চিম দিকে তাড়িত হ'য়ে সমুদ্র পার হ'য়ে আয়ার্লণ্ডে চলে এসেছিল। তারপর সেখানে তারা সেখানকার গ্রীক, স্কীথিয়ান এবং আইবেরিয়ান বংশোদ্ভূত জনসাধারণের সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে গিয়েছিল। এই সেল্টিক লোকেদের নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং বর্ণমালা ছিল; আর ইতিহাসও চারণ কবিদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হ'য়েছিল। তারা স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভাকার প্রস্তর মূর্তির পূজা করত। তাদের ঐন্দ্রজালিক ছিল: স্থানিক দেবতা, পরী ও জিন ছিল।

সেল্ট-অধ্যুষিত আয়ার্লণ্ডে নানারকম রাজা ও অজস্র ভূইঞা ও রাজন্যদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁদের কেউ কেউ অবতাররূপে কল্পিত, কেউ বা উপকথা-বর্ণিত, আবার কারো হয়তো বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তাঁরা দ্বীপটিকে নিজেদের মধ্যে অজস্রবার ভাগাভাগি করে নিয়েছেন, দেশের মধ্যে ও বিদেশে এপক্ষে বা ওপক্ষে মিশে অসংখ্য ঐসব ছোট রাজ্যের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্যে লড়াই করেছেন।

সমাজ ছিল প্রধানত পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের অবশ্য 'বর্ণ' বলা যায় না, কেননা এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার স্বচ্ছন্দ ছিল। এ'দের মধ্যে ছিলেন শতাধিক রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, সম্পত্তিবান সাধারণ লোক, সম্পত্তিহীন সাধারণ লোক এবং দাস শ্রেণীর মানুষ। দাসপ্রথা তখন আইন-সঙ্গত ছিল, এবং ইংরাজেরা তাদের সন্তানদের দাস হিসেবে বিক্রি করত আইরিশ-দের কাছে। লোকেরা বাস করত কাদা আর ডালপালায় তৈরী গোলাকার

বাড়ীতে। পরিখার মধ্যে গোলাকার কোনো দুর্গের ভিতরে একজন দলপতির বাড়ীর চারিদিকে গোলভাবে গড়ে উঠত ঐ সাধারণ মানুষের বাড়ীগুলি। এই-সব পরিখা-বিচ্ছিন্ন বাসস্থানগুলি রথ চলার উপযুক্ত পথের দ্বারা সংযুক্ত থাকত। নারীদের জগৎ সম্পূর্ণভাবেই পরিবারের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রথম চার শ্রেণীর নারীদের ঠিক বন্দীদশায় রাখা হত না। তাঁদের কোনো অবিচার সহ্য করতে হত না এবং স্বামীদের মতোই তাঁদের আইন সঙ্গত স্বাধিকার ছিল। প্রসঙ্গত বলা যায়, নির্ধারিত পাত্রকে বিবাহের সময় কন্যার পিতাকে বেশ কিছু দক্ষিণা দিতে হত। যদিও নারীগণ গৃহকর্মে রত থেকে বাইরের কাজের খোঁজ খবর রাখতেন না, তবু ক্রীতদাসী নয় এমন প্রত্যেক নারীই এমন শিক্ষা পেতেন যাতে সবরকম হাতের কাজে তাঁরা দক্ষ হ'য়ে উঠতেন। তাঁদের তাঁত, টাকু, মাকু, যাঁতা এবং চালুনী থাকত। যেসব নারীর এসব জিনিসপত্র থাকত তাঁকে "অত্যন্ত কাজের মেয়ে" বলে গণ্য করা হত এবং তাঁর বিবাহের সম্ভাবনাও হত অধিকতর। কিন্তু যেসব শ্রেণীর স্বাধীনতা ছিল না, অর্থাৎ যারা ছিল ক্রীতদাসী, তাদের কোনো স্বাধিকার ছিল না এবং তাদের প্রভুদের সম্পত্তি হিসেবে তাদের গণ্য করা হত। তাদের ক্ষমাহীন ভাবে কায়িক পরিশ্রম করতে হত। যেমন, হাঁসমুরগীর তদ্বির তদারক করা, গম ভাঙানো, অতিথিদের পা ধুইয়ে দেওয়া এবং খাওয়ার টেবিলে আলো ধরে দাঁড়ানো ইত্যাদি।

আয়ার্লন্ডের ইতিহাসের এই যুগসন্ধির কালে, সেন্ট প্যাট্রিকের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে লীনষ্টার রাজ্যে ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ডাব্‌থ্যাচ্ নামে একজন পেগান রাজকুমারের গৃহে একটি কন্যার জন্ম হয়। কন্যাটির মাতা ছিলেন একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ক্রীতদাসী। আর ইনিই হ'য়েছিলেন আয়ার্লন্ডের একজন প্রধান ধর্মসাধিকা। তাঁর যুগের নারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী।

ভগবদ্‌চরণে নিবেদিত-আত্মা এই দুর্লভ প্রতিভাময়ী নারীর বিষয়ে বলা হ'য়েছে: "যদিও তিনি বহু মানবিক ও ঐশী জ্ঞানের কথা বলতেন, তবু সকল গুণের রাণীর মতো করুণাবৃত্তির স্পর্শ না থাকলে তিনি নিজের কথাগুলিকে শূন্যগর্ভ কাংস্যনিনাদ বা খঞ্জনী ঝঙ্কারের চেয়ে বেশী অর্থপূর্ণ মনে করতেন না। যখন তিনি পার্থিব সম্পদ বিতরণ করতেন তখন, বিশেষ করে দরিদ্র ও বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্যের সময়, তিনি উদারভাবে, এমন কি যথেচ্ছ ভাবেই দান করতেন। এসব তিনি নিজেকে জাহির করার জন্যে করতেন না, কিংবা আত্ম-গরিমা বা পরোক্ষ স্বার্থবোধ ও উচ্চাশার বশে করতেন না। ভিক্ষার জন্যে যখন

অযোগ্য লোকেরা আসত তখন তিনি মন্দ কথা চিন্তা করতেন না. বিরক্ত হতেন না। অদৃষ্ট যখন বিরূপ হত তখন তিনি অন্যকে ঈর্ষা করতেন না। অন্যদের উপর প্রাধান্যসূচক স্থানে থাকলেও তিনি নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করতেন। তিনি সদয় সহিষ্ণুতার সঙ্গে অন্যদের চিত্তবিকার ও অকৃতজ্ঞতাগুলিকে গ্রহণ করতেন। এবং ন্যায় ও খোলাখুলি ব্যবহারের ভক্ত ছিলেন বলে তিনি ক্লান্তিহীন ভাবে ধর্ম ও পরম সত্যের জন্যে সংগ্রাম করে যেতেন।"[১]

জনশ্রুতি শেষপর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উপর কল্পনার স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। ভক্তির আবেগ একজন ধর্মসাধকের জীবন ও চরিত্রকে অতিরঞ্জনে আচ্ছাদিত করে দেয়। কোনো জাতির ইতিহাসে একটা যুগে কোনো ধর্মসাধকের জন্ম ঘটলে, অতীত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য যেন ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশে গিয়ে নানা আশ্চর্য কুসংস্কারময় কাহিনী, দৈবঘটনা এবং উপকথায় রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। আর এর মধ্যে ঐ ধর্মসাধকের অধ্যাত্ম দীপ্তি আকাশ প্রদীপের মতো প্রজ্বলিত হ'য়ে ভক্তদের নিশানা দেয় ও পরমের সন্ধানে মানুষকে আকর্ষণ করে।

কিলডেয়ারের সেণ্ট ব্রিজিটের ক্ষেত্রে বহু ঐতিহ্য. কুসংস্কার, দৈবঘটনা এবং উপকথা বংশপরম্পরাগত চারণদের দ্বারা গীত হ'য়ে সন্ন্যাসীদের লিখিত ধর্ম-পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করেছে। ফলে এই প্রাচীন আয়ার্লণ্ডের ধর্মসাধিকার বেলায় কোথায় যে জনশ্রুতি শেষ হ'য়ে বাস্তবের সীমারেখা শুরু হ'য়েছে তার হদিস পাওয়া পণ্ডিতদের পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠেছে। কেননা, আয়ার্লণ্ডে খ্রীষ্ট-ধর্মের অভ্যুত্থানে খ্রীষ্টপূর্ব ধর্মকে নির্মমভাবে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়নি, কিংবা নতুন ধর্মমতের প্রতি বিরুদ্ধতাও দেখা দেয়নি। বরং বলা যায়, সচেতন ভাবে প্রাচীন ও নতুনের সন্ধান ঘটেছে ঐদেশে। সেইজন্যে ব্রিজিটের জন্মের আগে প্যাট্রিক নামে যে রোমান খ্রীষ্টান পাদ্রী এই নতুন ধর্ম আয়ার্লণ্ডে প্রচার করেছিলেন তিনি যে কেবল কৃষকদেরই ধর্মান্তর গ্রহণে আগ্রহী দেখেছিলেন তা নয়, শাসক সম্প্রদায়ও সে দলে যোগ দিয়েছিলেন। এবং তিনিও প্রাচীন ধর্মের রক্ষণীয় গুণগুলি আত্মসাৎ করে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়েছিলেন। সেইজন্যে, প্যাট্রিক সোনার পাতে মোড়া পাথরের মূর্তির পূজাকে মেনে না নিলেও একটা প্রাচীন পেগান উৎসব "টারা পর্বতে" আগুন জ্বালার আচারকে মেনে নিয়ে তাকে "প্যাস্কাল আগুন" বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। খ্রীষ্টীয় এবং খ্রীষ্টান-ধর্মের পূর্ববর্তী এইসব উৎসব ও ক্রিয়াচারের সংমিশ্রণের ফলে, পেগান রাজ-

১ *Lives of the Irish Saints,* by John O Hanlon, 1875.

কুমার ও খ্রীষ্টান ক্রীতদাসীর কন্যা ব্রিজিটকে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয়ের আগেকার সূর্যকন্যা ব্রিজিটের সঙ্গে একাকার ক'রে ফেলা হ'য়েছে। এই শেষোক্ত ব্রিজিট ছিলেন জ্ঞান, বিদ্যা, শিল্প, উর্বরতা এবং শস্যের অধীশ্বরী দেবী। সেইজন্যে সেণ্ট ব্রিজিটের মৃত্যুর পর কিলডেয়ারের গির্জায় যে অগ্নিশিখা জ্বালা হয় তা রিফর্মেশানের সময় পর্যন্ত অম্লান রাখা হয়। এবং তা রাখা হয় প্রাচীনতর প্রতীক সূর্যকন্যার নামে আর তার উদ্দেশ্য ছিল অপর্যাপ্ত শস্যলাভের আশা।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, সেণ্ট ব্রিজিটের বিষয়ে লেখার সময়ে কোথায় যে জনশ্রুতির শেষ এবং সত্যঘটনার শুরু তা নির্ধারণ করা কতো কঠিন। যদিও বলা হ'য়েছে যে, ব্রিজিটের সম্পর্কে বহু জনশ্রুতিই মিথ্যা, তবু যুগের পর যুগ ধরে এই লোককাহিনীগুলিতে তাঁর চরিত্রের কিছুটা আভাস, এবং সমসাময়িক মানুষের উপর তাঁর কর্ম প্রভাবের কিছুটা ধারণা এতে পাওয়া যায় বলে এগুলির সত্যমূল্য একেবারে নগণ্য নয়। কাজেই কয়েকটি কাহিনীর অবতারণা এখানে অবান্তর হবে বলে মনে হয় না।

ব্রিজিটের জন্ম হ'য়েছিল ক্রীতদাসী হিসাবে, কারণ তাঁর জন্মের আগে তাঁর মাতাকে অন্য একজন প্রভুর কাছে বিক্রয় করা হ'য়েছিল। বড় হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজিট ক্রীতদাসীর স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে লাগলেন। যেমন—মেষচারণ, গম-পেষা এবং অতিথির পা ধুইয়ে দেওয়া ইত্যাদি। নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণবয়স্কা হওয়ার পর, তাঁর পিতা তাঁকে ফিরে পাওয়ার দাবী জানালেন, এবং পরিচারিকা হিসেবে তিনি তাঁর পিতার পরিবারে ফিরে এলেন। তাঁর কাজ যদিও বিশেষ উচ্চস্তরের ছিল না, তবু তিনি পরিণতমনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যেতে লাগল যে ব্রিজিটের মন খুবই উচ্চভাবনা ও বুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি নগণ্যতম ক্রীতদাসীর সঙ্গেও ভগ্নীভাবে মিশতেন, অথচ পিতার অতিথিদের সাহচর্যেও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। তাঁর এই গুণ পরবর্তী জীবনের কাজের সময়ে যথেষ্ট সুবিধাজনক হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর গভীর মমত্ববোধের ফলে তিনি যারই সংস্পর্শে আসতেন তার হৃদয়স্পর্শ করতে পারতেন, তা সে বিশপ, রাজা বা ক্রীতদাস যেই হোক।

অল্পবয়সেই ব্রিজিটের মধ্যে এমন একটা গুণ দেখা গিয়েছিল যা ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিদের হতবুদ্ধিকর। সে গুণ হল তাঁর অসাধারণ উদারতা। তরুণী বয়সেই তিনি তাঁর পিতার সম্পত্তি বিতরণ করতে শুরু করেন। মেষচারণের সময়ে কোনো ভিক্ষুক দেখতে পেলে তিনি একটি মেষ তাকে দিয়ে দিতেন। এরকম উদারতা তাঁর পিতার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হ'য়ে উঠল। এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদেই

ব্রিজিট এজন্যে কোনো কায়িক শাস্তি পেতেন না। কিন্তু এই ক্ষতিজনক উদারতা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে তাঁর পিতা তাঁকে লীনস্টারের খ্রীষ্টান রাজার কাছে বিক্রী করে দেবেন বলে স্থির করলেন। প্রাচীন পুঁথিতে দেখা যায়—একদিন সকালে ডাবথ্যাচ্ ব্রিজিটকে তাঁর গৃহকর্ম থেকে ডেকে তাঁর রথে তুললেন। মেয়েটি তাঁর পিতার এই অপ্রত্যাশিত ভালো ব্যবহারে কিছু একটা ঘটবে মনে করে হাসলেন। কিন্তু তাঁকে বলা হল, 'তোমাকে সম্মান দেখানোর জন্যে রথে করে নিয়ে যাচ্ছি না, রাজার কাছে বেচতে নিয়ে যাচ্ছি।'

দুর্গে পেঁৗছে ডাবথ্যাচ্ রাজার কাছে এই নতুন ক্রীতদাসীর জন্যে দরদস্তুর করতে চলে গেলেন। ব্রিজিট রথের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এই সময় একজন কুষ্ঠ রোগী এসে উপস্থিত হল। সেকালে আয়ার্লণ্ডে কুষ্ঠরোগীরা তাদের রোগের জন্যে সুবিধাভোগী শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য হত। রাজার দুর্গের মধ্যে তাই তারা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারত। আর সেইজন্যেই এই কুষ্ঠরোগীটি ব্রিজিটের কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে পারল। কিন্তু ক্রীতদাসী যদিও রাজপুত্রের রথে বসেছিলেন এবং তাঁর হাবভাবও বাহির থেকে মর্যাদাজনক ছিল, তবু তাঁর এমন কিছু ছিল না যা তিনি দান করতে পারেন। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে কুষ্ঠরোগীর আতুর দৃষ্টির দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ রথের উপর তাঁর পিতার মণিমুক্তা খচিত তরবারিখানা দেখতে পেলেন। একটুও ইতস্তত না ক'রে তিনি সেই তরবারিখানা ঐ কুষ্ঠরোগীকে দান করলেন, আর সেও সন্তুষ্টমনে তা নিয়ে অন্যত্র চলে গেল। এদিকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় ডাবথ্যাচ্ রাজাকে বুঝিয়ে বলছিলেন যে, ব্রিজিটের অসংযত উদারতা তাঁর পক্ষে এত ক্ষতির কারণ হ'য়ে উঠেছে যে সেইজন্যেই তিনি ব্রিজিটের হাত থেকে অব্যাহতি চান। তারপরে ব্রিজিটকে নেওয়ার জন্যে রথের কাছে এসে তৎক্ষণাৎ ডাবথ্যাচ্ দেখলেন, তাঁর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ ঐ তরবারিখানা আর নেই। কাহিনীতে বলা হয়েছে "অস্বাভাবিক রকম ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন" ডাবথ্যাচ্। অবশ্য তা হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। কিন্তু ব্রিজিটকে যখন তিনি বললেন ওটা কত মূল্যবান ছিল তখন তাঁর উত্তর শুনে তিনি আরো অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন। ব্রিজিট বলেছিলেন, মূল্যবান বলেই তো তিনি ঐ তরবারিখানা একজন "ভগবানের সন্তানকে" দিয়েছেন।

পিতার তরবারি দিয়ে দেওয়ার এই ঘটনা নাকি ব্রিজিটের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল। কেননা লীনস্টারের রাজা যখন তাঁর এই কর্মের কথা শুনলেন, তখন তিনি তাঁকেই সমর্থন জানালেন। সত্যিই তো এই ক্রীতদাসী

কন্যাটি যে নির্ভীকভাবে পিতার মূল্যবান সম্পদ কুষ্ঠরোগীকে দান করেছিলেন সে তো ভালোই। ঐ লোকটির অর্থের প্রয়োজন তো হাজার গুণেই বেশী ছিল। তাই রাজা ব্রিজিটের পিতাকে অনুরোধ জানালেন যে ব্রিজিটকে যেন দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি বলেছিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও। ঈশ্বরের কাছে ওর মূল্য আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।"

এই কাহিনীকে বহুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ধর্মসাধিকা ব্রিজিট যে একজন যোদ্ধার তরবারিকে মূল্যহীন মনে করে দান করেছিলেন, তার দ্বারা তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর সামনে একটা আদর্শ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সে আদর্শ হল এই যে, তারা যেন ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে না থেকে অন্যভাবে জীবন কাটায়—তারা যেন ভেদ দ্বন্দ্ব পরিহার করে পরহিতে জীবন নিয়োজিত করে।

ব্রিজিটের এই তরবারি দিয়ে দেওয়ার অনুরূপ ঘটনা, তিনি যখন সারা আয়ার্লণ্ডে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন তখনো ঘটেছিল। শোনা যায় একদিন জনৈক যোদ্ধা পার্শ্ববর্তী কোনো ভূইঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার আগে ব্রিজিটের কাছে এসে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছিলেন। পুরাণলেখকের মতে ব্রিজিট "আশীর্বাদস্বরূপ কেবল শান্তির কথাই বলতেন।" কাজেই তিনি বললেন, "সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে এই মিনতি জানাই যেন এই যুদ্ধে তুমি কাউকে আহত না করতে পার, আর নিজেও কোনো আঘাত না পাও। কাজেই যুদ্ধের এসব জিঘাংসু সাজসজ্জা ত্যাগ কর।" এইভাবে, যে যুগে যুদ্ধক্ষেত্রের শৌর্য-বীর্যকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত, তখন ব্রিজিট একাকী দাঁড়িয়ে কেবল যে শান্তির অধ্যাত্মবাণীই প্রচার করতেন তা নয়, কর্মের দিক দিয়েও এমন ভাবে চলতেন যাতে দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁর পিতা তাঁর উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থাই করেছিলেন। এবং তারপর তাঁর বিবাহ স্থির করেছিলেন একজন কবির সঙ্গে। প্রাচীন আয়ার্লণ্ডের সমাজে কবিরা অত্যন্তই সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু ব্রিজিট সন্ন্যাসধর্মে আত্মোৎসর্গ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তাই বহু বাধাবিপত্তি সত্বেও তিনি অবশেষে সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করলেন। ব্রিজিটের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা নির্জনে সাধনভজনের উপায়স্বরূপ ছিল না, জনসাধারণের মধ্যে প্রবল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রেই আত্মিক নির্জনতা লাভ করেছিলেন তিনি। যে যুগে নারীরা সমাজের কোনো কাজেই অংশগ্রহণ করতেন না, তখন তিনি ছিলেন অগ্রপথিকা। তাঁর আহ্বানেই তাঁর স্বদেশবাসীগণ সমাজের সর্বস্তরের

পারিবারিক প্রচ্ছায় থেকে বেরিয়ে এসে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ব্রিজিট নিজেই সারা দেশে সন্ন্যাসিনীদের জন্যে মঠ স্থাপন করেছিলেন। রথে করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে তিনি ঐ মঠগুলির নির্মাণের কাজ দেখাশোনা করতেন। তিনি ঈশ্বরের চরণে সকলকে আত্মনিবেদনের অনুরোধ জানিয়ে, দেশবাসীগণের মধ্যে মঙ্গল ও সদয়তার বাণী বিতরণ করতে বলতেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল খুবই ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টার উপরে গঠিত। এগুলি ছিল একরকম আত্মনির্ভরশীল উপনিবেশ। এখানে সন্ন্যাসিনীরা ছাড়া সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষ আশ্রয় পেতেন। এই মঠগুলি ছিল ধর্মসংক্রান্ত ও সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। এসব জায়গায় নানারকম কারুবিদ্যা এবং হাতে-কলমে কৃষিবিদ্যা, শস্যোৎপাদন, গমভাঙা, রং করা, তাঁতবোনা এবং রোগীর শুশ্রূষার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। ব্রিজিট যে-অধ্যাত্ম ভিত্তির উপর এই প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছিলেন তার প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ, দেখা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না এবং পরিপূর্ণ সৌভ্রাত্রের লীলাভূমি ছিল এগুলি। গরীবদের এখানে সযত্নে গ্রহণ করা হত, দুঃখীদের আশ্রয় দেওয়া হত। বিদেশী এবং পীড়িত লোকেরা এখানে শান্তির জন্যে এসে ব্রিজিটের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করত। অভ্যর্থনার আন্তরিকতা ও অবহেলিত লোকদের প্রতি ব্যক্তিগত সেবাপরায়ণতার জন্যে ব্রিজিট সুপরিচিতা ছিলেন। নিজের জীবনকে তিনি ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করেছিলেন, এবং সাংসারিক সুখসুবিধার দিকে তাঁর কোনো বাসনাই ছিল না। কিন্তু জীবনের পথে ভালোভাবে চলতে গেলে অন্যের যে কী পরিমাণ আরাম ও যত্ন দরকার তা তিনি ভালোভাবেই বুঝতেন। তিনি প্রফুল্লতা ও আমোদ আহ্লাদ ভালোবাসতেন, এবং উৎসবের উপলক্ষ্যে একত্রে মেলামেশা ও গানবাজনা পছন্দ করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাত্রের প্রসারের পক্ষে এগুলি তিনি অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

"দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থেকে দীনতম পেগান ও খ্রীষ্টান ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে মিষ্ট উপদেশের জন্যে যেতেন।" কেননা সকলেই ব্রিজিটের অসাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর উপদেশের দ্বারা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করতেন। তাঁর নিজের সরলভাষায় বলা যায়, এটা ঘটত "এই কারণে যে আমার মন কখনো ভগবানের কাছ থেকে সরে আসে না।" তাই অনেক সময় খ্যাতনামা ব্যক্তিরা ব্রিজিটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছেন, এই অনাড়ম্বরতার

প্রতিমা স্বরূপিণী নারী মেষপালনে ব্যাপৃতা আছেন। "দি স্পেকল্‌ড্‌ বুক" নামে দশম শতাব্দীর এক হস্তলিখিত পুঁথিতে লিখিত আছে, "......তিনি তাঁর মেষগুলির কাছ থেকে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে এলেন।"

নিজের দেশে, নিজের কালে ধর্মপ্রচারিকা হিসাবে ব্রিজিট পূজা পেলেও তিনি নিন্দার হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি পাননি। তাঁর নির্বিচার উদারতা বহু লোকের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। মানবিক দুর্বলতার বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই, অসাধু এবং আন্তরিকতাহীন মানুষের দায় তাঁর উপরে এসে পড়লে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বাস রেখে তিনি মনে করতেন, হয় এতে অন্যায়কারীর হৃদয় দ্রব হবে কিংবা অন্য কোনো ভাবে জীবনের এই ঐশ্বরিক বিধানের ভারসাম্য ঘটাবে।

ব্রিজিট নামের অর্থ হল "শক্তি"। তিনি সত্যই তাঁর সাহস, সত্যনিষ্ঠা, বিপদে চিত্তের প্রশান্তি, বাকসংযম এবং গভীর বাস্তবজ্ঞানের জন্যে প্রশংসিত হয়েছিলেন। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তাঁর যশোলাভের জন্যে তাঁকে অত্যাশ্চর্য কোনো দৈব ব্যাপার সংঘটিত করতে হয়নি, সাংসারিক জীবনের মধ্য দিয়েই চাক্ষুষ কাজের জন্যে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যেমন বলা যায়, যে যুগে দেহধৌত করা প্রয়োজনীয় ব্যাপার না মনে করে বিলাসিতা বলে মনে করা হত, তখনই তিনি রোগ-প্রতিষেধের উপায় হিসাবে দৈহিক পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী জোর দিতেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি চিকিৎসার আগে রোগীকে ভালো করে পরিষ্কার করতে বলতেন।

আয়ার্লণ্ডে সেণ্ট ব্রিজিটকে কৃষিজীবনের অধিষ্ঠাত্রী মনে করা হয়। তা না-হবে কেন? তিনিই কি ভূম্যধিকারীদের কাছে শান্তভাবে আবেদন করে জন-সাধারণের জন্যে নিষ্কর মেষচারণ-ভূমি সংগ্রহ করে দেননি? বাল্যকাল থেকেই তিনি মেষপালন করেছেন, গো দোহন করেছেন, মাখন ও পনীর তৈরী করেছেন এবং গম ভেঙে রুটি তৈরী করেছেন। তারপর মঠাধ্যক্ষা হওয়ার পর তিনি ব্যক্তিগত ভাবে মঠের জমিজমাগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং গম কাটার সময় লোকজনদের সাহায্য করেছেন। কথিত হয় যে, প্রত্যেকটি পাহাড়ী খামার এবং পশুপালন ক্ষেত্র হল তাঁর পথচল্‌তি মন্দির। তাঁর স্বদেশে কতো ঝরণা, কতো উপত্যকা, কতো গ্রামের নাম রাখা হয়েছে তাঁর নামে। এবং ইউরোপেও কত গির্জা, মঠ ও ইঁদারার নামে দেখা যায় ব্রিজিট, ব্রিগিট বা ব্রাইডের ব্যবহার।

ব্রিজিটের স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটি বিখ্যাত সেটি ছিল লীনষ্টারে। সেখানে তিনি নিজের জন্যে কাদা ও ডালপালা দিয়ে একটি কুটির

তৈরী করেছিলেন। এই কুটিরটি ছিল একটি ওক গাছের ছায়ায়, যাকে বলা হত 'গির্জার ওক গাছ' বা "কিল-ডারা"। এখানেই কালক্রমে আয়ার্লণ্ডের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ গড়ে ওঠে, তার নাম এখন কিলডেয়ার। ব্রিজিট তাঁর সত্তর বৎসর জীবনকালের বেশীর ভাগ সময়ই এই কিলডেয়ারে অতিবাহিত করেছেন। "দি অ্যানালস্ অব ফোর মাণ্টারস্" গ্রন্থে ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে লিপি-করা হয়েছেঃ "১লা ফেব্রুয়ারী ব্রিজিট দেহত্যাগ করেন। তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে ডুন (অর্থাৎ ডাউন প্যাট্রিক-এ) নামক স্থানে সেণ্ট প্যাট্রিকের সহিত একই সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।"

কিন্তু ব্রিজিটের আত্মা যুগের পর যুগ অতিক্রম করে তাঁর দেশবাসীকে নিজের সহৃদয় সৎকাজ এবং তুচ্ছতম কর্তব্যের প্রতিও তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠার দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে চলেছে। তাঁর নামে নাম রাখা হয়েছে এমন বহু 'ব্রিজিট', 'ব্রাইড' বা 'ব্রিডি'গণ জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গৃহে, মঠে বা আতুরালয়ে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। মনে পড়ে সেই ব্রিজিটের কথা যিনি ছিলেন ক্রীতদাসী, হলেন গোপালিকা এবং তারপর মঠাধ্যক্ষা এবং জ্ঞানীর উপদেষ্টা ও সর্বমানবের বন্ধু; যাঁর মন কখনো ভগবানের কাছ থেকে সরে আসত না—আয়ার্লণ্ডের সেই সুবর্ণ যুগে যিনি ছিলেন অবিচল ভক্তির অধিকারিণী এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে ধন্যা।

একবিংশ অধ্যায়

ম্যাগডেবার্গের মেক্‌থিল্‌ড্‌

জার্মান মরমী সাধকদের ইতিহাস শুরু হয়েছে এমন কয়েকজন নারীর ধর্ম-জীবন ও তপশ্চর্যার বিবরণ দিয়ে, যাঁরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং ঈশ্বর প্রেমের জন্যে বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্যা। যে সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস তার গির্জার আওতায় প্রতিদিনই বেশী করে বুদ্ধিবাদে পরিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, যে সময়ে ধর্মসংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা চূড়ান্তভাবে বিকশিত হ'য়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিধিবিধানের মধ্যগগনে আরোহণ করেছিল, সেই সময়ে এই নারীগণ অতিসাধারণ অবস্থা থেকে আবির্ভূতা হ'য়ে ধর্মসংক্রান্ত স্বাভাবিক বৃত্তির আশ্চর্য ক্ষমতায় চালিত হ'য়ে জগতের কাছে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির এমন সাক্ষ্য রেখে গেছেন যা এখনো ঈশ্বরান্বেষী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

বিনজেনের হিলডেগার্ডের (১০৯৮-১১৭৯) কাছ থেকে তাঁর ঐশ্বরিক দৈব-দর্শনের বিষয়ে জানতে পারি। অন্তরের পরিপূর্ণতা থেকেই এই উপলব্ধি তাঁর মনে এসেছিল, এবং সেইজন্যে তাঁর দেশবাসীর কাছে তিনি প্রজ্জ্বলিত শিখার মতো ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে প্রায়ই তিনি আলোর মধ্যে আলো দেখতে পান। এর অর্থ হল সেই জ্যোতি, সমস্ত আলোকই যার মধ্যে বিধৃত হ'য়ে আছে। আর প্রতিবারই এই উপলব্ধির পর তাঁর সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা এবং অতীতের গুরুভার যেন ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেত।

এই রকম উপলব্ধির কথা আমরা শুনতে পাই হ্যাকবোর্ণের গার্ট্রুডের সম্পর্কে। তিনি ছিলেন আইজ্‌ল্‌বেলের কাছে হেল্‌ফ্‌টা মঠের অধ্যক্ষা। একই কথা শোনা যায় তাঁর ভগ্নী হ্যাকবোর্ণের মেকথিল্‌ডের (১২৬০-১৩১০) বিষয়ে। তিনি ছিলেন প্রতীকী স্বপ্নদর্শনের জন্যে বিখ্যাত। এই কথাই শোনা যায়—এই নারীদের মধ্যে যিনি ছিলেন কবি, সেই ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের বিষয়ে: তিনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হেল্‌ফ্‌টায় এসেছিলেন। এবং সর্বশেষে এমনি কথা শোনা যায় "মহীয়সী" গার্ট্রুডের (১২৫৬-১৩১১) বিষয়ে, যিনি আশ্চর্য স্বপ্নাবেশের দশায় যীশু এবং মেরীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন।

আমরা এখানে প্রধানত ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের বিষয়েই আলোচনা করছি। তিনি গির্জা এবং তাঁর অনুশাসন মতো ধ্যানধারণা না করেই "পরম সত্তা"কে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা কোনো পূর্ববর্তী ধার্মিক লেখক বা স্বপ্ন-দ্রষ্টার চর্বিতচর্বণ নয়। ঈশ্বরের সাহচর্য লাভের এমন বেগবান বর্ণনা তিনি

রেখে গেছেন যে সর্বকালের ঈশ্বরপ্রেমিকই তার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন—তাঁর রচনার আদিরসাত্মক প্রতীকগুলি ভক্তের উপলব্ধিতে বিন্দুমাত্র বাধা জন্মায় না। এই প্রতীকগুলি মেকথিল্‌ড্‌ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী উদ্দীপনাময় ও প্রভাবসম্পন্ন জার্মান আদিরসাত্মক কবিতা থেকে।

আদিরসাত্মক কবিতা এবং মরমীয়া-বাদ ছিল মধ্য-যুগীয় কাব্য-ভঙ্গিমায় ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। এটা স্বাভাবিক যে, জার্মান আদিরসের কবিতার চিত্রকল্পময় ভাষা "পরম রস-সত্তা"কে উপলব্ধির অতীন্দ্রিয় উল্লাসের ভাষায় প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং এই শিল্প মাধ্যম ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ঈশ্বরানুভূতির ক্ষেত্রে এমন সুস্পষ্ট অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হ'য়েছে যার তুলনায় দার্শনিক ঈশ্বরালোচনা অনেক পিছনে পড়ে আছে। আজো এই বর্ণনাগুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানুষ চিরকালই ভগবানকে দেখতে পাবে, তাঁকে নিজের মধ্যে পাবে। এই ঈশ্বরকে পাওয়াই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মেকথিল্‌ড্‌ এই ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন সমসাময়িক চিন্তাধারায় প্রাধান্য লাভ করেছিল বুদ্ধিনির্ভর অস্পষ্ট জল্পনাকল্পনা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান বস্তু-গুলির ব্যাখ্যা। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন এক অকল্পনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য ঈশ্বরপ্রেমের ফলশ্রুতি হিসাবেই। মরমী সাধনার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নারীগণ তাঁদের সহজাত বৃত্তির প্রসাদে এবং ভক্তির ক্ষমতায় চূড়ান্ত ঈশ্বরানুভূতির অধিকারিণী হ'তে পেরেছেন। কিন্তু তা ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা করেছেন। সেটা হল এই যে, তাঁরাই শুধু পুরুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে উদ্ভূত বন্ধ্যা বুদ্ধি সর্বস্বতাকে আবেগ ও অনুভূতির অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা পরাভূত করতে পারেন। আর এরই ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীরতর মূল্যবোধ প্রসারিত হয়। ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের জীবন থেকে নারীদের এই শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—যে শক্তি প্রায়শই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

তাঁর জীবনবিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংখ্যায় অত্যন্তই কম। তাঁর জন্ম হ'য়েছিল ম্যাগডেবার্গে, আর যে পরিবারে তাঁর জন্ম হ'য়েছিল তা অবস্থাপন্ন এবং সম্ভবত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পরিবার ছিল। প্রায় কৈশোরেই তিনি ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হন। বলা হয়েছে যে, বারো বছর বয়সেই তিনি দৈবানুগ্রহ লাভ করেন। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থেকেই জন্ম নেয় ঈশ্বরকে সেবা করার বাসনা এবং কেবল তাঁরই জন্যে জীবনধারণের আকুতি। ১২২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে

একবিংশ অধ্যায়

ম্যাগডেবার্গের মেক্‌থিল্‌ড্‌

জার্মান মরমী সাধকদের ইতিহাস শুরু হ'য়েছে এমন কয়েকজন নারীর ধর্ম-জীবন ও তপশ্চর্যার বিবরণ দিয়ে, যাঁরা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং ঈশ্বর প্রেমের জন্যে বিশেষ রকম উল্লেখযোগ্যা। যে সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাস তার গির্জার আওতায় প্রতিদিনই বেশী করে বুদ্ধিবাদে পরিকীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, যে সময়ে ধর্মসংক্রান্ত ভাবনাচিন্তা চূড়ান্তভাবে বিকশিত হ'য়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিধিবিধানের মধ্যগগনে আরোহণ করেছিল, সেই সময়ে এই নারীগণ অতিসাধারণ অবস্থা থেকে আবির্ভূতা হ'য়ে ধর্মসংক্রান্ত স্বাভাবিক বৃত্তির আশ্চর্য ক্ষমতায় চালিত হ'য়ে জগতের কাছে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির এমন সাক্ষ্য রেখে গেছেন যা এখনো ঈশ্বরান্বেষী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

বিনজেনের হিলডেগার্ডের (১০৯৮-১১৭৯) কাছ থেকে তাঁর ঐশ্বরিক দৈব-দর্শনের বিষয়ে জানতে পারি। অন্তরের পরিপূর্ণতা থেকেই এই উপলব্ধি তাঁর মনে এসেছিল, এবং সেইজন্যে তাঁর দেশবাসীর কাছে তিনি প্রজ্বলিত শিখার মতো ভাস্বর হ'য়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন যে প্রায়ই তিনি আলোর মধ্যে আলো দেখতে পান। এর অর্থ হল সেই জ্যোতি, সমস্ত আলোকই যার মধ্যে বিধৃত হ'য়ে আছে। আর প্রতিবারই এই উপলব্ধির পর তাঁর সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা এবং অতীতের গুরুভার যেন ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেত।

এই রকম উপলব্ধির কথা আমরা শুনতে পাই হ্যাকবোর্ণের গাট্রুডের সম্পর্কে। তিনি ছিলেন আইজ্‌ল্‌বেলের কাছে হেল্‌ফ্‌টা মঠের অধ্যক্ষা। একই কথা শোনা যায় তাঁর ভগ্নী হ্যাকবোর্ণের মেকথিল্‌ডের (১২৬০-১৩১০) বিষয়ে। তিনি ছিলেন প্রতীকী স্বপ্নদর্শনের জন্যে বিখ্যাত। এই কথাই শোনা যায়—এই নারীদের মধ্যে যিনি ছিলেন কবি, সেই ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের বিষয়ে; তিনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে হেল্‌ফ্‌টায় এসেছিলেন। এবং সর্বশেষে এমনি কথা শোনা যায় "মহীয়সী" গার্ট্রুডের (১২৫৬-১৩১১) বিষয়ে, যিনি আশ্চর্য স্বপ্নাবেশের দশায় যীশু এবং মেরীর সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন।

আমরা এখানে প্রধানত ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের বিষয়েই আলোচনা করছি। তিনি গির্জা এবং তাঁর অনুশাসন মতো ধ্যানধারণা না করেই "পরম সত্তা"কে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা কোনো পূর্ববর্তী ধার্মিক লেখক বা স্বপ্ন-দ্রষ্টার চর্বিতচর্বণ নয়। ঈশ্বরের সাহচর্য লাভের এমন বেগবান বর্ণনা তিনি

রেখে গেছেন যে সর্বকালের ঈশ্বরপ্রেমিকই তার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন—তাঁর রচনার আদিরসাত্মক প্রতীকগুলি ভক্তের উপলব্ধিতে বিন্দুমাত্র বাধা জন্মায় না। এই প্রতীকগুলি মেকথিল্‌ড্‌ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী উদ্দীপনাময় ও প্রভাবসম্পন্ন জার্মান আদিরসাত্মক কবিতা থেকে।

আদিরসাত্মক কবিতা এবং মরমীয়া-বাদ ছিল মধ্য-যুগীয় কাব্য-ভঙ্গিমায় ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। এটা স্বাভাবিক যে, জার্মান আদিরসের কবিতার চিত্রকল্পময় ভাষা "পরম রস-সত্তা"কে উপলব্ধির অতীন্দ্রিয় উল্লাসের ভাষায় প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং এই শিল্প মাধ্যম ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ঈশ্বরানুভূতির ক্ষেত্রে এমন সুস্পষ্ট অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হ'য়েছে যার তুলনায় দার্শনিক ঈশ্বরালোচনা অনেক পিছনে পড়ে আছে। আজো এই বর্ণনাগুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, মানুষ চিরকালই ভগবানকে দেখতে পাবে, তাঁকে নিজের মধ্যে পাবে। এই ঈশ্বরকে পাওয়াই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মেকথিল্‌ড্‌ এই ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেছিলেন এমন একটা সময়ে যখন সমসাময়িক চিন্তাধারায় প্রাধান্য লাভ করেছিল বুদ্ধিনির্ভর অস্পষ্ট জল্পনাকল্পনা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দৃশ্যমান বস্তুগুলির ব্যাখ্যা। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন এক অকল্পনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য ঈশ্বরপ্রেমের ফলশ্রুতি হিসাবেই। মরমী সাধনার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নারীগণ তাঁদের সহজাত বৃত্তির প্রসাদে এবং ভক্তির ক্ষমতায় চূড়ান্ত ঈশ্বরানুভূতির অধিকারিণী হ'তে পেরেছেন। কিন্তু তা ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁরা করেছেন। সেটা হল এই যে, তাঁরাই শুধু পুরুষের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে উদ্ভূত বন্ধ্যা বুদ্ধি সর্বস্বতাকে আবেগ ও অনুভূতির অধ্যাত্মশক্তির দ্বারা পরাভূত করতে পারেন। আর এরই ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীরতর মূল্যবোধ প্রসারিত হয়। ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের জীবন থেকে নারীদের এই শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়—যে শক্তি প্রায়শই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ।

তাঁর জীবনবিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সংখ্যায় অত্যন্তই কম। তাঁর জন্ম হ'য়েছিল ম্যাগডেবার্গে, আর যে পরিবারে তাঁর জন্ম হ'য়েছিল তা অবস্থাপন্ন এবং সম্ভবত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পরিবার ছিল। প্রায় কৈশোরেই তিনি ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হন। বলা হয়েছে যে, বারো বছর বয়সেই তিনি দৈবানুগ্রহ লাভ করেন। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থেকেই জন্ম নেয় ঈশ্বরকে সেবা করার বাসনা এবং কেবল তাঁরই জন্যে জীবনধারণের আকুতি। ১২২৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে

তিনি ম্যাগডেবার্গের "বেগুইন্‌স্‌" গৃহে যোগদান করেন। এই 'বেগুইন্‌স্‌' গৃহগুলি ছিল ধর্মীয় ভগ্নীসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এতে কোনো চিরন্তন ব্রত গ্রহণ করা হত না বা এগুলি কোনো গির্জা কিংবা ঐ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই সঙ্ঘ নারীদের মধ্যে এমন একটা সম্প্রদায় গঠিত করার আদর্শ নিয়ে স্থাপিত হ'য়েছিল, যেখানে সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপর সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়, এবং দৈনন্দিন জীবনে খ্রীষ্টের বাণীকে উদ্‌যাপিত করা যায়। এদের প্রধান কাজ ছিল দাতব্যকর্ম, রোগীসেবা ও ভক্তি। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে একজন বেগুইন হিসাবে তাঁর কাজ করার জন্যে মেকথিল্‌ড্‌ তাঁর দেশের মধ্যে যথেষ্ট পরিব্রাজন করেছিলেন এবং তার ফলে জীবনের এমন কতকগুলি দিক দেখতে পেয়েছিলেন যাতে তিনি ঈশ্বরের দিকে আরো বেশী আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন।

তিনি স্বেচ্ছায় বহু আত্মনিগ্রহ সহ্য করেছিলেন এবং আত্মশুদ্ধির জন্যে বহু ব্রত পালন করেছিলেন। মরমী সাধনায় এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে দেহকে তপস্যার যন্ত্রণা দিয়ে তাকে ঈশ্বরোপলব্ধির আধার করে তোলা হ'য়েছে— অন্তরের মনোজগৎ যেন দেহকে দৈবানুভূতির উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। দেহকে বশীভূত করার এইসব প্রয়াসের সঙ্গে ভারতীয় ব্রহ্মচর্য পালনের অনেক মিল আছে। এসব ক্ষেত্রে প্রবল যৌন অনুভূতিকে ঊর্ধ্বতর স্তরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে রূপান্তরিত করা হয় যে সেটা অধ্যাত্ম সাধনার সহায়ক হ'য়ে ওঠে।

মেকথিল্‌ডের মনে যা উদিত হল সে এক আলো আর ভালোবাসার জগৎ। প্রতিদিন তিনি নতুন নতুন প্রতীক আর উপাখ্যানে এই আলোকানুভূতি ও ঈশ্বর-প্রেমের বিস্ময়কে প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বর নিজেই তাঁকে দেখিয়েছেন যে, কী অন্তহীন রূপ-পরিবর্তন এবং বিচিত্র বর্ণ ও সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে এই পৃথিবীতে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তাঁর মহত্তম প্রকাশ, এবং পূর্ণতম প্রকাশ হল প্রেমের মধ্যে। আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কেন মেকথিল্‌ড্‌ তাঁর এই অন্তরের কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারেন নি, কেন তাঁকে এইসব উপলব্ধিগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে হ'য়েছে, এবং কীভাবেই বা এই ধারণায় উপনীত হলেন যে এইসব উপলব্ধি ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই চঞ্চল আলোকচ্ছটা। তাঁর এই আশ্চর্য অনুভূতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি মানবিক প্রেমের সংজ্ঞা ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। সেখানে আত্মা হল বিবাহের কন্যা আর ঈশ্বর হলেন স্বামী, আর সেই স্বর্গীয় বিবাহে মৃত্যু প্রেমের দ্বারা পরাভূত হয়।

এ মৃত্যুও অবশ্য মরমীরা মৃত্যু, যেখানে চিত্তের সমস্ত নীচ প্রবণতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আত্মা আত্মচিন্তাহীন পবিত্র প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করে। মানুষের মন দেহের সঙ্গে সংপৃক্ত বলে শুধু খৃীষ্টান মরমী-সাধক নয়, সমস্ত কালের সমস্ত ধর্মের মরমী-সাধকই পরম রস-সত্তাকে পার্থিব প্রেমের প্রাকৃতিক ঘটনার ভাষায় বর্ণনা করে গেছেন। যে নারী-প্রেমের বিষয়ে মেকথিল্‌ডের সমসাময়িক আদি-রসের কবিরা আশ্চর্য কবিতা রচনা করেছিলেন, তার থেকে সর্বব্যাপী ঈশ্বরপ্রেমে যাওয়া মেকথিল্‌ডের পক্ষে ছিল অত্যন্তই সহজ ব্যাপার। ঈশ্বরের পক্ষে পূর্ণ-মিলনের ধারণা ছাড়া, তিনি ঈশ্বরের প্রেম ও আলোকের স্পর্শে তাঁর আত্মা কী পরিমাণে উন্মত্ত হ'য়ে উঠত তারও বহু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এ আলোক যিনি পান করেন, যাঁর দেহে এই আলোকের ধারা প্রবাহিত, তিনি এক পবিত্র আলোকময় দেহের অধিকারী হন। অন্ধকারের মধ্যে সর্বমানবের চোখে এ আলো চির ভাস্বর হ'য়ে জ্বলতে থাকে। প্রেম ও আলোকের এই উন্মত্ততার ফলে ইন্দ্রিয়ের জগতে এমন পরিবর্তন ঘটে, এমন সেই শুদ্ধিকরণ যে, তারই ফলে আসে দিব্য-উপলব্ধি এবং পরিশেষে মোক্ষ।

চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি তাঁর উপলব্ধি ও দৈবদর্শনের বিষয়ে খুঁটিনাটি সব কিছু টুকে রাখতে থাকেন। তিনি ল্যাটিন জানতেন না, কাজেই তাঁকে লিখতে হ'য়েছিল "লো জার্মান" ভাষায়। এই কাগজগুলি হাল্‌-এর হাইন্‌রিখ্‌ নামে একজন সন্ন্যাসী সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না। সংগ্রহের কিছুকাল পরে ঐ রচনাগুলি নর্ডলিঙ্গেনের হাইন্‌রিখ্‌ কর্তৃক অ্যালেস্যানিক ভাষায় অনুদিত হ'য়ে সাধারণ লোকের আয়ত্তে আসে। এই গ্রন্থ এখনো আইনসাইদ্রেল্‌নের মঠে দেখতে পাওয়া যায়। অতি সত্বরই এর একটি ল্যাটিন-অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং শোনা যায় দান্তে এই গ্রন্থের দ্বারা খুবই অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন।

মেকথিল্‌ড্‌ যে কেবল নিজের দৈবদর্শন ও অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিষয়ই লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা নয়। তাঁর সমসাময়িক লোকের কাছে এগুলি খুবই মূল্যবান ছিল তা ঠিক। কিন্তু এসব ছাড়াও তিনি তীব্রভাবে তাঁর সমসাময়িক অনেক ব্যক্তির সমালোচনা করে গেছেন। তাঁদের অন্যায় ও দুর্নীতি নাকি গির্জা ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পর্যন্ত প্রবেশ লাভ করেছিল। তিনি সংস্কারের কথা বলে গেছেন, সান্ত্বনা ও উপদেশের বাণী বিতরণ করে গেছেন এবং নিজের উপদেশ অনুযায়ী চলে নিজের জীবনেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। শেষ জীবনে তিনি হেল্‌ফস্টার মঠে ছিলেন। সেখানে গার্ট্রুড ও হ্যাকবার্গের

মেকথিল্‌ড্‌ ভগ্নীদ্বয়ের মধ্যে তিনি 'আত্মার আত্মীয়'কে খুঁজে পেয়েছিলেন। এইখানে ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন। শেষ সময়ে তিনি, মঠের যেসব সন্ন্যাসিনী তাঁর সেবা করছিলেন তাঁদের কাছে, এই কথা প্রমাণিত করে গিয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের প্রতি এক প্রেমময় জীবন অতিবাহিত ক'রে লোকান্তর যাত্রা শ্রেষ্ঠ শান্তিরই নামান্তর, এবং এই শান্তি কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের ফলেই পাওয়া সম্ভব।

তিনি যে লিখিত পুস্তক রেখে গেছেন তা অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব যে ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ড্‌ ঈশ্বর-লাভ করেছিলেন ঈশ্বরের প্রতি জ্বলন্ত ভালোবাসা এবং তীব্রবাসনাময় অটল ও আন্তরিক অধ্যাত্ম-সাধনার ফলে। এরই ফলে তিনি ঈশ্বর দর্শনের দুর্লভ উপলব্ধিও লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। ঈশ্বরকে মুখোমুখী প্রত্যক্ষ করার পরও তাঁর তৃষ্ণা নিবারিত হয়নি, এবং তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিলনে বদ্ধপরিকর হ'য়েছিলেন। এমন বলিষ্ঠ কামনা কোনো বাধাবিপত্তি মানে না। তাই তিনি শেষ পর্যন্ত সেই 'একক সত্তা'কে উপলব্ধি করেছিলেন, যে অবস্থায় পরম শান্তি ও ঐক্যের অনুভূতি বিরাজ করে আর তাকেই বলা যায় সচ্চিদানন্দ। এ অবস্থায় ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর সর্বেসর্বা। সর্বত্রই তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতেন, এবং তাঁর এই বিশ্বলীলার অর্থও তিনি বুঝতে পারতেন। প্রকৃত সত্তা ও অহং-প্ররোচিত মায়া-প্রপঞ্চের বিষয়ে ভেদাভেদ করতে না পারলে সে উপলব্ধি সম্ভবই নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, আমাদের যুগে ভক্তিই হল সব থেকে সহজ, সব থেকে উপযোগী পথ। ম্যাকডেবার্গের মেক-থিল্‌ড্‌ জ্বলন্ত পিপাসা নিয়ে এই পথে চলে প্রেমের উপলব্ধি খুঁজেছিলেন। সেই স্বর্গীয় প্রেম প্রেমিকের উপর ক্ষমাময় সর্বব্যাপী অহংবোধহীনতায় বর্ষিত হ'তে থাকে।

তাঁর রচনার নাম তিনি দিয়েছেন "দি ফ্লোটিং লাইট অব দি গড্‌হেড্‌" এবং ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

"এই গ্রন্থ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং এই কথাগুলি বলেছেন। এই গ্রন্থ সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষ, সমস্ত অসৎ এবং সৎ মানুষের কাছে দূত হিসাবে প্রেরিত হ'য়েছে। স্তম্ভগুলি পড়ে গেলে কর্ম বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এই গ্রন্থ আমাকেই দেখায়, আমারই গোপনতা উদ্‌ঘাটিত করে। এই বাণী যারা শুনতে চায় তাদের অন্তত নয়বার একে পাঠ করতে হবে। এ গ্রন্থের নাম দেওয়া হ'য়েছে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত আলো।" কে এর রচয়িতা? আমার সমস্ত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও

আমিই একে রচনা করেছি, কেননা আমি যা পেয়েছি তা আমি ধরে রাখতে পারিনি। হে প্রভু, তোমার মহিমা কীর্তন করার জন্যে এ-গ্রন্থের কী নাম দেওয়া যেতে পারে? এই নাম বহন করুক এ গ্রন্থ—"ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত আলো, ভেসে আসুক তাদেরই হৃদয়ে যারা অসত্যকে পরিহার করে জীবন ধারণ করতে চায়'।"

ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ধারণা সর্বকালের সমস্ত কর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। ম্যাকডেবার্গের মেকথিল্‌ড্‌ নিজের কালের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। ধর্ম-সংক্রান্ত গোঁড়ামির বুদ্ধিনির্ভর বিতর্ক যখন খ্রীষ্টের প্রকৃত শিক্ষাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, তখন তিনি তাঁর সমসাময়িক লোকদের কাছে এমন একটা অবস্থার বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন যা প্রকৃত প্রস্তাবে অবর্ণনীয় এবং ভাষার আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সেই 'এক ও অদ্বিতীয়ের' পরিচয় দিয়েছিলেন স্পষ্ট ও উদ্দীপনাময় ভাষায়। সাধারণ লোক যারা যান্ত্রিক ও অগভীর বিশ্বাসে গির্জার হস্তক্ষেপেই কেবল চালিত হয়, তাদের কাছে এটা একটা মস্ত বড় সহায় হ'য়ে উঠেছিল। মেকথিল্‌ডের কাছে সেই পরম সত্তা হৃদয়ঙ্গমযোগ্য জীবন্ত অস্তিত্ব যা মানবাত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘটায়। ভাবপ্রকাশের জন্যে মেকথিল্‌ডের আবেগ এমন বস্তুকে অবলম্বন করেছিল যা চেনা-জানা। ঈশ্বর ও আত্মাতে তিনি ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছিলেন, এবং তার উদ্দেশ্য পালনের জন্যে স্বতোৎসারিত চিত্রকল্পবহুল ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। আত্মার মধ্যে কথা বলেন তিনি নিজেই। ঈশ্বর এই আত্মাকে সৃষ্টি করেন এইজন্যে যাতে তিনি দয়িতা হিসাবে তার সঙ্গে প্রেম করতে পারেন; এবং সে প্রেম তিনি দিয়ে চলেন অন্তহীনভাবে।

মেকথিল্‌ডের সমস্ত ধারণাই এই মিলনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এতে প্রথমে দেখা যায় ঈশ্বরের দৈবদর্শন, তারপর আসে ঈশ্বরোন্মত্ততার তুরীয় ভাব, আর এই অবস্থাতেই আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। কখনো কখনো মেকথিল্‌ড্‌ দৈহিক স্তরের উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন—ক্লান্ত আত্মা ঈশ্বরের বুকে বিশ্রাম নিচ্ছে, কিংবা, ঈশ্বর ও আত্মার মিলন যেন জল আর সুরার মিশ্রণ, অথবা এমন কথা যে বাসনা-ব্যাকুল ঈশ্বর প্রেমিক-আত্মার সঙ্গে মিলনের জন্যে দ্রুত এগিয়ে আসছেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর এই প্রেমের ক্ষেত্রে মেকথিল্‌ড্‌ কেবল পরম কিছুই প্রার্থনা করেন। একবার তিনি একটা দৈবদর্শনে স্বর্গের ছবি দেখেছিলেন—যেখানে সকল আত্মা মিলিত হয় এবং দিবারাত্রি ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে।

সাধকেরা তাঁকে নৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান করছিলেন, এবং ঈশ্বরও মেকথিল্‌ডের আত্মাকে সেই নৃত্যে সাধকদের সঙ্গে মিলিত হ'তে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি শুধু ঈশ্বরের সঙ্গেই নৃত্যে যোগ দিতে সম্মত ছিলেন, তাই বলে ছিলেনঃ—

নৃত্যে আমি যোগ দেবনা, যদি না তুমি আমাকে চালিত কর।
যদি তুমি চাও আমি নৃত্য করি,
তুমি তাহলে নিজে গান কর।
তাহলে আমি প্রেমের মধ্যে উত্তীর্ণ হব,
প্রেম থেকে যাব ভক্তিতে,
ভক্তি থেকে যাব উপলব্ধিতে,
উপলব্ধি থেকে যাব সকল মানুষের হৃদয়ে।

এই কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আদি নৃত্য একরকম অধ্যাত্ম অনুশীলন যার দ্বারা বিভিন্ন স্তরের চৈতন্য বিশুদ্ধ হয়, এবং বিশ্ব নিয়ন্তা শক্তিগুলিকে গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়। আত্মা তার কেন্দ্রের চারিদিকে নৃত্য করে, এবং কম্বুরেখায় ঘুরে ঘুরে চেতনার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে আরোহণ করতে থাকে, অবশেষে পরম উপলব্ধি—সেই সচ্চিদানন্দকে পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের দ্বারা ম্যাক্‌ডেবার্গের মেকথিল্‌ড্‌, দেহবাসী হওয়ার সময়েই তাঁর আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, আর তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুতেও তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের কাছেই থাকবেন। সে কোন অলৌকিক শক্তি যার দ্বারা এটা সম্ভব হ'য়েছিল? একি কেবলই আবেগ-উদ্দীপ্ত অতীন্দ্রিয় ভালোবাসা, যা অপ্রতিরোধ্য কল্পনার বশে দেহপ্রভাবিত চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছিল? অথবা এটা কি মানুষের এক ঐশী ক্ষমতা, যা স্বভাবত অহমে আচ্ছন্ন ও সুপ্তভাবে থাকে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে একটি বিশুদ্ধ হৃদয়ে মুক্তি লাভ করে প্রবল আবেগে তার ঐশ্বরিক উৎসের দিকে ধাবিত হ'য়েছে—যেমন চুম্বকের দিকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হয় লোহা!

মেকথিল্‌ডের ভিতর এই যে প্রেমের প্রকাশ, এ এক অজ্ঞেয় শক্তি—এ-বিশ্বের সব চেয়ে প্রবল শক্তি হল এইটেই। তিন প্রকারের প্রেমের কথা জানি আমরা। প্রথম হল সেই জাতের ভালোবাসা যা কেবলই চায়, কিন্তু দেয়না কিছুই। এটা হল নিম্নপ্রকৃতির ইন্দ্রিয়জ ভালোবাসা, আর এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে আত্মসংরক্ষণের বৃত্তি। দ্বিতীয় হল, ব্যবসায়ী-সুলভ ভালোবাসা যা সর্বদাই নিজের

লাভের কথা চিন্তা করে, এবং ভাবে যে সে যতোটা ছাড়ল সেই অনুপাতে তার লাভ হবে কিনা। সমস্ত মানবিক আবেগই এই স্তরে চলে। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা বা লোভ সমস্ত কিছুরই উৎপত্তি এই আত্মকেন্দ্রিক বিনিময়মুখী ভালোবাসা থেকে, এরপর হল সেই সর্বব্যাপী উচ্ছ্বসিত ভালোবাসা, যা কখনোই কিছু চায় না, বিচার করে না বা দাবী করে না। এ প্রেম যীশুর হৃদয়ে জাগ্রত থেকে ক্রুশের উপরে মৃত্যুকে সহ্য করেছিল, মাতার হৃদয়ে জাগ্রত থেকে তাঁকে আগুনের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে সন্তানকে উদ্ধার করতে বলে, এবং এই প্রেমই ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্‌ডের হৃদয়ে জাগ্রত থেকে তাঁকে অহম্‌ বিস্মৃত করে ঈশ্বরের বুকে টেনে নিয়েছিল। এই হল স্বর্গীয় প্রেম, ঐশ্বরিক প্রেম। এই শক্তির বিষয়ে সচেতন থাকলেই তবে ঈশ্বরের সঙ্গে মেকথিল্‌ডের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে অনুমান করতে পারব আমরা। যে ব্যক্তিগত শক্তি একে সৃষ্টি করেছিল, তা একাকী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার দাবী জানিয়েছিল, এবং গির্জার মধ্যস্থতা বা 'পাপস্বীকারে'র ব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বরে মিলিত হওয়ার জন্যে সচেষ্ট হ'য়েছিল।

আত্ম-জ্ঞান দেখা দিলে আত্মা ঐশী যোগাযোগের মাধ্যম হ'য়ে ওঠে। এই অবস্থায় ঈশ্বর আত্মার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেন, আত্মা জানায় ইন্দ্রিয়কে। এই দুজ্ঞের্য়র সন্ধিস্থলে দেহ এবং সত্তা মিলিত হ'য়ে একাকার হ'য়ে যায়। ঈশ্বর এবং ইন্দ্রিয়গুলির মিলন ক্ষেত্র হলো আত্মা এবং কেউ যদি আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার ঐক্যচেতনা আসে, তবে এই আত্মাতেই ঈশ্বর-মিলন ঘটে।

যে আত্মা স্বভাবসিদ্ধরূপেই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং চিরন্তন সে কেন এই দেহের কারাগারে প্রবেশ ক'রে যুগল-বিপরীতের দাসত্ব বরণ করল তা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় না। দেহ চেতন অবস্থায় আত্মার প্রকৃত এবং পরম সত্তা কী, তা আমরা জানতে পারি না। এ যেন জাগ্রত অবস্থায় গভীর সুষুপ্তি কী তা জানতে না পারার মতো। যখন কোনো বাড়ীতে আগুন লাগে তখন প্রথমে আমরা আগুন লাগার কারণ জিজ্ঞাসা না করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি। আত্মা যখন জানতে পারে তার প্রকৃত সত্তা কী তখনই সে তার ঐশী উৎসে ফিরে যায়। কিন্তু ঘরে-ফেরা কেবল দেহ-যানের মধ্যস্থতাতেই ঘটা সম্ভব। জ্ঞান এবং সদসদ্‌ বিচার ক্ষমতা কেবল দেহ এবং তার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মধ্যস্থতাতেই লাভ করা যেতে পারে। দেহ সেইজন্যে অত্যন্ত মূল্যবান এবং খুবই উপযোগী মাধ্যম হিসাবে গণ্য হয়। এই দেহতেই আমরা আমাদের

অস্তিত্বের প্রকৃত সত্তা জানতে পারি এবং সোহম্ হ'য়ে উঠতে পারি। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তাই ওমর খৈয়াম বলেছেন—

এখানে যা মনের মধ্যে পারোনি ধরতে,
মহাশূন্যে তার প্রতিরূপ পারবে কি গড়তে?
দেহ এবং ইন্দ্রিয় যে রয়না অমর্ত্যে!

চিন্তা একটি বেগবান শক্তি এবং এই চিন্তাই আমাদের অবিনশ্বর আত্মার স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে। কিন্তু এই চিন্তাশক্তিই আবার আমাদের ব্যক্তিসত্তা লোপ পেতে বসলে লোহার প্রাচীরের মতো আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। চিন্তা আমাদের চৈতন্যের সেই সব স্তরে যেতে বারণ করে যুক্তিবিচার বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেখানে যেতে পারে না। ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্ডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ঈশ্বর যখনই জানতে দিলেন যে তাঁর আত্মা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করবে, তখন থেকেই তাঁর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস সেই পরম রস-সত্তাকে জানার দিকেই একাগ্র হ'য়ে উঠল। এ পথে বুদ্ধি থাকে পিছনে পড়ে এবং সমস্ত সমস্যাই সমাধান লাভ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি প্রতিবাদ জানাল। তারা বলল, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা উচিত নয়, কারণ আত্মা ঐ জ্বলন্ত দ্যুতি সহ্য করতে পারে না, এবং শীতের শেষে তুষারস্তূপ যেমন গ্রীষ্মের রৌদ্রে গলে যায় তেমনি ঐশী সত্তার অগ্নিময়-বিভা তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। এ-শুনে মনে তাঁর দ্বিধা এল, আর এইভাবে ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে পরীক্ষা করলেন। তাঁর মন নিশ্চয়ই বিচার করতে বসেছিল যে কী সৎ আর কীইবা অসৎ। তাছাড়া তাঁর সময়ের নানা বিতর্কমূলক প্রশ্নও নিশ্চয়ই তাঁকে পর্যুদস্ত করেছিল, অথচ সে সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন কেবল ঈশ্বরই। মরমী সাধনার ক্ষেত্রে এমন অত্যাশ্চার্য ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে, যখন নরদেহী মানুষই ঈশ্বরের বাণী শুনতে পাওয়ার এবং অনুধাবন করতে পারার সৌভাগ্য লাভ করে। মেকথিল্ডের আত্মা তার ঈশ্বরাশ্রিত স্বরূপের বিষয়ে পূর্ণভাবে সচেতন হ'য়ে উঠল এবং সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তিনি লিখলেন—

মাছ কখনো ডুবে যায় না জলে,
পাখি কখনো পড়ে যায় না হাওয়ায়,
ঈশ্বর কখনো অন্তর্হিত হয় না আগুনে,
কেবল উজ্জ্বলতর হয় তাঁর দ্যুতি।
সর্ব প্রাণী সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর
যাতে তারা তাদের স্বভাব অনুসারে বাঁচতে পারে।

কী করে আমি আমার স্বভাবকে এড়িয়ে যাব?
সে যে চায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন?
আদিতে তিনি আমার পিতা,
সর্বমানবে তিনি আমার ভ্রাতা,
প্রেমে তিনি আমার পতি
চিরকাল আমি শুধু তাঁরই।

এইভাবে ঈশ্বরপ্রেম শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার মিলনে পরিপূর্ণতা লাভ করল। মেকথিল্‌ড্‌ তাঁর উপলব্ধির বর্ণনায় সেই এক ও অদ্বিতীয়ের বিষয়ে স্পষ্ট এবং স্পর্শগ্রাহ্য বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ জার্মান মরমীয়াবাদের টানাপোড়েনে বয়ন করেছেন তিনি। তাঁর রচিত কতকগুলি গীতিকবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করা যাক। এই কবিতাগুলিতে কেবল যে কাব্যভাব আছে তা নয়, যথেষ্ট অধ্যাত্ম উপলব্ধিও প্রকাশিত হ'য়েছে এগুলিতে।—

সংসারকে অতিক্রম করতে গিয়ে
সমস্ত বাসনাকে ত্যাগ করে
অহম্‌কে পরাজিত করে
আত্মা আসে ঈশ্বরের নিকটে।
সংসার যদি আঘাত দেয়
তাতে কিছু দুঃখ জাগে না,
দেহ যদি পদাঘাত করে
আত্মা তাতে অসুখে পড়ে না।
শয়তান যদি বিরুদ্ধতা করে
আত্মা তাতে পরাজিত হয় না
সে কেবল ভালোবাসে আর ভালোবাসে,
তা ছাড়া আর জানে না সে কিছুই।

এরপর আবারঃ

তখনই তুমি মনে করবে নিজেকে মুক্ত
যখন প্রেম তোমাকে করবে গ্রহণ;
তোমার সমস্ত শিক্ষাই অসার,
কেননা কিছুই আমি হতে পারিনা প্রেমহীনা।
প্রেম ছাড়া বাঁচতে পারি না আমি;

যেখানে প্রেম সেখানেই যাব আমি
হোক জীবনে অথবা মরণে।
বোকাদের এই পরম বোকামী
যারা বাঁচে দুঃখ আর যন্ত্রণা এড়িয়ে।

কোনো কোনো পাঠকের হয়তো মনে হবে, আবেগ যেন বুদ্ধিকে পদানত ক'রে ফেলেছে, এবং ম্যাগডেবার্গের মেকথিল্ডের মরমী কবিতাগুলিতে দার্শনিক উপলব্ধি যেন কিছু কম। কিন্তু পরবর্তী কবিতা পাঠ করলে বোঝা যাবে তিনি তার উপলব্ধির সাক্ষাৎকার কী অনবদ্য ব্যঞ্জনাময় ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছেন:

জ্ঞানবিহীন প্রেম
আত্মার প্রকৃত অন্ধকার।
উপলব্ধিহীন জ্ঞান
নরক যন্ত্রণার চেয়ে বেশী।

নরউইচের জুলিয়ান

ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে যে সব মহীয়সী ধর্মসাধিকার সাক্ষাৎ পাওয়ায়, ইংরাজ নারীদের মধ্যে সে রকম উচ্চভাবাপন্ন নারীর কথা বলতে গেলে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় নরউইচের সন্ন্যাসিনী জুলিয়ানের নাম। চতুর্দশ শতাব্দীতে মরমী ধর্মসাধনার বেগবান ধারায় ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের দেশগুলিতে বহু ধর্মপ্রাণা নারীর আবির্ভাব ঘটেছিল। যেমন জার্মানীর একহার্ট, টাউলার, সুমো এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রায়েসব্রোয়েক। সেই ধারা ইংলণ্ডের মধ্যেও আলোড়ন এনেছিল। তার পরিচয় পাওয়া যায় হ্যাম্পোলের সন্ন্যাসী রিচার্ড রোলের রচনায়, 'দি স্কেল অব পারফেকশান' গ্রন্থের লেখক ওয়াল্টার হিল্টনের রচনায়, জনৈক অজ্ঞাত লেখকের 'ক্লাউড অব আন্‌নোয়িং' নামক গ্রন্থে, এবং নরউইচের জুলিয়ানের একমাত্র রচনা "দি রিভেলেশান্‌স্‌ অব ডিভাইন ল্যভ", নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে।

এই মরমী লেখকদের ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর সমুদ্রপারের ইউরোপবাসী সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে এঁদের যে কোনো রকম উপায়েই ভাবের আদান-প্রদান হয়নি তা একেবারেই নিশ্চিত। এঁরা ছিলেন জনসাধারণের মধ্যে প্রায় অপরিচিত। কাজেই সেকালের কষ্টসাপেক্ষ এবং অতি সামান্য যোগা-যোগের ব্যবস্থায় যে তাঁরা নিজেদের দেশের বাইরে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত ছিলেন তা বলা বাহুল্য। তাঁদের যা কিছু খ্যাতি তা গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে তাঁদের রচনাবলীর পুনরাবিষ্কারের ফলে ঘটেছে। এটা তাঁদের মৃত্যুর বহুকাল পরের ব্যাপার। আর এই অপরিচিত ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেও সব থেকে অপরিজ্ঞাত ছিলেন বোধহয় নরউইচের অতিদীনা সন্ন্যাসিনী জুলিয়ান।

তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে তাঁর গ্রন্থের বিষয়েই বিশেষ করে বলতে হয়। কারণ তাঁর বিষয়ে সামান্য যা কিছু জানা যায় তার একমাত্র ভিত্তি হল এই গ্রন্থখানি। এ গ্রন্থ এমনভাবে লেখা হয়েছে যে এর প্রতি পৃষ্ঠায় যেন এর রচয়িত্রীকে স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে এমন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ও সরলভাষায় কম গ্রন্থই লিখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এর প্রতি ছত্রে কোমল ও আন্তরিক মানবতা বোধ এবং পবিত্র অধ্যাত্মবোধের যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম ঘটেছে।

তাঁর এই সব দৈবদর্শন ঘটার আগে জুলিয়ান বহু বৎসর ধরে নির্জনবাসিনী সন্ন্যাসিনীর জীবন-যাপন করেছিলেন। (মধ্য যুগের ইংলণ্ডের গির্জা-প্রভাবিত ধর্ম জীবনে এই ধরণের 'নির্জনবাস' খুবই শ্রদ্ধার ব্যাপার ছিল)। ধর্মের বিশেষ এক বিধান পালনের জন্যে তিনি নরউইচের সেণ্ট জুলিয়ান গির্জার দক্ষিণ দিকের অংশে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠেই বাস করতেন। এইখানে সর্বদা চোখের সম্মুখে গির্জার উপাসনা স্থল প্রত্যক্ষ করে তিনি খ্রীষ্টীয় অধ্যাত্মরহস্যের ধ্যান করতে করতে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এবং এইখানেই তিনি সেই-সব ঐশী অভিব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। (যাকে তিনি বলতেন 'দর্শন') যার ভিত্তিতে তাঁর পুস্তকখানি রচিত হ'য়েছিল। তাঁর পারিবারিক পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুধু এইটুকু আন্দাজ করা যায় যে, পরিবারটি নিশ্চয়ই মোটামুটি বিত্তশালী ছিল। না হলে তাঁর এই বাঞ্ছিত উপায়ে জীবন ধারণের সামর্থ্য তাঁর হত না। তাঁর ঐ দৈব-দর্শনগুলির সঠিক তারিখ তিনি যত্নের সঙ্গেই রক্ষা করেছেন। সেই সময়ে তাঁর কথা মতো তাঁর বয়স ছিল "ত্রিশ বৎসর ছ'মাস"। একজন লিপিকার একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন "১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।" কাজেই স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি সত্তর বছর বয়সের পরেও বেঁচে ছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজেকে নিরক্ষরা বলেছেন, ফলে মনে হয় তাঁর গ্রন্থ তিনি নিজে না লিখে অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেন। কী পরিস্থিতিতে এই গ্রন্থের উৎপত্তি ঘটল তা তাঁর নিজের ভাষাতেই স্পষ্ট করে দেওয়া আছে।[১]

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)ঃ "এই 'ঐশী দর্শন'গুলি ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে একজন অক্ষরজ্ঞানহীনা অতি সাধারণ নারীর কাছে প্রকাশিত হ'য়েছিল। সেই দীনা নারী ঈশ্বরের কাছে একদা তিনটি বর প্রার্থনা করেছিল। প্রথমটি ছিল, ঈশ্বরের অনুরাগে পূর্ণমন; দ্বিতীয়টি ছিল, ত্রিশ বৎসর বয়সেই যৌবনে নিজের শারীরিক অসুস্থতা; তৃতীয়টি ছিল, ঈশ্বরের প্রসাদে তিনটি আঘাত লাভ।

"প্রথমটির বিষয়ে আমার মনে হ'য়েছিল যে, খ্রীষ্টের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আরো বেশী ঈশ্বরের করুণা চেয়েছিলাম এবং সেই জন্যেই দিব্যদৃষ্টি কামনা করেছিলাম।.........

---

১ মুদ্রিত সমস্ত সংস্করণই কমবেশী আধুনিক কালের। এখানে যে সর্বাধুনিক সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল সেটির সম্পাদক Desu Roger Hudleston O. S. B.

"দ্বিতীয়টি চেয়েছিলাম অত্যন্ত যন্ত্রণার সঙ্গে; আমি প্রার্থনা করেছিলাম এমন পীড়া যাতে প্রায় মৃত্যুর দরজায় চলে যাই, আর পবিত্র গির্জার যা কিছু মৃত্যু-কালীন ক্রিয়াচার আছে সবই লাভ করি। সেইজন্যেই আমি মৃতবৎ হ'তে চেয়েছিলাম, যাতে উপস্থিত সকলেই আমাকে মৃত বলে কল্পনা করে। আমি তাই সমস্ত রকম দৈহিক ও আধিভৌতিক যন্ত্রণা ভোগ করতে চেয়েছিলাম—সেই সব বিভীষিকা ও যমদূতের বিকট টানাটানি, যাতে সবই ঘটে কেবল প্রাণটুকু কোনোরকমে দেহের মধ্যে থেকে যায়। এই দুটি কামনা......আমি প্রার্থনা করেছিলাম একটি শর্তের সঙ্গ। আমি বলেছিলাম, 'প্রভু তুমি তো জান আমি কী চাই। কিন্তু যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবেই তুমি দিও......কেননা তোমার যা ইচ্ছা নয় তা আমি চাই না।'

"তৃতীয় বরটির বিষয়ে......আমি আমার জীবনে তিনটি আঘাত প্রার্থনা করেছিলাম। এই তিনটি আঘাত হল—ঐকান্তিক যন্ত্রণার আঘাত, সদয় সহানুভূতির আঘাত, এবং স্বয়ংবশ ঈশ্বর কামনার আঘাত। এই শেষোক্ত বরটি কোনো শর্ত আরোপ করে আমি প্রার্থনা করিনি। এর প্রথম দুটি আমার মনের মধ্যে বেশীক্ষণ ছিল না, কিন্তু তৃতীয় আকুতিটি সর্বদাই আমার মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।"

(তৃতীয় পরিচ্ছেদ): "তারপর যখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর ছয়মাস, ঈশ্বর আমাকে একটা দৈহিক পীড়া দিলেন, যার ফলে তিনদিন তিন রাত্রি আমি শয্যাগত হ'য়ে রইলাম। চতুর্থদিন রাত্রে আমি গির্জার যা কিছু ক্রিয়াচার সব লাভ করলাম এবং প্রার্থনা করলাম যেন ভোর হওয়ার আগেই আমার 'মৃত্যু' ঘটে।"

এই অবস্থায় তিনি আরো তিনদিন বেঁচে রইলেন। "এবং তারপর আমার দেহের নিম্নাঙ্গ একেবারে অনুভূতিশূন্য হ'য়ে মৃতবৎ হ'য়ে গেল।......শেষ সময়ের জন্যে পুরোহিত ডেকে পাঠানো হল। তাঁর আসার আগেই আমার চক্ষুদ্বয় স্থির এবং বাক্‌শক্তি বন্ধ হ'য়ে গেল। তিনি এসে আমার মুখের সামনে ক্রুশটি রেখে বললেন, 'আমি তোমার জন্যে পরম ত্রাণকর্তা প্রভুর প্রতিমূর্তি এনেছি।'" এই মূর্তির উপর তাঁর অস্বচ্ছ দৃষ্টি বহুক্ষণ স্থির রেখে তিনি দেখলেন এটি যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠল। আর তারপর,

(চতুর্থ পরিচ্ছেদ): "অকস্মাৎ আমি দেখতে পেলাম, (কণ্টকের) মালার নিচ থেকে উষ্ণ এবং টাটকা রক্তের ফোঁটা ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়ছে!"

এটা হল জুলিয়ানের প্রথম "দর্শন লাভ"। স্পষ্টই বোঝা যায় এটা ঘটেছিল চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে, কেননা ক্রুশের উপর যীশুর মূর্তিটি তাঁর চোখের সামনেই জীবন্ত হ'য়ে উঠেছিল। এর দ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাবই প্রমাণিত হয়। আর সেই জন্যেই পরবর্তী দিব্যদর্শনগুলি সম্ভব হ'য়েছিল, এর প্রথম পনেরটি ঘটেছিল ভোর চারটে থেকে সকাল নয়টার মধ্যে। এ-সময়ে তিনি তাঁর পীড়ার জন্যে কোনো যন্ত্রণা বা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন নি। অবশ্য এর মধ্যে দৈহিক (বা চাক্ষুষ-দৃষ্টি সম্পন্ন) চেতনা এবং বুদ্ধিমূলক চেতনার বিভিন্ন স্তরের 'অনুভূতি'ই লাভ করেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর প্রথম 'দর্শন লাভে'র বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন, "এর সমস্তই তিন উপায়ে দেখা সম্ভব হ'য়েছিল। অর্থাৎ চাক্ষুষ দৃষ্টিতে, আমার মনের মধ্যে সৃষ্ট বাণীর সাহায্যে এবং আধিদৈবিক দৃষ্টিতে।" প্রথম পনেরটি দর্শনের সময় তিনি মূর্তিটির উপর তাঁর দৃষ্টি স্থিরভাবে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, (ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ): "এই সময়ের মধ্যে ক্রুশ থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা হ'য়েছিল, কিন্তু আমার সাহসে কুলায়নি। কারণ আমি ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম যে যতোক্ষণ ক্রুশ-দর্শন করব ততোক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবো......।"

পঞ্চদশ দর্শন লাভের পর "সমস্তই বন্ধ হ'য়ে গেল, এবং আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপরই আমি বুঝতে পারলাম যে আমি বেঁচে থাকব আর হা-হুতাশ করব। আর তখন আমার পীড়া ফিরে এল আমার শরীরে......ঠিক যেমন আগে ছিল। আমার মন আগের মতোই শূন্য আর শুষ্ক হ'য়ে গেল, কোনো সান্ত্বনাই আর খুঁজে পেলাম না। অত্যন্ত দুর্ভাগার মতো আমি আমার দৈহিক যন্ত্রণা আর অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কাতরোক্তি করতে লাগলাম—দেহে আর মনে সমান ভাবেই উৎপীড়িত হ'তে লাগলাম আমি।" (৬৬ পরিচ্ছেদ): দৈহিক যন্ত্রণা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে অত্যন্ত বেদনাময় সন্দেহ ঘন হ'য়ে উঠল। তিনি যা কিছু দেখছেন তা যথার্থ বা সত্য কিনা! তিনি বলেছেন, "এর ফলেই বুঝতে পারা যাবে আমি কী ধরনের জীব।" কিন্তু তারপরেই আবার তিনি বলেছেন, "এ সত্ত্বেও আমার প্রেমময় প্রভু আমাকে ত্যাগ করে গেলেন না। কাজেই রাত পর্যন্ত আমি তাঁর করুণায় বিশ্বাস রেখে পড়ে রইলাম; তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।" ঘুমের মধ্যে তাঁর মন কু-চিন্তার অধীশ্বর শয়তানের দ্বারা আচ্ছন্ন হল। "আমার মনে হল পিশাচটা যেন আমার গলার উপর চেপে বসেছে, আর তার মস্ত বড় মুখ রয়েছে ঠিক আমার মুখের সামনে।......এমন আর আমি কখনো দেখিনি।......এই 'কুশ্রী দর্শন'টি প্রকটিত হ'য়েছিল আমার ঘুমের মধ্যে।

এবং সকলেই তখন ঘুমিয়ে ছিল। কিন্তু......আমাদের প্রেমময় প্রভু আমাকে জাগিয়ে দিলেন, আর তখনই যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম।"

এরপর এল শেষ 'দর্শন', "যেটা ছিল ষোড়শ দর্শন, এবং যার মধ্যে গত পনেরটিরই স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ হল।" (৬৭ পরিচ্ছেদ): "তখন প্রভু আমার অধ্যাত্ম দৃষ্টি উন্মোচিত করলেন, এবং আমার হৃদয়ের মধ্যে আমার আত্মাকে দর্শন করালেন। আমি আত্মাকে দেখলাম, যেন এক সীমাহীন জগৎ, যেন এক পরম শান্তিময় রাজ্য। এবং......আমি অনুধাবন করলাম যে এ এক উপাসনা-রত নগরী, যার মধ্যে বিরাজ করছেন প্রভু যীশু, পরমেশ্বর এবং মানুষ।......আর সেই মানুষ আত্মার মধ্যে উপাসনায় বসে আছে,......শান্তি এবং বিশ্রামে স্থৈর্যময়।......ওদিকে আত্মার মধ্যে যে স্থলে যীশু বসে আছেন, আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সে জায়গা কিছুতেই স'রে যেতে চায় না; কেননা আমাদের মধ্যেই তাঁর সব থেকে প্রিয় আবাস গৃহ, যে আবাস চিরন্তন। আর এই দৃশ্যে তিনি দেখলেন যে মানুষের আত্মা সৃষ্টি করে তিনি কতো তৃপ্ত হ'য়েছেন। কেননা পিতা যেমন আত্মার জনক হ'তে পারেন, তেমনি পুত্রও পারেন আত্মার জনক হ'তে; এবং তাই তিনি করেছিলেন। এইজন্যেই মানুষের আত্মার সৃষ্টিতে "ত্রয়ী ঈশ্বরের" এত অন্তহীন আনন্দ। সেই 'ত্রয়ী ঈশ্বর' আদিতেই বুঝতে পেরেছিলেন কী তাঁর অন্তহীন আনন্দের কারণ হ'য়ে উঠবে।"

এই কথাগুলিতেই জুলিয়ানের গ্রন্থে কী বলা হ'য়েছে তার সারমর্ম জানা যায়। প্রকৃত দেব-দর্শনের অভিজ্ঞতার উপর বিশ বছর ধরে ধ্যান করার পর লিখিত হ'য়েছিল এই গ্রন্থ। ফলে একে এক পরিণত এবং স্বচ্ছ চিন্তার অভিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রাথমিক 'দর্শনে'র এদিকে বা ওদিকে যে কোনো দিকেই হোক, তিনি বহুবার এই বৎসরগুলিতে নানারকম প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম উপলব্ধি লাভ ক'রে নিজের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থখানির বহু বিষয়ের সঙ্গে ঐ যুগে লিখিত অন্যান্য মরমী রচনার তুলনা ও সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা প্রায় প্রথাসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে মিল দেখা গেছে খুবই সামান্য। সে কালের ইউরোপীয় অধ্যাত্ম আন্দোলনের লিখিত কোনো দলিল রেখে যাওয়ার জন্যে নারী হিসাবে জুলিয়ান এমনিতেই প্রায় অদ্বিতীয়া। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার স্বাধীনতা এবং নিজের অন্বেষণের পথে ঐকান্তিক ব্যক্তিগত প্রয়াসের জন্যে তাঁকে একেবারেই অদ্বিতীয়া বলে মনে হয়। "একজন অক্ষরজ্ঞানহীনা অতি সাধারণ নারী" ছিলেন বলে তাঁর সমসাময়িক কালের অন্যান্য অধ্যাত্ম সাধকদের মতো তিনি কোনো দার্শনিক

ভাবধারায় সমৃদ্ধ হ'তে পারেন নি। সে যুগে প্রচলিত অতি প্রবল নয়া প্লেটো-বাদের ফলে একহার্ট, রায়েস ব্রোয়েক বা 'ক্লাউড অব আন-নোয়িঙে'র অজ্ঞাত নানা লেখিকার রচনায় যেমন 'একেশ্বর' বাদের ছায়া দেয়া যায়, জুলিয়ানের রচনায় তার কোনো ছাপই দেখা যায় না। বরং ধারণা হয় যে, তিনি সর্বদা এবং সর্বত্রই যেন 'দ্বৈত' চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এ দ্বৈত-চেতনা অবশ্য প্রচলিত অর্থে নয়, অর্থাৎ সাধারণভাবে যে 'ভালো'র ধারণার সঙ্গে সমান শক্তি সম্পন্ন চিরন্তন এক 'মন্দে'র ধারণা দেখতে পাওয়া যায়, সে অর্থে নয়। এই দ্বৈত-চেতনা আরো মূলগত এবং সর্বব্যাপক অর্থে দেখা যায় জুলিয়ানের রচনায়। এতে তাঁর 'প্রাণীত্বে'র অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছে। তাঁর এই স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট 'প্রাণীত্বে'র ক্ষেত্র থেকেই তিনি আত্মার চোখ দিয়ে তাঁর ত্রাণকর্তার মূর্তির দিকে চেয়েছেন। কাজেই তিনি যখন কামনা জানান যে "ঈশ্বরের অনুরাগে"র সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার জন্যে তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে চান, তখন সেখানে কোনো আত্মসম্প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। এইজন্যে তাঁর রচনায় কখনো তাঁর নিজের সত্তাকে কোনো তুরীয় অবস্থায় অতীন্দ্র মহাসত্তায় বিলীন করে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা দেখা যায় না, এমন কোনো দাবীও তিনি করেন নি। বরং তার পরিবর্তে আমরা বরং দেখতে পাই, একটি অতি দীনা এবং গভীর ভক্তিময়ী নারী, যিনি অত্যন্তই বাস্তবচেতনারূপে নিজের অবিচ্ছেদ্য এবং অনড় মানব-অস্তিত্বের বিষয়ে সচেতন। আর এই পতিত মানব-জীবনের দশাতে যতো কিছু যন্ত্রণা, অন্ধতা, সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক সেগুলির বিষয়েও তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই সচেতন। সেইজন্যে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁর মন কাজ করে চলেছে "সৃষ্টি-স্রষ্টা"—সম্পর্কের পথ ধরে। আর তাই তাঁর রচনার সর্বত্রই দেখা যায় একটি গভীর বিস্ময়ের অনুভূতি, সর্বত্রই শোনা যায় প্রেম ও কৃতজ্ঞতার কণ্ঠস্বর যা বারে বারেই আমাদের কাছে "অন্তরঙ্গ প্রেমময় প্রভু"র কথা বলে। তাঁর নিশ্ছিদ্র মানসিক স্বাধীনতার বিষয়ে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ নেই। কারণ নিরক্ষরা ছিলেন বলে বাধ্য হয়েই তিনি তাঁর কালের দার্শনিক ও চিন্তাশীল ভাবধারার কোনো সুযোগই গ্রহণ করতে পারেননি। আর তাঁর উচ্ছ্বসিত ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর নির্ভরতার বিষয়ে, কিংবা এক জীবন্ত এবং প্রেম-সহানুভূতিময় ঈশ্বর যিনি তাঁকে সৃষ্টি করে ধারণ করে আছেন, সে বিষয়ে চরম বিশ্বাসের বিষয়েও কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু তাঁর এই 'স্রষ্টার-দ্বারা-সৃষ্ট এক-প্রাণী' হিসাবে সুগভীর চৈতন্য সত্ত্বেও কখনো কোনো হীনতা বা দাসমনোভাব দেখা দেয়নি। তাঁর বলিষ্ঠ এবং অনপনেয় দ্বৈত-বোধের ফলে

(অর্থাৎ ম্বলগতভাবে তাঁর 'প্রাণীত্ব' স্বীকার করে নেওয়ায়) অন্যান্য মরমী সাধকের মতো নিজের অতি দীন "তুচ্ছতার" কথা ঘোষণার হাত থেকে রক্ষা করেছে তাঁকে।

জ্বলিয়ানের গ্রন্থের প্রকৃত বক্তব্য কী, এবং কী তার বৈশিষ্ট্য তা উপযুক্তভাবে বিচার করে দেখা হয়নি কখনো। প্রথম দৃষ্টিতে একে মনে হয় "নৃতত্ত্ব ম্বলক" কোনো রচনা, এর মরমী বক্তব্য ধরা পরে দ্বিতীয় চিন্তার পর। এর ভাবপ্রকাশ ও বিষয় বিস্তার চলে বুদ্ধির অতীত এক অন্যতর চৈতন্যের স্তরে। তিনি মানবাত্মার প্রকৃত সত্তা বা ম্বল্যের বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করেন না, কারণ ঈশ্বর এর সৃষ্টি কর্তা। (এ-বিষয়ে প্বর্বে উল্লিখিত তাঁর ষোড়শ 'দর্শনে'র বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তাই শ্রেষ্ঠ সাক্ষী)। তাছাড়া তিনি বলেছেন, (৬৪ পরিচ্ছেদ)ঃ "মান্বষের আত্মা ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, এবং ঈশ্বরের সমস্ত গুণই এতে আছে। বরং তাঁর চেয়েও বেশী গুণ আছে, কেননা এই আত্মা ঈশ্বরকে দেখতে পায়, তাঁকে অবলোকন করে, তাঁকে ভালোবাসে। এরই ফলে ঈশ্বর মান্বষের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করেন, আর মান্বষও আনন্দ পায় ঈশ্বরের মধ্যে—যে আনন্দ, যে বিস্ময়ের শেষ নেই।" আদিতে এই ছিল পরিকল্পনা, এবং চিরকালই এই রকম চলবে। কিন্তু "এই আমাদের ইন্দ্রিয়বশ বর্তমান জীবন জানতে পারে না, আমাদের আত্মা প্রকৃত প্রস্তাবে কী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা নিশ্চিতভাবে এবং পরিপ্বর্ণভাবেই ঈশ্বরকে তার প্বর্ণ মহিমায় জানতে পারি।......ঈশ্বরের কর্বণায় আমাদের স্বধর্মই হল এই যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে আত্মাকে তার প্বর্ণ স্বর্বপে জানার আনন্দ পাওয়ার জন্যে আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করতে হয়।" (৬৬ পরিচ্ছেদ)।

জ্বলিয়ানের আত্মা ছিল অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন, আর তাঁর মনও ছিল তেমনি সবল ও গভীর। ফলে সংসারে 'মন্দে'র অস্তিত্বের বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। আর সম্ভবত এ জ্ঞান তাঁর এসেছিল নিজের আত্মান্বসন্ধানের প্রক্রিয়াতেই। যেমন তিনি বস্তুজগতের ধর্ম স্বচক্ষে দেখার পর এই কথা চিন্তা করে ভাবিত ও হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিলেন যে, ঈশ্বর কী করে এত জোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন, "সবই ভালো হবে, সব কিছ্বই ভালো হবে, যা কিছ্ব ঘটুক সবই ভালো হবে," সংসারে যা সব ঘটে তাতে কেমন ক'রে এটা ঘটবে তা মান্বষের ব্বদ্ধির অগোচর। (২৭নং পরিচ্ছেদ)। তব্ব "বিশ্বাসে'র দ্বারা আমরা জানি যে মঙ্গলময় "ত্রয়ী ভগবান" মান্বষকে তাঁরই প্রতির্বপ অন্বসারে সৃষ্টি করেছেন। এইভাবেই আমরা জানি যে, মান্বষ যখন নিজের পাপের দ্বারা গভীরভাবে অধঃপতিত হয়, তখন

যে-শক্তি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি ছাড়া আর কেউই তাঁকে উদ্ধার করতে পারে না।......এবং আদিতে আমরা যেভাবে ঈশ্বরের প্রতিরূপে সৃষ্ট হ'য়েছিলাম আমাদের সৃষ্টিকর্তা চান যে, অন্তে যেন আমরা নিজেদের পুনর্জীবন পেয়ে ত্রাণকর্তা যীশুর মতোই অনন্ত স্বর্গে অধিষ্ঠিত হই।" (১০নং পরিচ্ছেদ)। কাজেই তিনি চান না যে তিনি যা কিছু দেখান তাতে আমরা ভীত হ'য়ে উঠি। তিনি এসব আমাদের দেখান এইজন্যে যে তিনি চান এসব আমরা জেনে নিই। কেননা এসব জানলেই তবে আমরা তাঁকে ভালোবাসব এবং পছন্দ করব বলে তিনি মনে করেন; এবং তাঁর মধ্যে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ খুঁজে পাব।" (৩৬নং পরিচ্ছেদ)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, মানবাত্মার সঙ্গে সৃষ্টি কর্তার প্রকৃত সম্পর্ক কী, সে বিষয়ে জুলিয়ানের কোনো সন্দেহ নেই। এই সম্পর্কটা হল একাধারে সুবিধা-ভোগী এবং দায়িত্বপূর্ণ। জুলিয়ানের মন ছিল গভীর, প্রাঞ্জল, বাস্তবচেতন এবং স্থিতধী। সেজন্যে, সমস্যাটির একেবারে গোড়ায় কী রয়েছে সে বিষয়েও তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি বলেছেন, (৩৯ পরিচ্ছেদ)ঃ "আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণভাবে দেখে সন্দেহ ও যন্ত্রণার সঙ্গে মহাভয়ে প্রভুকে বললাম, 'ওগো মঙ্গলময় প্রভু, কী করে সবই ভালো হবে? তোমার সৃষ্ট এই মানুষেরা পাপের জন্যে যে আঘাত পায় তার ফলে কী করে ভালো হবে?' এইভাবে যতোদূর আমার সাহসে কুলালো আমি স্পষ্টভাবে আরো কিছু নির্দেশ কামনা করলাম, যাতে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহের নিরসন হয়। এর উত্তরে মঙ্গলময় প্রভু পরম বিনয় ও প্রেমের সঙ্গে দেখালেন যে আদমের ঐ আদিম পাপের চেয়ে বড় কোনো অন্যায় আর হয়নি, হতে পারে না, এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এর ফল একইভাবে থেকে যাবে।......কিন্তু সেই সঙ্গেই তিনি উপদেশ দিলেন যে, আমি যেন মহিমময় সিদ্ধিলাভের দিকটাও প্রত্যক্ষ করি। কেননা এই ত্রুটি স্বীকার ঈশ্বরের কাছে আদমের পাপের ত্রুটির চেয়ে লক্ষ গুণ বেশী প্রিয় এবং আরাধনার বস্তু। এ কথা বলে তিনি এইটেই বোঝাতে চাইলেন যে, আমরা যেন এসব বিশেষ ভাবে মনে রাখি। তিনি বললেনঃ 'যেহেতু আমি সব থেকে বড় ত্রুটিকেই সংশোধন করে নিতে পেরেছি, সেইজন্যে তোমরা জেনে রাখো যে অন্যান্য ছোট ত্রুটিকেও আমি ক্ষমা করে নিতে পারব।' এরপর অতি সুন্দর সেই ৫১ পরিচ্ছেদে "সেবক"-এর কাহিনীতে জুলিয়ান বলেছেনঃ "আদমের পতনে ঈশ্বরের পুত্রই পতিত হ'য়েছিলেন। স্বর্গে যেহেতু সঙ্গতরূপেই ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র একাত্ম, সেইহেতু মর্ত্যে ঈশ্বরের পুত্র (অর্থাৎ যীশু) এবং আদম পৃথক

থাকবে কী করে? (আদম বলতে এখানে আমি সর্ব-মানবকেই বোঝাচ্ছি।) আদম পতিত হ'য়েছিলেন জীবন থেকে মরণে, এই পৃথিবীর হতভাগ্য আধারে, এবং সেখান থেকে নরকে—ঈশ্বরের পুত্রও আদমের সঙ্গেই পতিত হ'য়েছিলেন, আদমের সর্বোৎকৃষ্টা কন্যা, কুমারী মেরীর গর্ভে। তার কারণ ছিল এই যে, এর ফলে আদম যেন স্বর্গে আসেন, এবং এই পৃথিবীতে যে দোষ করেছেন তা থেকে ক্ষমা পান; আর তাঁকে তিনি নরক থেকেও উদ্ধার করেছিলেন।......এই-ভাবে পরম মঙ্গলময় প্রভু যীশু আমাদের সমস্ত দোষের দায় নিজের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন। এর ফলে পরম পিতা ঈশ্বর আমাদের উপর এমন কোনো দোষ এখন দিতে পারেন না বা কোনো কালেও পারবেন না, যা তিনি তাঁর পরম প্রিয় পুত্র যীশুকে দিতে পারেন নি।”

'রিভেলেশানস অব ডিভাইন লাভ' গ্রন্থটিতে আমরা এমন এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি যার চরিত্র-মাধুর্যে আমরা মুগ্ধ হই। তিনি তাঁর "সমধর্মী খ্রীষ্টানদের" জন্যে গভীর ভাবে ভাবিত ছিলেন। তাঁরা তাঁর সম-সাময়িক বা দূর ভবিষ্যতের মানুষ হোক, তাতে তাঁর চিন্তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনি। এক জ্বলন্ত প্রীতির স্থির দীপ্তিতে তিনি কেবল তাঁদের জন্যেই লিখে গেছেন। সেইজন্যে তাঁর কথা দিয়ে শেষ করাই সঙ্গতঃ "এই সময় থেকে আমি প্রায় মাঝে মাঝেই প্রভু কী বলেছেন তা উপলব্ধি করতে চাইতাম। পনের বৎসর বা তারও বেশী সময় পরে আমি অধ্যাত্ম উপলব্ধির দ্বারা এই কথা শুনতে পেলামঃ 'ঈশ্বর এ-বিষয়ে কী বলেছেন, তা জানতে চাও? ভালো করে প্রণিধান করঃ প্রেমই ছিল তাঁর বক্তব্য। কে তোমাকে এটা দেখিয়েছে? প্রেম। কী তোমাকে সে দেখিয়েছে? প্রেম। কী জন্যে সে তা দেখিয়েছে? প্রেমের জন্যে। তার মধ্যেই তুমি নিজেকে ধারণ করে রাখো, তাহলে তার মধ্যেই তুমি আরো অনেক কিছু জানতে পারবে, আর বুঝতে পারবে। কিন্তু অন্য ব্যাপার যা আছে তার শেষ তুমি কোনোদিনও জানতে পারবে না।' এইভাবেই আমি জানতে পেলাম যে ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন প্রেমের কথাই। আর এটাও আমি স্পষ্ট করেই বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করার আগেই আমাদের ভালোবেসেছিলেন। সে প্রেম কখনো শ্লথ হয়নি, কখনো তা হবেও না। এই প্রেমের ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সমাধা করেছেন।......আর এই প্রেমের ভিতরে আমাদের জীবন অবিনশ্বর। আমাদের সৃষ্টির সময়ে আমাদের একটা আদি পর্ব ছিল; কিন্তু যে প্রেমের ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেটা ছিল অনাদি—আর সেই অনাদি প্রেমের মধ্যেই আমাদের সৃষ্টির আদিপর্ব নিহিত এসব

আমরা ঈশ্বরের মধ্যে অনন্তকায়া ধরে দেখতে পাব। যীশু যেন্ দয়া করে তাই করেন। ওঁ শান্তি।"

নরউইচের জুলিয়ানদের যা বাণী তার প্রকৃত তাৎপর্য তাঁর সময়ে কম লোকই বুঝতে পেরেছিল। তাঁর কালের পরে আরো কম লোকে তার মানে বুঝতে পেরেছে। এ-রচনার ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। অবিভক্ত খ্রীষ্টীয় গির্জার পূর্ব-দেশীয় আদি ধর্ম প্রবক্তাগণের[১] সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশী।

১ যথা, সেণ্ট গ্রেগরী অব্ নীসা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সিয়েনার ক্যাথারিণ

ধর্মসাধকদের সুদীর্ঘ নাম-তালিকাতেও এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্ঘট, যিনি বাল্যেই সংসার থেকে বিবাগী হ'য়ে গিয়েছিলেন। এ'রা হলেন পূর্ব-নির্ধারিত, ঈশ্বর-নির্বাচিত ব্যক্তি। এ'দের পবিত্র স্বভাব শৈশবেই প্রকটিত হ'য়ে থাকে। এ'দের মধ্যে সিয়েনার ক্যাথারিণের স্থান খুবই উচ্চে। মাত্র ছয় বৎসর বয়সেই তাঁর প্রথম দৈবদর্শন ঘটেছিল। তারপর থেকে তাঁর অসংখ্য ভাবোন্মাদের দশা এবং ঈশ্বর-উপলব্ধি ঘটেছে।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ক্যাটেরিনা বেনিনকাসা। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ সিয়েনার ফণ্টেব্রান্ডায় তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল গিয়াকোমো বেনিনকাসা এবং জননীর নাম লাপা। তিনি ছিলেন তাঁদের ত্রয়োবিংশ সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন একজন উন্নতিশালী রঞ্জনশিল্পী। তিনি স্নেহময়, শান্তস্বভাব এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। আর তাঁর মাতার সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি সুদক্ষ এবং পরিশ্রমী গৃহিণী ছিলেন। মিথ্যা কথা বলা তাঁর পক্ষে ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। ক্যাথারিনের পিতার জেদ ছিল শুধু একটি মাত্র বিষয়ে, তিনি তাঁর গৃহে কোনো ঈশ্বর চিন্তাহীন খোশগল্প পছন্দ করতেন না। মাতার কাছ থেকে ক্যাথারিণ পেয়েছিলেন তাঁর উদ্যম, কিন্তু পিতার কাছ থেকেই তিনি তাঁর শান্ত স্বভাব ও ধর্মপ্রাণতার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন।

সাড়ে পাঁচশ বৎসর দূরের অতীতে দৃষ্টিপাত করলে দুটি ছোট্ট মানুষকে আমরা দেখতে পাব—ছয় বৎসর বয়সের ক্যাটেরিনা আর তাঁর এক বৎসরের বড় ভাই ফানোস্টে, তাঁদের বড় বোন বোনা ভেণ্টুরার বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে হাত ধরাধরি করে বাড়ী ফিরে আসছেন। তাঁরা যেই ক্যাম্পোরেন্‌গি পাহাড়ের উপর ডোমিনিক্যান সন্ন্যাসীদের গির্জার কাছাকাছি এলেন, ক্যাটেরিনা চোখ তুলে তাকালেন, আর, কী আশ্চর্য, ঠিক তাঁর চোখের সম্মুখে সূর্যাস্তের রঙের বন্যায় দেখতে পেলেন এক আশ্চর্য সিংহাসনে ধর্মযাজকের পরিচ্ছদ ধারণ করে যীশু নিজে বসে আছেন, আর তাঁর পাশে রয়েছেন সন্ন্যাসী পিটার, পল ও জন। শিশু-ক্যাটেরিণা অবাক বিস্ময়ে সে দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন যীশু মৃদু হাস্য করে দুটি আঙ্গুল তুলে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

তাঁর অধৈর্য ভাই জামার হাত ধ'রে টানতে ক্যাটেরিনার সম্বিৎ ফিরে এল; তিনি সেই মহিমাময় দিব্য বিভার দ্বারা আচ্ছন্ন অবস্থায় নীরবে বাড়ীর দিকে

এগোতে লাগলেন। এবং বাড়ী এসেও কাউকেই তিনি একথা জানালেন না। অবশ্য এরপর থেকে তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম অন্যভাবে নির্ধারণ করতে লাগলেন। প্রায়ই দেখা যেত, তিনি ফন্টেব্রান্ডার সেই বিরাট বাড়ীর কোনো অন্ধকার কোণকে গুহা বলে কল্পনা করে নিয়ে সেখানে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলা করছেন। সেখানে তিনি নিজের মতো করে উপবাস, উপাসনা এবং আত্মসংযম অভ্যাস ক'রে আনন্দ লাভ করতেন।

সাত বৎসর বয়সে তিনি সত্যিই সন্ন্যাসী হওয়া স্থির করলেন। তাঁদের বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে লেক্কেটো বলে কয়েকজন সন্ন্যাসী বাস করতেন। একদিন ক্যাটেরিনা একখানা পাঁউরুটি হাতে ক'রে নগরের প্রবেশদ্বার দিয়ে বেরিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে তিনি সোল্লাসে একটি গুহা আবিষ্কার করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা সেখানে উপাসনা করার পর ক্রমে ক্রমে তাঁর সাহস কমে আসতে লাগল, তিনি ভীত হ'য়ে উঠলেন। সূর্যাস্তের পর নির্জনতা যেন তাঁকে গ্রাস করে ফেলল, মনে হল কোথায় কতো দূরে তাঁদের বাড়ী। এক অদ্ভূত দুর্বলতায় তাঁর পায়ের জোর কমে এল, মাথা ঘুরতে লাগল। তারপর যেন মেঘের উপর ভাসতে ভাসতে, কী উপায়ে তিনি জানেন না, দেখতে পেলেন তিনি নগর-প্রাচীরের মধ্যে এসে পড়েছেন। সেখান থেকে দৌড়ে তিনি বাড়ী চলে এলেন। তারপর থেকে আর কখনো সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টা করেন নি তিনি! কিন্তু ঐ যে তিনি কয়েক ঘণ্টা নির্জন গুহায় উপাসনা করেছিলেন, তার ফল দাঁড়ালো এই যে, তিনি ভগবান যীশু খৃষ্টের বধূ হিসাবে আত্মনিবেদন করলেন। তিনি মাতা মেরীর মূর্তির সামনে প্রার্থনা ক'রে জানালেন, "আমি তোমার কাছে এবং তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আর কোনো স্বামী আমার হবে না।" এই সময় থেকে তরুণী ক্যাথারিণ তাঁর অভ্রান্ত সুদীর্ঘ উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সংযম সাধনাও শুরু করলেন। তিনি আমিষ খাদ্য ছেড়ে দিয়ে কেবল রুটি এবং শাক-সব্জী খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন।

তাঁর বারো বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতামাতা তাঁর বিবাহের জন্যে উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু ক্যাথারিণ এসব কথা কানেই তুলতে চাইলেন না। তাঁর পিতামাতা শাসন করেও ব্যর্থ হওয়ায় তাঁরা তাঁদের ধর্মপুত্র টোমাসো-ডেল্লা ফন্টে-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখন ডোমিনিকান পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পরে তিনি ক্যাথারিণের প্রথম 'স্বীকারোক্তি-গ্রাহক হিসাবে নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

তিনি এসে ক্যাথারিণকে বললেন, "কন্যা, যদি তোমার উদ্দেশ্য এত দৃঢ় হয় তবে তোমার কেশকর্তন ক'রে-তার প্রমাণ দাও।" ক্যাথারিণের চুল ছিল খুবই সুন্দর। তবু তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে সেই চুল কেটে ফেললেন। ক্যাথলিক ঐতিহ্য অনুসারে তাঁর এই কাজের দ্বারা প্রমাণিত হল যে তিনি ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদিতা। কিন্তু তাঁর পিতামাতা এতে সম্মত হলেন না। তাঁরা ক্যাথারিণের জন্যে একটা পুরো ঘর ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করলেন, বাড়ীর পরিচারিকাকেও ছাড়িয়ে দিলেন। এরপরে উপাসনার জন্যে ক্যাথারিণ যতো সময় দিতে পারতেন তার বেশীর ভাগই গৃহকর্মে ব্যয়িত হ'তে লাগল।

তবু ক্যাথারিণ আনন্দের সঙ্গে তাঁর কাজকর্ম করতে লাগলেন। তিনি কল্পনা করলেন, তিনি যেন নাজারেথের পবিত্র গৃহে বাস করছেন।—তাঁর ধর্মপ্রাণ পিতা হলেন যীশুখৃীষ্ট, তাঁর মাতা হলেন পবিত্রকুমারী মেরী, তাঁর ভ্রাতা ও ভগ্নীরা হলেন শিষ্যমন্ডলী। যে ঘরে ক্যাথারিণ তাঁর একজন ভগ্নীর সঙ্গে থাকতেন, একদিন ভালোমানুষ গিয়াকোমা সেই ঘরে ঢুকে দেখতে পেলেন যে ক্যাথারিণ নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করছেন, আর একটি সাদা ঘুঘু তাঁর মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাঁর কাছে এটা একটা ঐশ্বরিক নির্দেশের মতোই মনে হ'য়েছিল, তাই তিনি সেইদিন থেকে ক্যাথারিণকে নিজের ইচ্ছামতো জীবন চালাতে স্বাধীনতা দিলেন। তিনি ক্যাথারিণের জন্যে রান্না ঘরের নিচে একখানি ছোট ঘর নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেইটে হল ক্যাথারিণের নির্জন প্রকোষ্ঠ. আর সেইখানে নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে তিনি অসীম দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করে কঠোর আত্মসংযমে রত হলেন। সে প্রকোষ্ঠ এখনো বর্তমান আছে দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি আহার হিসাবে গ্রহণ করতেন কেবল সামান্য দু'একখন্ড রুটি এবং কাঁচা শাকসব্জি। ঘুম কমিয়ে কমিয়ে তিনি এমন অভ্যাস করে ফেললেন যে আটচল্লিশ ঘন্টায় মাত্র দু ঘণ্টা তিনি ঘুমাতে লাগলেন। এইটেই, তিনি তাঁর স্বীকৃতি গ্রাহকের কাছে বলেছিলেন, "আত্ম-অতিক্রমের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।"

ক্যাথারিণ ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। তিনি নিজেও ডোমিনিকান সম্প্রদায়ভুক্ত একজন 'ম্যাণ্টেলেট' হ'তে চেয়েছিলেন। এই 'ম্যাণ্টেলেট' সন্ন্যাসিনীগণ সিয়েনায় খুব খ্যাতি-সম্পন্না ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বেশ পরিণত বয়স্কা নারী, প্রায়ই বিধবা, থাকতেন নিজেদের বাড়ীতেই এবং কোনো দীক্ষাও নিতেন না, কিন্তু সৎকর্মে তাঁরা জীবন অতিবাহিত করতেন। ক্যাথারিণের বয়স কম বলে তাঁকে এই সম্প্রদায়ে নেওয়া হত কিনা সন্দেহ, কিন্তু

ইতিমধ্যে তাঁর পানবসন্ত হওয়ার ফলে তিনি অনেকটা কুরূপা হ'য়ে পড়েছিলেন, সেইজন্যে ম্যাণ্টেলেট সম্প্রদায়ের অধিনেত্রী তাঁর মধ্যে কোনো উদ্বেগজনক সৌন্দর্যের ছাপ দেখতে পেলেন না। তাছাড়া ক্যাথারিণের প্রকৃত ধার্মিক স্বভাবও অধিনেত্রীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কাজেই ক্যাথারিণ ঐ সম্প্রদায়ে গৃহীতা হলেন। এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এক রবিবার সকালে ক্যাপেলা ডেলে ভল্টেতে নিয়মমতো ম্যাণ্টেলেট সম্প্রদায়ে প্রবেশলাভ করলেন।

তারপর থেকে তিনি বাড়ীতে তাঁর সেই নির্জন প্রকোষ্ঠেই থাকতে লাগলেন। কেবল গির্জায় যাওয়ার জন্যে যা বাইরে আসতেন। আত্মশুদ্ধির জন্যে তিনি কঠোরভাবে সংযম অভ্যাস করতে লাগলেন, কেননা আত্মশুদ্ধি না হলে আত্মজ্ঞান পাওয়া যায় না, এবং আত্মজ্ঞান না পেলে ঈশ্বর প্রাপ্তিও অসম্ভব ব্যাপার তাঁর 'ডায়ালগ' নামক গ্রন্থে দেখা যায় ঈশ্বরের 'কণ্ঠস্বর' বলছে ঃ "সেইজন্যে আমি বলছি, এইটেই হল পথ, তুমি যদি পূর্ণ জ্ঞান লাভ কর এবং 'অনন্তপিতা'রূপী আমার মধ্যে আনন্দ লাভ কর, তবুও কখনোই তুমি আত্মজ্ঞানের বাইরে যেতে পারবে না।.........তাই আত্মজ্ঞানের মধ্যে তুমি যেন অহম্ রূপে থেকে না যাও। তুমি তখন জানতে পারবে, তোমার এই সত্তা এসেছে আমার ভিতর থেকেই। কারণ তুমি এই সংসারে আসার আগেই আমি তোমাকে এবং অন্য সকলকেই ভালোবেসেছি।"

ক্যাথারিণের পত্রাবলীতে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই লেখা আছে, "চল যাই আত্মজ্ঞানের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করি।" এতেই বোঝা যায় নির্জন প্রকোষ্ঠ বাসের জীবন তাঁর পক্ষে কতখানি ছিল। এর মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করে ধন্য হ'য়েছিলেন। খ্রীষ্ট প্রায়ই সূর্যাস্তের পর তাঁর সামনে আবির্ভূত হতেন। সঙ্গে কখনো কখনো তাঁর প্রিয় বন্ধুমণ্ডলীও থাকতেন। যেমন সেণ্ট জন দি ইভাঞ্জেলিস্টা, মেরী ম্যাগডোলেন, সেণ্ট ডোমিনিক বা সাধুদের অন্য কেউ। ক্যাথারিণ লিখে গেছেন, তিনি দিব্য সঙ্গীতের সুধাশ্রাবী সুরলহরী শুনতে পেতেন, নন্দন কাননের পারিজাতের ঘ্রাণ পেতেন। যীশুর জন্যে তার প্রেমের আবেগে তিনি নারীজীবনের সমস্ত আত্মনিবেদনের চরিতার্থতা খুঁজে পেতেন। তাঁর ক্ষীণকায় দেহ শেষ পর্যন্ত এই প্রেমেই লীন হ'য়ে গিয়েছিল বলা চলে।

আত্মমগ্ন হ'য়ে 'সঙ অব সলোমনে'র স্তোত্র পাঠ করার সময় যীশু সেই প্রকোষ্ঠে এসে দর্শন দিয়ে তাঁকে চুম্বন দান করেছিলেন। সেই স্পর্শে তাঁর জীবন অবর্ণনীয় মাধুর্যে পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল। তখন তিনি যীশুর কাছে তাঁর

কী করণীয় তাই জানতে চেয়েছিলেন—এমন কাজ, যাতে তিনি কখনো যীশুকে ভুলে না যান বা অবিশ্বাসিনী না হন।

ঐ নির্জন প্রকোষ্ঠে বাস করার শেষের বৎসরগুলিতে যখন তাঁর বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর তখন ক্যাথারিণ অত্যন্ত চেষ্টা করে ধীরে ধীরে পড়তে শিখেছিলেন। সে যুগের পক্ষে এ কৃতিত্ব খুব সহজপ্রাপ্য ছিল না। তাঁর লেখা দেখলে বোঝা যায় তাঁর প্রিয় গ্রন্থ ছিল ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্রগুলি। আর তাঁর সব থেকে প্রিয় ছিল রোমান ক্যাথলিক গির্জার দৈনন্দিন ক্রিয়াচারের বর্ণনা বা 'ব্রেভিয়ারী'।

এই পর্বের চূড়ান্ত পরিণতি এল এমন একটা অবস্থা থেকে যাকে বলা হ'য়েছে খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্যাথারিণের "অতীন্দ্রিয় বিবাহ"। এটা ঘটেছিল ১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রিলেন্টিন কার্নিভ্যালে'র শেষ দিনে। যখন জনসাধারণ বাহিরে উৎসব আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়েছিল, সেই সময় তিনি তাঁর নির্জন প্রকোষ্ঠে অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে উপবাস ও উপাসনায় মগ্ন ছিলেন।

প্রভু খ্রীষ্ট তখন তাঁর সামনে আবির্ভূত হ'য়ে বলেছিলেন, "যেহেতু তুমি পৃথিবীর সমস্ত রকম আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করে কেবল আমারই প্রেমে একনিষ্ঠ আছ সেই হেতু......দেখ, আমি তোমার স্রষ্টা এবং ত্রাতা, তোমাকে বধূভাবে গ্রহণ করলাম......।" এই উপলব্ধির পর, ক্যাথারিণের যে-প্রেম ছিল কেবল ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনার পর্যায়ে, তা সক্রিয় জনসেবার জীবনে রূপান্তর লাভ করল। এতদিনে সময় এল, যখন তাঁর স্বর্গীয় দয়িত তাঁকে প্রেমের মহিমায় ঐশ্বর্যবতী করে সংসারের পথে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর প্রতিদিন তিনি তাঁর প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে স্থানীয় নগরের অসুস্থ ও দুঃস্থদের সেবা করতে শুরু করলেন। তাঁর শান্ত-স্নিগ্ধ উপস্থিতি, নিঃস্বার্থ সেবা ও অসন্দিগ্ধ ধর্মপ্রাণতার জন্যে কেবল যে দেহই নিরাময় হত তা নয়, অনেক আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিরও পরিবর্তন সাধিত হত।

ক্রমে ক্রমে তাঁর আধ্যাত্মিক গুণাবলীর পরম শক্তি সাধারণ্যে প্রকটিত হ'তে লাগল, এবং তাঁর চারিদিকে ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এর মধ্যে কেবল তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের ভক্তিমতী নারীরাই ছিলেন না, বহু সন্নাসী, ধর্মযাজক এবং কয়েকজন দুর্ধর্ষ বেপরোয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদের কয়েকজন তাঁদের বেপরোয়া জীবন থেকে ক্যাথারিণের ভাস্বর অধ্যাত্ম শক্তির প্রভাবেই ধর্ম-জীবনে ফিরে এসেছিলেন। এ'রা তাঁর সঙ্গী হিসাবেই থেকে গেলেন, এবং পরবর্তীকালে এ'রা তাঁর কর্মসচিব হিসাবে কাজ ক'রে অসংখ্য চিঠিপত্রের লিপিকার হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

ক্যাথারিণ তাঁর এইসব ভক্তবৃন্দকে “প্রিয় সন্তান” বলে অভিহিত করতেন। তাঁর সঙ্গে এঁদের ভালোবাসার বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। আর তিনি বয়সে যদিও খুবই নবীনা ছিলেন, তবু তাঁর ক্রমবর্ধমান ভক্তগোষ্ঠী তাঁকে ‘স্নেহময়ী শ্রীমা’ বলেই ডাকতেন। তাঁর ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সর্বদাই প্রদীপ জ্বলত খুবই উজ্জ্বল-ভাবে। সেইখানে তাঁর পুণ্যাত্মা স্বভবের চুম্বক-প্রভাবে ভিড় জমত প্রতিদিনই। তাঁদের কেউ আসতেন ভক্তিতে, কেউ বিস্ময়ে, আবার কেউ বা নেহাৎই কৌতূহলের বশে।

রেমণ্ড অব ক্যাপুয়া ছিলেন তাঁর “স্বীকৃতি গ্রহণকারী” এবং জীবনী রচয়িতা। তিনি বলেছেন, ক্যাথারিণের ভাবাবেশের সময় কীভাবে “তাঁর দেহ মাটি ছেড়ে হাওয়ায় ভাসত। আর তখন তাঁর চারিদিক দিব্য গন্ধে আমোদিত হত।” কিন্তু এই একই ক্যাথারিন, যিনি প্রভু যীশুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অপূর্ব আনন্দ লাভ করেছিলেন জীবনে, তাঁকেই পরবর্তীকালে দেখা যেত একদল ভক্ত নরনারীর নেত্রীত্ব গ্রহণ করে ইউরোপের লোকক্ষয়ী মহামারী “ব্ল্যাক ডেথে”র সময় সেবাকার্য পরিচালনা করেছেন। শহরের সব থেকে বেশী রোগাক্রান্ত পল্লীগুলিতে, হাসপাতালে, পথে-ঘাটে সর্বত্রই দেখা যেত এই সেবাময়ী নারীকে। এমন কি অনেক সময় তিনি স্বহস্তেও কবর দিয়েছেন গলিত, কৃষ্ণবর্ণের মৃতদেহগুলিকে। আর সব কিছুর মধ্যেও তিনি ছিলেন শান্ত-স্নিগ্ধ, পীড়িত ও মুমূর্ষুর শুশ্রূষা ও সান্ত্বনার উৎস।

এরপর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্যাথারিণের কর্মপ্রভাবের কথা বলার আগে সে যুগের সাধারণ অবস্থার বিষয়ে কিছু বলা উচিত।

১৩০5 খ্রীষ্টাব্দ থেকে পোপগণ রোমের ‘শাশ্বত নগরী’ ত্যাগ করে রোন নদীর তীরে অ্যাভিগননে বাস করছিলেন। পোপের রাজ্যগুলিতে অন্তর্ঘাতী যুদ্ধবিগ্রহের শেষ ছিল না। এমন কি রোম নগরীতে গির্জা ও সন্ন্যাসীদের মঠগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল। ধর্মযাজকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল দুর্নীতি, চারিত্রিক স্খলন ও পাপাচার। তাঁরা তখন দরিদ্রদের শোষণ করে সীমাহীন বিলাস প্রমোদে মত্ত হ’য়ে উঠেছিলেন।

পঞ্চম আরব্যান ছিলেন প্রথম পোপ যিনি রোমের “পবিত্র নগরে”র উপর পোপের অধিকার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ফরাসী রাজা এবং কার্ডিনালদের প্রতিবাদ সত্বেও ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল অ্যাভিগনন ত্যাগ ক’রে চলে আসেন। তারপর রোমের সাধারণ মানুষের আনন্দোল্লাসের ভিতর দিয়ে তিনি ১৬ই অক্টোবর ঐ নগরীতে প্রবেশ করেন।

এইভাবে বহুকাল পর খ্রীষ্টের মর্ত্য-প্রতিনিধি "পবিত্র নগরী"তে পুনরধিষ্ঠিত হলেন। আরব্যান ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী ত্যাগ করেন। এবং সেই বৎসরই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্য একজন ফরাসী ধর্মযাজক একাদশ গ্রিগোরি নাম গ্রহণ করে পোপের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। যাই হোক, ক্যাথারিণের কাছে পোপ ছিলেন খ্রীষ্টের পার্থিব প্রতিনিধি। তিনি তাঁর চোখে ছিলেন সমস্ত দোষ ত্রুটির ঊর্ধ্বে। আর ক্যাথলিক গির্জা ক্যাথারিণের কাছে মনে হত খ্রীষ্টের পরম প্রিয়া বধূ। সেইজন্যে তিনি যখন দেখলেন যে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন না ক'রে তাঁর কর্তৃত্বের সিংহাসন থেকে দূরে স'রে আছেন তখন অত্যন্তই ব্যথিত বোধ করতে লাগলেন।

সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই ১৩৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রভাবশালী পোপের দরবারে চিঠি লিখছেনঃ "অতএব আমি ইচ্ছা করি এবং আশা করি যে, একজন বিশ্বস্ত সেবক ও সন্তানের মতো আপনি খ্রীষ্টের রক্তদান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে পুরুষের মতো সাহস এবং যত্ন সহকারে প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। এবং আমি এও আশা করি যেন আপনি ভোগবিলাস বা দুঃখযন্ত্রণার দ্বারা বিচলিত হ'য়ে এপথ থেকে যেন কখনো সরে না দাঁড়ান, এবং শেষ পর্যন্ত যেন আপনার এই প্রতিজ্ঞা থাকে।" এই চিঠিতেই ক্যাথারিণ সর্বপ্রথমে গির্জা প্রতিষ্ঠানের হাল ধরতে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন। সিয়েনার এক রঞ্জনশিল্পীর একজন অশিক্ষিতা কন্যা যে শাস্তির ভয় না করে—বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পোপকে সম্বোধন করার সময় তাঁর পত্রে "প্রাণাধিক বাবাজীবন" বলে উল্লেখ করতে পেরেছিলেন তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি কতো প্রবল ছিল। এই ধর্মসাধিকার ভিতরে সত্যের শক্তি এত স্বপ্রকাশ ছিল যে তিনি প্রায়ই নিজেকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম ক'রে ফেলেছেন বলে দেখা যায়। যেমন, ফ্রান্সের রাজাকে চিঠি লেখার সময়ে তিনি বলেছেন, "ঈশ্বর এবং আমার অভিপ্রায় পালন করুন।" কিংবা পোপকে লিখেছেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং আমার ঐকান্তিক কামনা পরিপূর্ণ করুন।"

তখন খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়াও পোপের রাজ্য এবং টাসকান প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলছিল। ক্যাথারিণ পোপের বিরুদ্ধাচারীগণকে যথেষ্ট তিরস্কার করে পোপকে এক চিঠিতে অগ্রসর হওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ যখন

ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন, তখন ক্যাথারিণ তাঁকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালেন।

সেকালের রাজনৈতিক জগতে পোপের আধিপত্যই ছিল বেশী। এই দিকে ক্যাথারিণের অধিকার প্রবেশের জন্যে তাঁকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে অবস্থিত ডোমিনিকান ধর্ম-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় ও উপদেশাবলীর বিষয়ে জানানোর জন্যে তাঁকে ডেকে পাঠানো হ'য়েছিল। রেমন্ড অব ক্যাপুয়া এই সময়ে ক্যাথারিণের অধ্যাত্ম উপদেষ্টা এবং স্বীকৃতি গ্রহণকারী নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। ক্যাথারিণের বিষয়ে অনুসন্ধান সভার সভাপতিও নিযুক্ত হ'য়েছিলেন তিনি। ক্যাথারিণের অসাধারণ ধর্মপ্রাণতার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হ'লেন তিনি, এবং ক্যাথারিণকে তাঁর অধ্যাত্ম গুরু বলে স্বীকার করে নিয়ে সেই ধর্মপ্রাণা নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন।

পোপের কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণ এবং শোষণমূলক দুর্ব্যবহার এত সীমাহীন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের জনসাধারণ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। অল্প সময়ের মধ্যেই আশীটি নগর পোপের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়াল। ফ্লোরেন্সের জনগণের উপর অন্যায় অবিচারে ক্যাথারিণের হৃদয় রক্তাক্ত হ'য়ে উঠল, কিন্তু তিনি যেহেতু বিশ্বাস করতেন যে পোপ অন্যায়ের ঊর্ধ্বে সেজন্যে পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাঁর পক্ষে একটা মারাত্মক পাপ বলে বিবেচিত হ'য়েছিল। তিনি ভাবতে লাগলেন, যদি একবার পবিত্র পিতা পোপ ইটালীতে ফিরে আসতেন? দোলাচল-চিত্ত গ্রিগোরিকে তিনি লিখলেন, "বীরপুরুষের মত ফিরে আসুন, কিন্তু মনে রাখবেন, প্রাণের মায়া থাকলে অস্ত্র হাতে আসবেন না, নিরীহ 'মেষে'র মতো ক্রুশ হাতে আসবেন।"

কিন্তু পোপ ইতিমধ্যেই একজন কার্ডিনালের অধীন ভাড়াটে সৈন্য প্রেরণ করে ফেলেছিলেন। এই কার্ডিনাল পরে সপ্তম ক্লেমেণ্ট হ'য়েছিলেন। যাই হোক, তার পরেই মেসেনার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা শুরু হ'য়ে গেল। তখন ক্যাথারিণ একদিকে যেমন ফ্লোরেন্সবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করতে বললেন, অন্যদিকে গ্রিগোরিকে বললেন ক্ষমাশীল হ'তে। তারপর ফ্লোরেন্সের অধিবাসীরা তাঁকে অ্যাভিগননে গিয়ে পোপের সঙ্গে আলোচনা চালানোর জন্যে সম্মত করালো।

১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ক্যাথারিণ একদল বিশ্বস্ত অনুচর এবং দোভাষী-হিসাবে নিযুক্ত রেমন্ড অব ক্যাপুয়াকে নিয়ে অ্যাভিগননে উপস্থিত হলেন। সেখানে এমন জোরালোভাবে তিনি ফ্লোরেন্সের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদন

জানিয়েছিলেন, আর তাঁর গভীর আধ্যাত্মিকতা এতোই শক্তিশালীভাবে প্রতিভাত হ'য়েছিল যে, 'পবিত্র পিতা' পোপ সমস্ত ব্যাপারটি ক্যাথারিণের হাতেই ছেড়ে দিলেন। ব্রাদার রেমন্ড বলেন, পোপ বলেছিলেন, "আমি যে আন্তরিকভাবেই শান্তি চাই তা তোমাকে দেখানোর জন্যে, সমস্ত আলোচনার ভার তোমার উপরেই আমি ছেড়ে দিলাম, শুধু দৃষ্টি রেখো যেন গীর্জার সম্মান অক্ষুন্ন থাকে।"

ক্যাথারিণ তারপর দুর্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত গ্রিগোরিকে অ্যাভিগননের বিলাসী-জীবন ও সুখৈশ্বর্য ছেড়ে রোমে এসে তাঁর ন্যায্য সিংহাসন গ্রহণ করতে সম্মত করালেন। অবশেষে অনেক উত্থানপতন ও টালবাহানার পর ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পোপ রোমে চলে এলেন। ক্যাথারিণের একটা প্রবল মনস্কামনা পূর্ণ হল এইভাবে।

এরপর আবার ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথারিণকে শান্তিদূতের ভূমিকায় দেখা গেল। গ্রিগোরি তাঁকে কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে ফ্লোরেন্সে পাঠালেন। ক্যাথারিণ ফ্লোরেন্সবাসীদিগকে পোপের বশ্যতা স্বীকার করাতে সক্ষম হলেন। কিন্তু এই কাজের জন্যে আর একটু হলেই তিনি প্রায় শহীদ হ'য়ে যেতেন। সশস্ত্র জনতার সামনে তিনি তাঁর গলদেশ উন্মুক্ত ক'রে তাঁদের নেতাকে আঘাত করতে বললেন। তিনি তখন যা বলেছিলেন তা হল এই যে, "আমি ক্যাথারিণ। ঈশ্বরের অভিপ্রায় মতো আমার উপর তোমরা যে শাস্তি ইচ্ছা বর্ষণ কর। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে আমি তোমাদের বলছি, আমার সঙ্গীদের কাউকেই তোমরা আঘাত করো না।" এই কথা শুনে জনতা হতবুদ্ধি হ'য়ে চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল।

গ্রিগোরি ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর পরে একজন ইটালীবাসী ধর্মযাজক ষষ্ঠ আরবান নাম ধারণ করে পোপের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর পোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক "বিশাল ভাঙন" দেখা দিল। সংস্কার-প্রচেষ্টায় তাঁর উৎসাহ ছিল খুবই তীব্র, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল যেমন কর্কশ, কর্মপদ্ধতিও ছিল তেমনি মারমুখী। কাজেই আবার আমরা দেখতে পাই ক্যাথারিণ তাঁর কাছে চিঠি লিখে অনুরোধ জানাচ্ছেন, যেন তিনি "তাঁর স্বভাবের প্ররোচনায় যেসব চঞ্চলমতি কাজকর্ম করছেন সেগুলিকে একটু সংযত রাখেন।" কিন্তু তাঁর অনুনয় ব্যর্থ হল। বিরুদ্ধ দলের ব্যক্তিরা আরবানকে খ্রীষ্ট-বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন, এবং জেনেভার রবার্ট তাঁর সমর্থকগণের দ্বারা "পোপ" সপ্তম ক্লিমেণ্ট হ'য়ে নির্বাচিত হলেন।

খ্রীষ্টান জগতের বিশৃঙ্খলা দলাদলি মিটিয়ে ঐক্যস্থাপনই ছিল ক্যাথারিণের একমাত্র প্রয়াস। কাজেই এটা তাঁর বুকে কঠোর হয়ে বাজল। আরবান তাঁকে

রোমে ডেকে পাঠালেন। প্রায় চল্লিশজন ভক্ত ও বন্ধু নিয়ে তিনি ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রোমে উপনীত হলেন। কেবল ভিক্ষার দ্বারাই জীবনধারণ করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন তিনি। সেজন্যে তাঁর ক্ষুদ্র ভক্ত-গোষ্ঠীর প্রায়ই অনশনের দশায় উপস্থিত হত। যাই হোক, রোমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পোপের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তিনি ক্লিমেণ্টকে অনুরোধ জানালেন যেন অবিলম্বে রোমে সমস্ত পুণ্যাত্মা সাধু-সন্ন্যাসীদের আহ্বান করা হয়। নিয়ত উপাসনার মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করার ফলে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যাকিছু সদ্‌বস্তু আছে তাঁদের মধ্যে সেগুলি বীজাকারে থাকার সম্ভাবনা। গির্জা প্রতিষ্ঠানের চরম সংকট সময়ে তাঁরা এসে গির্জার শত্রুশক্তির বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য প্রাকারের মতো দাঁড়াবেন এইটেই স্বাভাবিক।

এ আবেদনে সাড়া এল এতোই কম যে তাতে কোনো কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ক্যাথারিণ তাঁর পরিকল্পনার ব্যর্থতার ফলে যে কতোখানি হতাশ হ'য়েছিলেন তা জানা যাবে কোনো নির্জনবাস-ত্যাগে অসম্মত সন্ন্যাসীর প্রতি প্রেরিত এই তীব্র ভর্ৎসনাময় ছত্র ক'টিতে ঃ "তবে বলি, অধ্যাত্ম-জীবনকে খুবই লঘুভাবে দেখা হবে, যদি মনে করা হয় যে স্থান-পরিবর্তনেই তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। তখন এইটেই বোঝা যাবে যে ঈশ্বর কেবল বিশেষ স্থানেই সীমাবদ্ধ এবং কেবল জঙ্গলেই তাঁকে পাওয়া যায়। শত প্রয়োজনেও অন্যত্র তাঁর সাড়া পাওয়া যায় না!"

এরপর ক্যাথারিণের সংক্ষিপ্ত পার্থিব জীবন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমাগত ব্রত উপবাস পালন এবং জ্বলন্ত আত্মানুসন্ধানের ফলে তাঁর শরীর এমনিতে ক্ষীণ হ'য়ে এসেছিল। এরপর গির্জা প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন অধঃপতনের সুতীব্র মনোবেদনায় তিনি সত্যিই পীড়িত হ'য়ে পড়লেন। ক্যাথারিণ একজন কবিও ছিলেন। তাঁর জনৈকা ধর্মপুত্রীকে লিখিত একখানা চিঠির এই উদ্ধৃত অংশ থেকে তাঁর কল্পনার ঐশ্বর্যের প্রমাণ পাওয়া যাবে।—"আত্মা হল এক বৃক্ষ, প্রেমের বৃক্ষ। প্রিয়তমা কন্যা, স্বাধীন ইচ্ছা-রূপী উদ্যান-পালক যদি সেই বৃক্ষকে যথাস্থানে রোপণ করে, অর্থাৎ রোপণ করে, অহংকারের পর্বতগাত্রে নয়, প্রকৃত আনুগত্যের উপত্যকায়, এতে সুগন্ধি সদ্‌গুণের পুষ্প মঞ্জরিত হবে, এবং সর্বোপরি সকল পুষ্পের শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের নাম-মাহাত্ম্য।...... কিন্তু সর্বোচ্চ এবং শাশ্বত মঙ্গলের আলোতে জানা যায় যে, মানুষ কেবল ফুলের আহার্যে বেঁচে থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে ফলের খাদ্যে; (কেননা ফুলের খাদ্য আমাদের মৃত্যুমুখে নিয়ে যাবে, বাঁচিয়ে রাখতে পারে শুধু ফলের আহার্য)

সেইজন্যে ফুলগুলি ঈশ্বর নিজে গ্রহণ করেন, এবং আমাদের দান করেন শুধু ফল।"

ক্যাথারিণের জীবনে গোধূলির অস্তরাগ ঘনিয়ে এল। এ সেই ক্যাথারিণ যিনি তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের শেষে তাঁর মহত্তম উপলব্ধিতে বলেছেনঃ "আমি হলাম সেই সত্তা, যিনি 'সৎ'ঃ তুমি হলে সেই নারী যে অ-'সৎ'।" জীবনের শেষ ভাগে তিনি তার মহৎ সাহিত্য কীর্তি 'ডায়লগ' নামক গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। এ গ্রন্থ তিনি তাঁর ভাবাবেশ ও ধ্যানের সময় স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকে যেসব প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তারই সংকলন বিশেষ। আর তাঁর ভাবোন্মাদনার অবস্থাতেই সচিব ও পার্ষদ তার অনুলিপি নিয়েছিলেন। ক্যাথারিণের পরমাত্মা এবং খ্রীষ্টের মধ্যে কথোপকথনের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টকে স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে সেতু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।—

"'কী মহান ঐ আত্মা,' শাশ্বত সত্তার কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করলেন, যে আত্মা ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র অতিক্রম করে আমার কাছে, 'প্রশান্ত সমুদ্রে' আসতে পেরেছে, আর সেই সমুদ্রে, যে সমুদ্র হলাম আমি, সেখানে, তার হৃদয়-কুম্ভ ভরে নেবে সে!" বিশ্বের ধর্ম-সাহিত্যে আর কোথায় এমন বর্ণনা পাব যা এই উক্তির চেয়ে বিরাটতর, মহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে পারে? এমন বাণী কেবল কোনো ভারতীয় ঋষি বা সুফী মরমী-সাধকের দ্বারাই উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল।

কয়েকমাস আগে থাকতে খাদ্য গ্রহণ প্রায় একরকম বন্ধ ক'রে ক্যাথারিণ কেবল পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেই জীবন ধারণ করছিলেন, ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এতো দুর্বল হ'য়ে পড়লেন যে জলও পেটে রাখতে অক্ষম হ'য়ে পড়লেন। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন এক ঐশ্বরিক প্রেমের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠতে লাগল, যে অগ্নিতে কয়েক মাস পরে তিনি একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিলেন। রেমন্ডকে তিনি লিখেছিলেন, "এই দেহ কোনো রকম খাদ্য, এমন কি এক বিন্দু জল ছাড়াই জীবিত আছে। এমন সুমধুর দৈহিক যন্ত্রণা আর কখনো আমি ভোগ করিনি। আমার জীবন যেন ঝুলছে এক সূক্ষ্ম সূত্রে।" তাঁর নিদারুণ শারীরিক কষ্টভোগ এবং তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গির্জা-প্রতিষ্ঠানের দুর্দশায় যে যন্ত্রণা তিনি সহ্য করে-ছিলেন, তাতে অন্য কোনো সাধারণ মানুষ হলে অনেক আগেই শেষ হ'য়ে যেতেন।

চারিদিকে তক্তা দিয়ে ঘেরা একখানি কাঠের উপর যেন কফিনের মধ্যে শুয়েই ক্যাথারিণ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ আটদিন অতিবাহিত করেন। এই "স্নেহময়ী শ্রীমা"কে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর অধ্যাত্মিক "সন্তানগণ"। তিনি

প্রত্যেককে ডেকে ডেকে আশীর্বাদ করে পরস্পরকে ভালোবাসতে বললেন। তাঁর বর্ষীয়সী মাতাও তখন তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন।

মৃত্যুকালীন শেষ পুণ্যকৃত্য লাভ করার পর তিনি তাঁর প্রিয়তম যীশুর কথার পুনরাবৃত্তি করে অনুচ্চ স্বরে বললেন, "পিতা, তোমারই হাতে আমার আত্মাকে সমর্পণ করলাম আমি।" তারপর পরম শান্তিতে উদ্‌ভাসিত মুখে লোকান্তর যাত্রা করলেন তিনি।

সিয়েনার ক্যাথারিণ ছিলেন খ্রীষ্টীয় গির্জার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমী-সাধিকা। অধ্যাত্ম-সাধনার গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তবু তিনি সমসাময়িক বহির্জগতের সমস্ত রকম নিষ্ঠুরতা, বিভীষিকা ও নৃশংসতার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অবিচল সাহসে নিজের কঠিন কর্তব্য সমাধা করেছিলেন।

সমসাময়িক ব্যক্তিদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল অত্যন্তই বেশী। এই সামান্য নিবন্ধের প্রথম অংশে তাঁর কিছু কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের পবিত্র প্রতিনিধি পোপ ছিলেন খ্রীষ্টান জগতের সর্বোচ্চ শক্তিমান ব্যক্তি। তিনি যেমন ক্যাথারিণকে পরামর্শের জন্যে ডেকে পাঠাতেন, তেমনি সেকালের বহু রাজা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তি ও সুপণ্ডিত ধর্মযাজকগণ তাঁর কাছে উপদেশের জন্যে আসতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হ'য়েছে যে, তাঁর জীবিতকালে কেবল তাঁর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেই শত শত মানুষ ভক্তিময় ধর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।

বর্তমানের বিশ্বচিত্র যদিও একেবারে অন্যজাতের পটভূমিতে আঁকা, তবু সিয়েনার এই মহীয়সী ধর্মসাধিকাকে অনুসরণ করে আমরা আজও অনুরূপ সাহস ও নৈতিক বিশুদ্ধতায় বলীয়ান হ'য়ে জীবনের এই কেনা-বেচার হাটে সবরকম দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হ'তে পারি।

যে বাণী তিনি এ সংসারে রেখে গেছেন তা শাশ্বত। জগৎ আছে দুটি : একটি হল, পাপ ও মৃত্যুময় সাংসারিক জগৎ; আর অন্যটি হল, আত্মত্যাগ ও প্রাণময় প্রেমের জগৎ। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রবেশদ্বার হলেন যীশু, তিনিই হলেন "বাণী"। যিনি অহমে আশ্রিত, তিনি এমন কিছু আশ্রয় করেছেন যা নশ্বর, কাজেই তাঁর কোনো সদ্‌গতি নেই। কিন্তু যিনি যীশুতে আশ্রিত, তিনি এমন কিছু আশ্রয় করেছেন যা শাশ্বত, কাজেই তাঁর মুক্তি অবধারিত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অ্যাভিলার টেরেসা

যে নারী পরবর্তী কালে ধর্মসাধিকা টেরেসা নামে পরিচিতা হ'য়েছিলেন, তিনি ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন দেশের ওল্ড্ ক্যাস্টিল নামক প্রদেশের অন্তর্গত অ্যাভিলাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অভিজাত শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি তৎকালীন স্পেনদেশীয় কঠোর রীতি অনুযায়ী গৃহসীমাতেই বেড়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে প্রত্যেক স্পেনীয় পরিবারই গৃহসীমাতে বন্ধ থাকত। কেবল আত্মীয়স্বজন এবং অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিরাই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারত। আর মেয়েরাও কেবল গির্জায় গিয়ে উপাসনায় যোগ দেওয়া ছাড়া অন্য সময় বড় একটা বাইরে বেরোতেন না। যাই হোক, তাঁর প্রথম জীবনের বিষয়ে টেরেসার কাছ থেকে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে জানা যায়, বারো বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন। এই মাতৃবিয়োগের ফলেই তিনি খ্রীষ্ট জননীর কাছে সান্ত্বনা খোঁজার জন্যে তাগিদ বোধ করেন। তাছাড়া আরো জানা যায় যে, বীর কাহিনী-বিষয়ক পুস্তকাদি এবং সাধক-জীবনী পাঠ করতে তিনি খুবই প্রেরণা বোধ করতেন। এইগুলি পাঠের ফলে তাঁর কল্পনাপ্রবণ বালিকা মন খুবই উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছিল। তিনি এবং তাঁর এক ছোট ভাই প্রায় স্থিরই করে ফেলেছিলেন যে, বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে 'মুর'-দের হাতে মৃত্যুবরণ করে তাঁরা শহীদ হবেন! কিন্তু নগর প্রাচীরের বাইরে তাঁরা যেতে পারেন নি এই যা রক্ষা!

তাঁর ষোল বৎসর বয়সে পিতা তাঁকে এক অগাস্টিনিয়ান ধর্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর একজন সমসাময়িকের মতে তিনি হাসি-খুশি, সুশ্রী, পোষাক ও অলঙ্কার-প্রিয় ছিলেন। তাছাড়া অন্যের কাছ থেকে মর্যাদা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর খুবই ছিল।

এই সময়ে একবার গুরুতরভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ার ফলে তিনি বাড়ী চলে এলেন। তারপর শরীর সারানোর জন্যে এক বিবাহিত ভগ্নীর কাছে চলে গেলেন। পথে তিনি এক কাকার বাড়ীতে ছিলেন কয়েকদিন। সেই কাকা তাঁকে "লাইভ্স্ অব দি সেণ্টস্" নামে গ্রন্থখানি জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বললেন। এই গ্রন্থ পাঠের সময় জীবনের অন্তঃসারশূন্য তুচ্ছতার বিষয়ে প্রথম চেতনা এল টেরেসার। নরকের ভয় তাঁর উপর চেপে বসল, "পার্গেটোরি" নামে নরকের শাস্তির ভয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লেন তিনি। এর সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে

হবে, সে সময়ে স্পেন দেশে ধর্মে অবিশ্বাসের জন্যে উৎপীড়নমূলক অনুসন্ধান বা 'ইনকুইজিশানে'র দাপট বিশেষ কমেনি। সন্ত্রাস ও উৎপীড়ন ছিল সাধারণ নিয়ম, নরকের ভয় বিভীষিকা সৃষ্টি করে রেখেছিল।

এই অবস্থায় তিনি ধর্মজীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অবশ্য তাঁর নিজের ভাষাতেই "এটা ততোটা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার জন্যে ছিল না, যতোটা ছিল ভয়ের জন্যে।" তবু তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তার কারণ এই যে, ধর্মজীবনের দুঃখকষ্ট পার্গেটোরির যন্ত্রণার চেয়ে কম বলে মনে হ'য়েছিল তাঁর।

তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব চলল প্রায় তিন মাস, তারপর তিনি তাঁর পিতাকে নিজের সংকল্পের কথা জানালেন। পিতা বললেন, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে তবে যেন টেরেসা সন্ন্যাসিনীদের মঠে প্রবেশ করেন। কিন্তু টেরেসা আগেই মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন, কাজেই এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিতে পারলেন না। এরপর টেরেসা সত্যিই বাড়ী থেকে পালালেন, এবং কনভেন্ট অব ইনকারনেশান নামে এক মঠে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এসময়ে তাঁর বয়স ছিল একুশ বৎসর। পরের বৎসরই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

সারাজীবনই টেরেসার স্বাস্থ্য ছিল খুবই খারাপ। দীক্ষা নেওয়ার পরের কয়-বৎসর সব থেকে খারাপ কেটেছিল তাঁর। তিনি স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্যে এক বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রেরিত হলেন। পথে তাঁর সেই কাকার সঙ্গে আরেকবার দেখা করেছিলেন তিনি। এই দেখা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জীবনে। এতে প্রায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল বলা যায়। তাঁর কাকা তাঁকে 'ধ্যানে'র উপর একখানি বই দিলেন। এবিষয়ে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। তবে নির্জনতা তিনি খুবই ভালোবাসতেন এবং অন্তর্জিজ্ঞাসাতেও তাঁর খুবই আসক্তি ছিল। কাকার দেওয়া এই বইখানি হল তাঁর পথ প্রদর্শক, পরামর্শদাতা এবং বন্ধু; কেননা এর পরে কুড়ি বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় কাউকে তিনি পাননি যিনি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝে তাঁর গুরু হ'তে পারেন।

এদিকে চিকিৎসার ফলে তাঁর অসুখ আরো বেড়ে যেতে লাগল। ফলে তাঁকে অ্যাভিলাতে ফিরিয়ে আনা হল। তাঁর তখন মনে পড়ল 'জব্'-এর বাণীঃ "ঈশ্বর যখন আমাদের আশীর্বাদ জানান, তখন তিনি আমাদের তিরস্কারই বা করবেন না কেন?" গুরুতরভাবে অসুস্থ তিনি প্রায় মৃত্যুর সীমায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর সমাধিস্থল প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি বেঁচে উঠলেন। শোনা যায় তখন তিনি এই কথা বলেছিলেনঃ "কেন আমাকে ফিরিয়ে আনা হল?

আমি নরকদর্শন করেছি। আমি সেইসব সন্ন্যাসিনী-গৃহ দেখেছি, যা আমাকে স্থাপনা করতে হবে। এগুলি আমাকে করতেই হবে, বহু মানুষের জীবন আমাকে রক্ষা করতে হবেঃ একজন প্রকৃত ধর্মসাধিকা হওয়ার আগে আমার মৃত্যু নেই।"

তিনি যখন মঠে ফিরে এলেন তখনো তিনি অসুস্থ এবং অসুখী। তারপর প্রায় কুড়ি বৎসর তাঁর আনুগত্য ঈশ্বর এবং সংসারের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিল। এই সব দিনের কথা বিবৃত করে তিনি লিখে গেছেনঃ "আমি যখন জাগতিক সুখ সম্ভোগের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম তখন আমি এই কথা ভেবে অনুতপ্ত হতাম যে ঈশ্বরের কাছে আমি কতো ভাবেই না ঋণী। কিন্তু যখন ঈশ্বরের শরণ নিলাম তখন আমি জাগতিক সুখসম্ভোগের জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠলাম।"

যাই হোক, ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে টেরেসা তাঁর অধ্যাত্মজীবনে দ্রুত একটা পরিবর্তন ঘটছে বলে বুঝতে পারলেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে এমন একটা পর্ব এসেছিল, যার কথা ভেবে পরে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর জীবনে সুস্পষ্ট দুটি স্তরভাগ আছে। একটি হল সাধারণ সাংসারিক জীবন; অন্যটি, ঈশ্বরোপলব্ধিময় অধ্যাত্মজীবন। তিনি মনে করতেন একমাত্র ধ্যানের দ্বারাই তাঁর এই সুগভীর পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছিল।

টেরেসা 'শিশু যীশু' বিষয় সাধন পদ্ধতিতে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ অনুভব করেননি। যতো তিনি অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, ততো তাঁর দাসীসুলভ আতঙ্ক বাৎসল্যের আতঙ্কে রূপান্তরিত হচ্ছিল, এবং ততোই তাঁর দিব্য প্রেম যেন প্রবলতর হ'য়ে উঠছিল, যার ফলে যীশুকে তিনি স্বয়ংবরার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ ক'রে তাঁকেই পরম গুরু এবং পরম বন্ধু হিসাবে একান্ত করে চাইতে লাগলেন। এই লক্ষ্যসাধনের জন্যে তিনি কোনো প্রয়াসই বাকী রাখলেন না, এবং আগে যে তিনি এতো আত্মপ্রশংসা এবং নারীসুলভ অহমিকায় মগ্ন ছিলেন সে সব অনায়াসে ত্যাগ করে নিজের জন্যে ভিক্ষা করে পর্যন্ত খাদ্যসংগ্রহে প্রস্তুত হলেন। শোনা যায় যে, যখন টেরেসা 'ইনকার্নেশানের' মঠ ত্যাগ ক'রে নিজে সেন্ট যোসেফের মঠ স্থাপন করতে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ছিল কেবল একটি তালিমারা আলখাল্লা এবং একখানি চিরুণী।

এই ধর্মসাধিকা তাঁর পথে চলার জন্যে আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন? খুবই সামান্য। প্রতিদিন সামান্য কিছু সময় শুধু ঈশ্বরকে নিবেদন করাঃ একটি কি দুটি ঘণ্টা কেবল তাঁর কাজে ব্যয় করা। নির্জন বাস গ্রহণ করা এবং নীরবতা পালন করা। এসব কি কখনোই করা হ'য়ে ওঠেনি? এর ফলে কতো

লাভ! আর একবার যদি এ সাধনায় ব্রতী হওয়া যায়, সংসারে যাই হোক, কিছুতেই এটা ছাড়া যায় না।

ধ্যানের দ্বারা সংসারের বাধাবিপত্তি এবং চিত্তবিক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়া যায়। তখন সদসদ্ বোধ আসবে। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আসবে। তারপর চিত্তশুদ্ধি যখন সম্পূর্ণ হবে, ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করা হবে সহজ ব্যাপার।

টেরেসার মতে 'ধ্যানে'র চারটি স্তর আছে। এবিষয়ে কী তিনি বলতে চান তা বোঝানোর জন্যে একটি উপমা ব্যবহার করেছেন তিনি।

প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছ থেকে শুকনো, নিষ্ফলা ও আগাছায়-ভরা একখণ্ড জমি পায়। আমাদের দায়িত্ব হল, তাকে বাগানে পরিবর্তিত করা। বাগানটি আমাদের নয়। প্রভুর জন্যেই তাকে পরিচর্যা করতে হবে। আর এতে অন্য কোনো পুরস্কারের আশাও করা উচিত না, প্রভুর প্রতি ভালোবাসার জন্যেই করতে হবে এ কাজ।

আমাদের প্রথম কাজ হল, আগাছা-নিড়িয়ে চাষ করে মাটিতে জল ঢালা। আমাদের কুয়োর ভিতর থেকে বালতি ভরে ভরে জল তুলতে হবে। এখানে জল আন্তরিক ভক্তির প্রতিরূপ। সংসারের এবং ইন্দ্রিয়ের দাবী-দাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিতে হবে নিজেকে, মন ফিরিয়ে নিতে হবে নিজের মধ্যে। তারপর আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এই পথেই আসবে আত্মবোধ ও জ্ঞান।

এইভাবে বৈরাগ্য আনতে বহু সাধনার প্রয়োজন। টেরেসা স্বীকার করেছেন, এই সাধনা তাঁর খুবই কঠিন মনে হ'য়েছিল; কেননা তিনি ঈশ্বরকে স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি যখন সেদিন এল তখন তিনি দেখলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা গেল কেবল অন্তরেই।

প্রথম অবস্থায় ভক্তি যদি কিছু কম আসে তাতে অযথা ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করে অন্তরে তাঁর উপস্থিতিকে তৈরী করে নিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁকে সন্তুষ্ট করে, তাঁকে পাওয়ার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা তিনি হৃদয়ে জেবলেছেন, সেই জন্যেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তারপর অবিচ্ছিন্ন সাধনা সত্ত্বেও যদি ব্যর্থতা, বিরক্তি এবং আধ্যাত্মিক শুষ্কতা অনুভব করা যায় তবে বুঝতে হবে সেইটেই হল চরম সংকটময় পরীক্ষার সময়। কেননা তখনই আমরা তপস্যা ছেড়ে দিতে প্রলুব্ধ হই। টেরেসা নিজেই এইভাবে বহু বৎসর উপাসনা ও ভক্তিতে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন।

তখন তিনি অধীরভাবে সেই সময়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতেন যখন তাঁর মুক্তি আসবে। এই প্রলোভনকে জয় করতে হবে। এটা হল আধ্যাত্মিক জীবনের চিত্ত-শুদ্ধির অঙ্গ। তারপর যখন বাস্তবের অনন্যরূপভাবে চিত্তবৃত্তিগুলি অন্তর্মুখ হয়, আরো গুরুতর প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। টেরেসা বলেছেন, এই পর্বে 'শয়তান' তাঁকে ক্রোধ এবং বিরক্তির দ্বারা উত্তেজিত করত।

অন্য সময় দন্দেহ এবং ভয় অমোদের আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। বিচারবুদ্ধি যেন তমসাবৃত হ'য়ে যায়। প্রথমের সেই তীব্র বাসনা চলে গিয়ে প্রেম যেন অনেক ঠান্ডা হ'য়ে আসে। কেবল শুষ্কতা এবং বন্ধ্যাত্ব যেন অন্তরে একাধিপত্য করে। এইসব চিত্তবিকারে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘটতে থাকে—যেমন পাল তোলা নৌকা জোরে হাওয়া না বইলে চলছে বলে বোঝা যায় না।

এই সময়ে আমাদের কর্তব্য হল আরো আন্তরিকভাবে বিচার করা যে, কী কী কারণে আমরা সংসারের সঙ্গে আবদ্ধ আছি এবং প্রতিদিন আরো বেশী ক'রে আমাদের কামনাকে বিসর্জন দেওয়া। এর পরের স্তরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্যে।

'জলধারা' এখন আরো স্বচ্ছন্দে বইছে দেখা যাবে। আত্মা মনঃসংযোগ লাভ করেছে, উচ্চতর স্তরে উন্নীত হ'য়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আদর্শকে গ্রহণ ও ধারণ করে রাখতে পারছে না। অথচ এই আদর্শই তার পরম প্রেমের বস্তু। ঈশ্বর তখন সোজাসুজি আত্মার কাছে বাণী পাঠাতে থাকেন, আত্মা তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতে থাকে। একটা শান্তির ভাব সমস্ত মনে পরিব্যপ্ত হ'য়ে যেতে থাকে, আত্মা তার নবলব্ধ শান্তির জগতে বিরাজ করতে থাকে। কোনো কোনো সাধক এই শান্তি ও সৌন্দর্যের জগতেই অবস্থান করতে থাকেন। চৈতন্যের যে আরো উচ্চতর স্তর আছে এ-বিষয়ে তাঁরা সচেতন হন না। সে অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কী? অনাগত পরমশান্তির আস্বাদ এইভাবে উপভোগ করার সময়ে আমাদের আন্তরিক দীনতার সঙ্গে আত্মনির্বাচিত কর্তব্যটিকে সমাধার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে। আমাদের অন্তরে দিব্য প্রেম জাগ্রত হ'য়ে এমন দীনতা ও বিনয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করবে, যা নিজের চেষ্টায় আমরা কখনোই পেতে পারি না। তখন নিঃস্বার্থ চিন্তায় অন্যের প্রতি ভালোবাসাও সম্ভব হ'তে থাকে। বাগানের ফুল গাছে তখন কুঁড়ি দেখা দিতে থাকে, বোঝা যায় ফুল ফুটতে আর বেশী দেরি নাই।

তৃতীয় পর্বে আমাদের আর জল ব'য়ে আনতে হয় না। জলের উৎসকেই তখন আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি দেখা যায়। আত্মা তখন দিব্য মহিমার শান্তিময়

সমুদ্রে অবগাহন করেছে। অবশ্য এটাও ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলনের অবস্থা নয়। কিন্তু আত্মা তখন ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'য়েছে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই সে তখন তৃপ্ত নয়। এই পর্বে আত্মা বিশ্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। টেরেসা বলেন, এই পর্বে তিনি আর নিজের অধিকারে ছিলেন না, ঈশ্বরেরই একাধিপত্যে চলে গিয়েছিলেন।

এইবার আত্মার বাগানে সদ্‌গুণের ফুলগুলি নিজের প্রয়াস ছাড়াই ফুটে উঠতে থাকে। পরম প্রেমিক ঈশ্বর নিজেই মালীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আত্মা তখন নিজের বিভূতি অনুভব করতে পারে। কিন্তু অন্যকে তা দান করার অবস্থা তখনো আসতে দেরি থাকে।

ধ্যানযোগের শেষ পর্বে এসে বাগানে জল দেওয়া আর নিজের কর্তব্য থাকে না। স্বর্গ থেকে তখন করুণার শিশির বিন্দু ঝরে পড়তে থাকে। আত্মা থাকে তখন নিষ্কাম ও নিষ্ক্রিয়, সামান্যতম সাংসারিক বন্ধনও তখন আর অবশিষ্ট থাকে না। চিত্তশুদ্ধির প্রক্রিয়া তখন প্রায় সম্পূর্ণ হ'য়ে আসে, এবং আমরা সিদ্ধির কাছাকাছি এসে পড়ি। এরপরই আত্মা ঈশ্বরোপলব্ধির পরমানন্দ উপভোগ করে; এবং বুঝতে পারে, দিব্য মিলনের অবস্থায় সমস্ত সত্তাই চলে যায়, সেই পরম একই সর্ব সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেন।

টেরেসার এই রূপকটি শেষ করতে গেলে বলা যায়, এইবার আসে ফসল-তোলার সময়। ঈশ্বর নিজেই তাঁর বাগানের ফলগুলি বিতরণ করেন তখন। শুদ্ধ ও নিষ্কাম আত্মা তখন জানতে পারে, তার নিজের ক্ষমতায় সে কিছুই পায় না। তখন সে এই কথা বলে যে, আমাদের সক্রিয় প্রয়াস ছাড়াই আমরা চারিপাশের লোকদের অধ্যাত্ম-উন্নতি ঘটাতে পারি। টেরেসা নিজেই বলেছেন যে, ফুল থেকে তখন সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াবে, এবং অন্যরা কী এক আশ্চর্য উপায়ে সুগন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

টেরেসাকে অনেক কঠিন অগ্নি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছিল। তিনি যে সব ব্যক্তির কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা তাঁর ঈশ্বরোপলব্ধি ও ভগবদ্‌দর্শনের কথা যত্রতত্র বলে তাঁকে বিপদে ফেলে-ছিলেন। এর ফলে অ্যাভিলার লোকজনদের কাছে তিনি খুবই কৌতূহলের পাত্রী হ'য়ে উঠেছিলেন। সাধারণ লোকের মধ্যে এমন একটা সন্দেহ জেগেছিল যে টেরেসার 'দিব্য দর্শন'গুলি ঈশ্বরের প্রকাশ না হ'য়ে শয়তানের কাণ্ডও হতে পারে। এমন কি তার 'স্বীকৃতি' গ্রহণকারী ধর্মযাজকেরাও এ-বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে ইতস্তত করছিলেন। এতে টেরেসা মনে মনে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন।

ফলে আত্ম পরীক্ষার এই স্তরেও মুক্তির পথে তাঁকে একাই অগ্রসর হ'তে হ'য়েছিল। ঈশ্বরের পদাঙ্ক অনুসরণই ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। এছাড়া আর যা সান্ত্বনা তা লাভ করেছিলেন নিজের অন্তরের উৎস থেকে, এবং সামান্য কয়েকজন প্রবুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছ থেকে। এতেই নিজেকে সাধনার পথে অবিচলিত রাখতে পেরেছিলেন।

প্রেমের পথ ত্যাগ না করে এবার তাঁকে কর্মের পথ অনুসরণ করতে হ'য়েছিল। ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল এই যে, তিনি নীরবতা ও দারিদ্র্যের ব্রত পালন করে মানুষকে ত্রাণ করার কর্মে নেমে আসবেন।

তাঁর নিকট পরিবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি প্রচলিত অবস্থার সংস্কার করা আবশ্যিক বলে বুঝতে পারলেন। সন্ন্যাসিনীগণ ঈশ্বরের কাছে আত্ম-নিবেদনের ব্রত গ্রহণ করে উপাসনায় জীবন-যাপন করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল একেবারেই বিপরীত। চারিত্রিক স্খলন-পতন ছিল অত্যন্তই বেশী। সন্ন্যাসিনীদের মঠগুলি ছিল ভিড়াক্রান্ত। সেই শান্ত-শুদ্ধ নির্জনবাসের জীবনে বহির্জগতের চিত্তবিক্ষেপ ও প্রলোভন হু হু করে ঢুকে পড়ছিল। আরো দূরে তাকালে দেখা যায়, বড় বড় জাতি ও জনসমষ্টি গির্জা প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের আনুগত্য সরিয়ে ধর্মসংস্কার বা 'রিফর্মেশানে'র উত্তাল তরঙ্গে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাচ্ছে। ফলে বহু মঠ ও ধর্ম নিবাস ভেঙে-ভেঙে যেতে লাগল।

এই নিদারুণ অবস্থার চূড়ান্ত প্রতিষেধক যে কী তা টেরেসার কাছে খুবই স্পষ্ট ছিল। তা হল ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির পুনঃসংস্কার। এই সময়ে তিনি যা বলেছিলেন তাতেই এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানা যায়ঃ "ধর্মপালনের পথ এত কম পরিমাণে গৃহীত হয় যে, সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজেদের কর্তব্য সমাধা না ক'রে নরকবাসী শয়তানের চেয়েও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষকেই বেশী ভয় করেন বলে দেখা যায়।"

তাঁর ধ্যানসাধনার সময় টেরেসা একটি সন্ন্যাসিনী মঠ স্থাপনের ঐশী প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। সেই হবে "কারমেলাইট"দের আদি বিধান অনুযায়ী একান্তভাবেই পবিত্র জীবনের উপযোগী। এতদিনে সুসময় উপস্থিত হ'য়েছে বুঝতে পেরে তিনি তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে নিয়ে এইরকম একটি মঠ স্থাপনের জন্যে আয়োজন করতে শুরু করলেন।

এই পরিকল্পনা আলক্যান্টারার সেণ্ট পিটার এবং অ্যাভিলার বিশপ অনু-মোদন করলেন। তখন ধর্ম-সাধিকা টেরেসা "কারমেলাইট"দের কর্মকর্তার কাছ

থেকে অনুমতিপত্র জোগাড় করলেন। তারপর একজন ধনী স্পেনদেশীয় বিধবার অর্থানুকূল্য লাভ করে তিনি কাজে নেমে পড়লেন। তখনি অন্যান্য সন্ন্যাসিনীগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, স্থানীয় কর্মকর্তাগণ এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। আর এই বিরুদ্ধতা এতোই গুরুতর হ'য়ে উঠল যে তাঁর অনুমতিপত্রটিকে বাতিল করে দেওয়া হল।

যাই হোক, গোপনে একজন ডোমিনিকান ধর্মযাজক টেরেসাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে উৎসাহ দিচ্ছিলেন। ফলে ১৫৬১ খৃীষ্টাব্দে তাঁর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি অ্যাভিলাতে একটি নতুন সন্ন্যাসিনী-মঠ তৈরী করতে শুরু করলেন। কাজটি এমনভাবে চলতে লাগল যে মঠটি যেন মনে হয় তাঁদের পরিবারের জন্যে একটি নতুন বাড়ী মাত্র। এই বাড়ীটি তৈরী করার সময় বাড়ীর ছোট ছেলে গোঞ্জালেস ঐ জায়গায় খেলা করার সময় আঘাত পেয়ে থেঁৎলে যায়। সে ছিল ধর্মসাধিকা টেরেসার বোনের ছেলে। প্রায় প্রাণ-হীন তার দেহটি কোলে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে টেরেসা একান্তভাবে করুণা ভিক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শিশুটি প্রাণ ফিরে পেল। টেরেসা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন।

অনেক বিরুদ্ধতা ও বহু উত্থান পতনের পর নতুন একটি সন্ন্যাসিনী মঠ তৈরীর জন্যে পোপের অনুমতি পত্র পাওয়া গেল। বাড়ীটি শেষ হওয়ার পর সেটা সেণ্ট যোসেফের নামে উৎসর্গ করা হল। টেরেসা এবং চারজন নতুন সন্ন্যাসিনী সংস্কার-বিধিতে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

টেরেসা যদিও অতীন্দ্রিয়বাদী এবং স্বপ্ন-দ্রষ্টা ছিলেন, তবু তাঁর বাস্তবজ্ঞান ছিল অসাধারণ। ভবিষ্যৎ মঠের জন্যে তিনি যে শিক্ষার্থিনী সন্ন্যাসিনী গ্রহণ করেছিলেন তাতেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়। উচ্চমার্গের ধর্মপ্রাণতার চেয়ে বুদ্ধিকেই তিনি বেশী কাম্য বলে মনে করতেন। কেননা তিনি মনে করতেন, সাধনার দ্বারা ধর্মভাব অর্জন করা যায়, কিন্তু চেষ্টা ক'রে বুদ্ধি অর্জন করা যায় না। "বুদ্ধিশালী মন সরল ও অনুগত হয়। এই মন নিজের ত্রুটি বুঝতে পারে এবং নিজেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে দেয়। সঙ্কীর্ণ এবং অপরিণত মন কখনোই নিজের ত্রুটি দেখতে পায় না, এমন কি অন্যে দেখিয়ে দিলেও স্বীকার করে না। এরকম বালিকাকে যদি ঈশ্বর ভক্তি দেন এবং ধ্যানসাধনা শিক্ষা দেন, তবু তা তার কোনো কাজে লাগে না এবং সমাজে এই মেয়ে কাজে লাগার পরিবর্তে ভারস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াবে।" এই কথা লিখে তিনি শেষ করেছেন এই বলে, "ঈশ্বর আমাদের বোকা সন্ন্যাসিনীদের হাত থেকে রক্ষা করুন!"

আমরা দেখতে পাই তিনি দৈনন্দিন ছোটখাটো কাজেও কী পরিমাণ যত্নশীল ছিলেন। যেমন দেখা যায়, কাপড়-কাচার বিভাগে কম খরচে কাজ চালানোর জন্যে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর যেমন যত্ন ছিল, তাঁর কালে সে রকম যত্ন ছিল প্রায় দুর্লভ বস্তু। তেমনি দেখা যায়, তাঁর স্বীকৃতি-গ্রাহককে তিনি পছন্দসই একটি উনুনের কথা লিখছেন। আর এই রান্নার ব্যাপারে তাঁর নিজেরও বেশ দখল ছিল।

তাঁর বিধিনিষেধ যদিও বেশ কড়া ছিল, তবু তাঁর কৌতুকবোধ তার মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত। প্রায় তিনি তাঁর মঠের সন্ন্যাসিনীদের ছোটোখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতি হাসি ঠাট্টার দ্বারা সংশোধন ক'রে নিতেন। তাছাড়া তাঁর ঐ তরুণী সন্ন্যাসিনীদের ভিতর তিনটি প্রলোভন থাকুক তাও তিনি চাইতেন। এই 'প্রলোভন'গুলি হল হাসি, আহার ও নিদ্রার বিষয়ে। তিনি বলেছেন, "কারণ, যদি তার হাসির প্রলোভন থাকে, তবে সে হবে প্রফুল্ল প্রকৃতির মেয়ে। তার যদি আহারের প্রলোভন থাকে, তবে বুঝতে হবে তার স্বাস্থ্য ভালো আছে। আর যদি তার ঘুমের প্রলোভন থাকে তাহলে বোঝা যাবে, তার মনের উপর কোনো বড় রকমের পাপের বোঝা চেপে নেই।" এই কারণে উপবাসাদি আত্মনিগ্রহের দ্বারা নিজেকে অক্ষম করে ফেলেছেন এমন একজন সন্ন্যাসিনীকে তিনি তিরস্কারও করেছিলেন।

তিনি তাঁর সন্ন্যাসিনীদের প্রতিনিয়ত বলতেন, "ঈশ্বর এমন কি ঘটিবাটির মধ্যেও বিচরণ করেন। কর্তব্যের তাগিদে যখন তোমরা বাইরের জগতের কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করবে (যেমন রান্নাঘরের থালাবাটির মধ্যে), তখন মনে রেখো ঈশ্বরও তোমার সঙ্গে গেছেন, এবং তিনি তোমার অন্তরের বা বাহিরের কাজে সাহায্য করছেন।"

সেন্ট যোসেফ মঠ স্থাপনার চতুর্থ বৎসরে টেরেসা তাঁর ধর্মসম্প্রদায়ের ফাদার জেনারেল কর্তৃক আহুত হ'য়ে ঐ ধরনের আদি বিধান অনুযায়ী আরো কয়েকটি মঠ স্থাপনের জন্যে অনুরুদ্ধ হলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথে যাতায়াত করে নানা দূর দেশে যেতে লাগলেন। তাঁর সে সময়ে যা বয়স হ'য়েছিল সে বয়সের নারীর পক্ষে এমন পর্যটন সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। তাছাড়া তখন যানবাহন বলতে ছিল কেবল নড়বড়ে চারচাকার গাড়ী। গ্রীষ্মের সময় থাকত প্রচণ্ড রোদ আর বন্যা, এবং শীতের সময় হাড়জমানো ঠাণ্ডা। রাস্তার অবস্থাও সেই রকম। পাহাড়ী পথের উবড়ো-খাবড়া পাথরের হোঁচট পদে পদে। সরাইখানাগুলিতে কীটপতঙ্গের ছড়াছড়ি, আর এতো নোংরা যে তাঁর মতো খুঁৎখুঁতে স্বভাবের মানুষের পক্ষে থাকাই মুস্কিল। এদিকে তাঁর সঙ্গীসাথী

সন্ন্যাসিনী আর ধর্মযাজকেরাও এইসব অজ্ঞাত-যাত্রায় সব সময়েই আতঙ্কে আধমরা হ'য়ে থাকতেন।

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেই নানারকম অসুবিধা ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। যেমন, টলেডোতে এসে টেরেসা দেখলেন তহবিলে আছে মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু তা দেখেও তিনি বললেন, "টেরেসা আর এই ক'টি টাকা একত্র করলে কিছুই হবে না ঠিকই। কিন্তু ঈশ্বর, টেরেসা এবং টাকা ক'টি একত্র করলে সবই হ'য়ে যাবে।"

বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানের অবস্থাই এত খারাপ ছিল যে ভিক্ষা করে তাদের দিন কাটাতে হত। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠানের খরচ বৃত্তির উপর নির্ভর করে চলত সেগুলির অবস্থাও মাঝে মাঝে টেরেসার দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে উঠত। কেননা প্রায়ই দেখা যেত টাকা পাওয়ার ব্যাপারে বেশ ঘোরপ্যাঁচ রয়েছে। আবার এককালীন দানের ব্যাপার হলে দেখা যেত উত্তরাধিকারের আইন সেখানে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

মেডিনায় এসে টেরেসা ফাদার অ্যান্টনী অব যেসাসের সঙ্গে কথা বললেন। অ্যাভিনায় থাকতে এ'কে তিনি কারমানদের প্রধান হিসাবে চিনতেন। টেরেসা এ'কে জানালেন যে 'সংস্কার বিধান' মেনে চলার মতো সন্ন্যাসী ব্যক্তি সেখানে পেতে খুবই অসুবিধা ঘটছে। টেরেসা দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন যে ফাদার অ্যান্টনী অব যেসাস নিজেই ঐ কর্মে যোগ দিতে চাইলেন। আর তারপরেই যোগ দিলেন জন অব দি ক্রশ। এই পরবর্তী ব্যক্তি আকারে ক্ষুদ্র ছিলেন আর দেখতেও ছিলেন খুবই গোবেচারী ধরনের। সেইজন্যে লোকেরা টেরেসাকে মজা করে বলত, "তাঁর আছে দেড়খানা সন্ন্যাসী!" পরবর্তীকালে জন অব ক্রশ ইনকার্নেশানের মঠে সন্ন্যাসিনীদের স্বীকৃতিগ্রাহক হিসাবে নিযুক্ত হন। এইখানে তখন টেরেসাও প্রধান কর্মকর্ত্রী হিসাবে প্রেরিতা হ'য়েছিলেন।

ইনকার্নেশান মঠ ছিল টেরেসার পুরনো আবাসস্থল। এখানে তখন খুবই বিশৃঙ্খলা চলছিল। কিন্তু সে যাই হোক, পুরনো জায়গায় অধ্যক্ষা হিসাবে প্রেরিত হওয়াটা বেশ অপ্রীতিকর কাজ ছিল টেরেসার পক্ষে। এই বহু নারী-অধ্যুষিত মঠে কাজ করতে তাঁকে অত্যন্তই কৌশল এবং বিবেচনার সঙ্গে চলতে হত। তিনি পুরনো মঠ ছেড়ে দিয়ে কঠোরতর বিধি-বিধানের ভিত্তিতে নতুন মঠ স্থাপন করেছিলেন, তাতে পুরনো মঠের প্রতি যথেষ্টই সমালোচনার ভাব প্রকাশিত হ'য়েছিল। টেরেসার পুরনো মঠের সন্ন্যাসিনীরা তাঁর এই প্রচ্ছন্ন সমালোচনাকে তখনো ক্ষমা করে উঠতে পারেন নি। আর সেইজন্যে তাঁরা টেরেসাকে মানতেও চাইতেন না। কিন্তু টেরেসা তাঁদের জানালেন, তিনি তাঁদের

কিছু জ্ঞান দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেন নি, নিজে যাতে তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেন এই হল তাঁর উদ্দেশ্য। অধ্যক্ষা হ'য়ে প্রথম কাজে যোগ দেওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি বললেন, "প্রিয় মাতা এবং ভগ্নিগণ, প্রভু এখানে আমাকে কর্তব্য পালন করতে পাঠিয়েছেন। এমন একটা কাজ করতে আমাকে পাঠানো হ'য়েছে যা ছিল আমার চিন্তার বাইরে, আর একাজে আমি সম্পূর্ণই অযোগ্য।......কিন্তু আমি এসেছি শুধুই আপনাদের সেবা করতে।......আমি এই মঠেরই কন্যা এবং আপনাদের ভগ্নী। আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি কী করতে পারি তা আমাকে জানান। আপনারা যা চান আমি তাই করব। আপনাদের জন্যে আমাকে যদি রক্ত দিতে হয় তাতেও আমি ইতস্তত করব না। কাজেই এতদিক থেকে যে নারী আপনাদের সঙ্গে সংযুক্ত তার ব্যবস্থাপনায় থাকতে আপনারা এতটুকু কুণ্ঠিত-বোধ করবেন না।"

তাঁর স্বীকৃতি-গ্রাহকের নির্দেশে টেরেসা তাঁর জীবন ও শিক্ষার বিষয়ে একখানি সংক্ষিপ্ত রচনা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর দৈব-দর্শনের বিষয়ে লিখতে গিয়ে টেরেসা তিন রকমের দৈব-দর্শনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এগুলি ঘটে সাধনার বিভিন্ন স্তর অনুসারে।—

প্রথমত, চাক্ষুষ 'দর্শন'—বহিরিন্দ্রিয়ের মারফৎ এগুলি চিত্তশুদ্ধির পর্যায়ে ঘটে থাকে। সাধনার প্রথম স্তরেই ঘটে এগুলি। দ্বিতীয়ত, মানসিক 'দর্শন'—এগুলি ঘটে আত্মবোধ লাভের পর্যায়ে। সাধনার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে পাওয়া যায় এগুলি। সর্বশেষে আসে প্রজ্ঞামূলক 'দর্শন'। এগুলি হয় নিরাকার। সাধনার চতুর্থ, অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের পর্যায়ে লাভ করা যায় এই উপলব্ধিগুলি।

চাক্ষুষ দর্শন টেরেসার ঘটেনি বললেই চলে। কিন্তু অধ্যাত্ম সংযম ও ধ্যান যোগের পথে চলতে চলতে তিনি কতকগুলি অন্তর্দর্শন লাভ করতে থাকেন। এগুলি লাভ করা গিয়েছিল অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। প্রথম হয়ত একটা অঙ্গ, যেমন দুখানি হাত, দেখা যেত; তারপর মুখ, এবং সর্বশেষে সমগ্র দেহটি। এই মূর্তিগুলি ভাস্বর শুভ্র আলোকে উদ্‌ভাসিত থাকত। টেরেসা একে তুলনা দিয়ে বলেছেন যেন অগভীর জলের নিচে একখন্ড স্ফটিক রৌদ্রালোকে ঝক্‌ঝক্ করছে। কিন্তু তখনও সূর্যালোক যেন অতোটা খেলেনি। আর হ্রদের জলও যেন ঘনায়মান ঝড়ের সংকেতে বিবর্ণ ও থমথমে হ'য়ে ওঠে। কাজেই বোঝা যায়, এই সব মুহূর্তে টেরেসার মনে হত তাঁর অন্তরের আলোই স্বাভাবিক এবং সূর্যের আলো যেন নকল ব্যাপার।

কোনো কোনো সময়ে খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ মূর্তিই যেন অবর্ণনীয় গরিমায়

তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে উঠত। এই সব 'দর্শন' ধর্মসাধিকা টেরেসার মনে এমন এক প্রবলভাবে নাড়া দিত যে তিনি ভাবাবেশের অবস্থায় চলে গেলেই মূর্তিটি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হ'য়ে যেত চোখের সম্মুখ থেকে।

প্রজ্ঞা 'দর্শনে'র বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির ব্যাপারকে ভাষা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "এটা যেন কোনো লোক, যে কখনো কিছু শেখেনি, পড়তে জানে না, বিচার করতে জানে না, হঠাৎ সে বিজ্ঞানের যতো কিছু সূত্র সবই নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে গেল।" তিনি নিঃসন্দেহেই বুঝতে পারতেন যে দয়িত ঈশ্বর তাঁর কাছেই উপস্থিত আছেন। এটা হল দিব্যমিলনের অবস্থা। এ-সময়ে আত্মা ইন্দ্রিয় বোধের সাহায্য ছাড়াই দিব্য-প্রকাশের বিষয়ে অবগত হয়। আর এই সময়ে আত্মা নিজের মধ্যে বলে ওঠে, 'বেঁচে আছে যে, সে তো আমি নই সে যে আমারই ভিতরের খ্রীষ্ট!'

তাঁর সাধনার সময়ে তিনি প্রায়ই যে কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন টেরেসা তার কথাও বলেছেন। তাঁর বর্ণনা অনুসারে, প্রথম 'কথা' যা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন তা হ'ল, "আমি চাই তুমি মানুষের সঙ্গে আর কথা না বলে দেবদূতের সঙ্গে কথা বল।" তিনি বলেছেন, এই সময়ের পর থেকে তিনি ভগবদ্‌ প্রেমিক লোক ছাড়া আর কারো সাহচর্য চাইতেন না। সেকালের 'শয়তান' বিষয়ক দুশ্চিন্তার কথা মনে রাখলে বোঝা যাবে টেরেসা এই কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি বিষয়ে কী দারুণ আত্মিক উৎকণ্ঠায় ভুগেছিলেন। কিন্তু এর পরেই তিনি শুনলেন পরম করুণিক ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর, "কন্যা, তুমি ভীত হ'য়ো না, এ আমি। আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাব না।" এই শুনে চিরতরে তাঁর ভয় চলে গেল।

আরেক বার টেরেসা এই কথা শুনেছিলেন, "কষ্ট পেও না, আমি তোমাকে একখানি জীবন্ত গ্রন্থ দেব।" এই সময়ে 'ইনকুইজিশানে'র পীড়নে স্পেন দেশে বহু গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব করা হচ্ছিল। এর মধ্যে টেরেসার প্রিয় কয়েকখানি গ্রন্থও ছিল। প্রথমে তাই তিনি ঐ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। তারপর তাঁর মনে পড়ল, "ঈশ্বর নিজেই সেই জীবন্ত গ্রন্থ, যাঁর মধ্যে আমি সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছি।"

বিভিন্ন স্তরের দিব্যোল্লাস বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির কথাও টেরেসা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। দেহ চেতনা খুবই ক্ষীণ হ'য়ে আসে। উচ্চতর উপলব্ধির পর্যায়ে মনে হয় যেন প্রাণ আর দেহকে সঞ্জীবিত রাখছে না; নাড়ীর স্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হ'য়ে আসে, বাহু প্রসারিত হ'য়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হ'য়ে যায়। প্রথমবার এই অবস্থা ঘটলে তিনি খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। যে অবস্থা তাঁর কখনো হয়নি তেমন অবস্থা

উপলব্ধি করতে সত্যিই যথেষ্ট সাহসের দরকার ছিল। তবু, টেরেসা বলেছেন, এর ফলে এমন একটা চরম আত্মোৎসর্গের আনন্দ লাভ করেছিলেন তিনি, এমন অনাস্বাদিত যন্ত্রণা যে কেবল সুতীব্র ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার দ্বারাই তিনি তা সহ্য করতে পেরেছিলেন। প্রেমময় ঈশ্বর তাঁকে এও বুঝিয়েছিলেন যে, প্রবল দিব্যোল্লাস অনুভব করার আগে যে মর্মান্তিক যন্ত্রণাবোধ আসে তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কেননা এইভাবেই আত্মার সোনা পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়।

অধ্যাত্ম বিকাশের বৎসরগুলিতে ধর্মসাধিকা টেরেসার অনেক রকম বিভূতি দেখা দিতে থাকে। অনেক সময় তিনি পরবর্তীকালে কবে কী ঘটবে তা বহু আগেই বলে দিতে পারতেন। তাছাড়া তিনি তাঁর নতুন সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে কে আন্তরিকভাবে বৈরাগ্য সাধনা করেছে আর কেই বা শুধু মুখে ত্যাগের কথা আওড়াচ্ছে তাও বলে দিতে পারতেন।

তাঁর উপদেশের সারমর্ম মাত্র দুটি কথায় ব্যক্ত করা যায়।—প্রেম ও বিনয়। এই পূর্বতন সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্পেনীয় মহিলার চিত্তে বিনয়-ভাব খুব সহজে আসে নি। এদিকে প্রেমও এসেছিল শুধু অন্তরে ঈশ্বরের উপলব্ধি বিষয়ে ক্রমোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই। আর এরই ফলে তিনি তাঁর পরম দয়িতের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছিলেন।

ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্বেও স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করে গেছেন। তখনও তিনি টলেডো, সেভিল, ভ্যালেন্সিয়া প্রভৃতি স্থানে কষ্টসাধ্য উপায়ে যাতায়াত করেছেন। এই সব স্থানে তিনি ইতিপূর্বে তাঁর সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপন করেছিলেন, সেইগুলি পরিদর্শন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আটষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর সময়ে এই মহীয়সী ধর্মসাধিকা বলেছিলেন, "হে প্রভু, হে আমার প্রিয়তম, এতদিনে আমার বাঞ্ছিত সময় এল। আমার মুক্তির আর দেরি নেই।......তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

লা মেরে এঞ্জেলিক

এঞ্জেলিক আর্নল্ড্ (১৫৯১—১৬৬১) এবং পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাসিনী-মঠের কাহিনী শুরু হ'য়েছিল পরম আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়ে, কিন্তু শেষ হল পোর্ট-রয়াল এবং যা কিছু এঞ্জেলিক সৃষ্টি করেছিলেন সব কিছুর পতনের মধ্য দিয়ে। ইউরোপীয় অধ্যাত্ম-ইতিহাসের এ এক করুণ অধ্যায়, যখন খ্রীষ্টের প্রচারিত প্রেম ও ক্ষমার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল, এবং যখন খ্রীষ্টের বাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিষয়ে তথাকথিত খ্রীষ্ট-ভক্তদের মনে সচেতন বা অচেতন ভাবে কতকগুলি বিকৃত ধারণা দানা বেঁধে উঠেছিল।

আর্নল্ড্ বংশের সকলেরই এই একটা স্বভাব ছিল যে তাঁরা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে যা বিশ্বাস করতেন সে বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ প্রায় সীমা ছাড়িয়ে যেত। আর নিজেদের ব্যক্তিত্ব দিয়ে কী করে অনুরূপ ভক্তি যে অন্যের হৃদয়ে জাগ্রত ক'রে একই জীবন-উৎসর্গ-করা লক্ষ্যের দিকে নিযুক্ত করা যায় তাও তাঁরা জানতেন।

সেইজন্যে, মেরে এঞ্জেলিকের তীব্র সংস্কার-কামনার বিরুদ্ধ-শক্তিগুলি যদিও জয়লাভ করে বাইরের দিক দিয়ে তাঁর আদর্শ, মঠ এবং বন্ধু-বান্ধবদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে পেরেছিল, তবু ভিতরের দিক দিয়ে এই পরাজয় তাঁর শত্রুরা যতো সুনিশ্চিত বলে মনে করেছিল ততোটা ভয়াবহ হ'য়ে ওঠেনি। কেননা, আজও পোর্ট-রয়াল নামটি উচ্চাদর্শের আলোক বিকীর্ণ করে থাকে, এবং ব্লেইজ পাসক্যাল বা জাঁ-রাসিনের মতো কয়েকজন সমর্থনকারীর নাম তাঁদের মৃত্যুর এতদিন পরেও তাঁদের অনুষ্ঠিত কর্মের মধ্য দিয়ে সেই আদর্শ-বিস্তারের সাহায্য করে যাচ্ছে।

পোর্ট-রয়াল এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসিনী ও নির্জনবাসিনী তাপসীগণ সেই অসংখ্য দৃষ্টান্তেরই অন্যতম, যাতে দেখা গেছে যে সহনশীলতার একান্ত অভাবে ধর্মকে তার বিশ্বস্ত অনুবর্তীদের সেবা থেকে বঞ্চিত হ'তে হ'য়েছে। পোর্ট-রয়ালের জন্যে সংগ্রামে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এঞ্জেলিক আর্নল্ড্। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা, সাহসী ও উৎসাহময়ী নারী, যিনি কখনো নতিস্বীকার করতেন না। এবং তাঁর আন্তরিকতাও ছিল সুগভীর।

এঞ্জেলিকের পিতামহ আর্নল্ড্ ডি লা মোথ ছিলেন একজন হুগেনট। কিন্তু সেণ্ট বার্থোলোমিউ-এর ধ্বংস-সাধনের পর তিনি তাঁর কয়েকজন পুত্র-কন্যার

সঙ্গে ক্যালভিন মতবাদ পরিত্যাগ করেছিলেন। এঞ্জেলিকের পিতাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। অবশ্য লা রচেলে-তে কয়েকজন পিসী রয়ে গেলেন যাঁরা তখনো হ্যুগনেট মতবাদ ত্যাগ করেন নি।

তাই পোর্ট-রয়ালের প্রধান অপরাধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল আর্নল্ড্ পরিবারের সমর্থন; এবং সেই সঙ্গে এঞ্জেলিকের পিতা ম'সিয়ে অ্যান্টইন আর্নল্ডের রচিত "ফ্রাঙ্ক এং ভেরিতেবল ডিস্কোর্স অ রোই আঁরি দ্য ফোর্থ" নামক গ্রন্থখানির প্রকাশ। এই প্রবন্ধে লেখক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, চল্লিশ বছর ধ'রে ইউ-রোপের প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের জন্যে যেহেতু যেস্যুইটগণই দায়ী, সেজন্যে তাঁদের ফ্রান্সে ফিরতে দেওয়া উচিত হবে না। এইভাবে আর্নল্ড্দের জন্যেই পরবর্তীকালে পোর্ট-রয়ালের উপর অত্যাচার শুরু হয়। আর এই অত্যাচার ভোগে অংশীদার হয়েছিলেন শিষ্যাগণ-সহ মেরে এঞ্জেলিক এবং জানসেন এবং তাঁর বন্ধু জিন ডু ভার্জিয়ার ডি হরেনে। ইনি ছিলেন সেণ্ট-সাইরাণ-এর মঠাধ্যক্ষ।

জানসেন সাধারণত পরিচিত ছিলেন জানসে-নিয়াস নামে। তিনি ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ক'রে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আইপ্রেসের বিশপ থাকা-কালীন মৃত্যুবরণ করেন। যতোদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততোদিন তাঁর প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাসের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। বরং তিনি স্পেন দেশের অধিবাসী ছিলেন ব'লে তাঁকে লভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা যেস্যুইটদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মাদ্রিদে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যদি মৃত্যুর আগে একটি বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি না রেখে যেতেন তবে তাঁকে কখনোই ধর্ম-অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করা হত না। এই পাণ্ডুলিপিখানি তাঁর মৃত্যুর পরে কর্মকর্তাগণ "অগাষ্টি নাস" নামে প্রকাশিত করেন।

এঞ্জেলিকের শত্রুরা জানসেনের ঐশ্বরিক করুণা বিষয়ক মতবাদকে এঞ্জেলিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, ঐ মতবাদ জানসেনের গ্রন্থেও যেমন রয়েছে তেমনি তাঁর বন্ধু সেণ্ট-সাইরাণের জীবন ও উক্তিগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। আর এই একটি মতবাদের ছায়া দেখা যায় এঞ্জেলিকের পরিবারভুক্ত অনেকের মধ্যেই। এ'রা সকলেই তাই প্রচ্ছন্ন ক্যালভিন-বাদী, এবং গির্জা-প্রতিষ্ঠান, পোপ এবং ফ্রান্সের রাজার পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি।

অবশ্য পোর্ট-রয়াল এবং মেরে এঞ্জেলিকের ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে জান-সেনবাদকে একাকার করে ফেলা আমাদের উচিত হবে না। এঞ্জেলিকের শত্রুদের বাসনা ছিল সেইরকমই। কিন্তু সেণ্ট-সাইরাণ তাঁর কাছে সংস্কার-প্রচেষ্টার

সময়ে একেবারেই অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। আর তিনি ঐ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন মঠ স্থাপনার অন্তত কুড়ি বৎসর পরে। নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে, যখন মনে হত পোর্ট-রয়ালকে বোধহয় তার আত্মশুদ্ধি ও উপাসনার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে দেওয়া হবে। কিন্তু সে কেবল দিবাস্বপ্ন।

এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অংক ঘনিয়ে আসার বহু আগেই এঞ্জেলিকের মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু তিনি যদি বেঁচেও থাকতেন তবে অন্যান্য আনন্দ ও বেদনাকে যেমন তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলে মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর সৃষ্ট সবকিছুর এই চরম পতনকেও তিনি শান্তভাবেই গ্রহণ করতে পারতেন। তিনি আপাত ব্যর্থতা এবং মানবিক নৈরাশ্যের অন্ধকারতম মুহূর্তগুলিতেও ঈশ্বরের পরম প্রজ্ঞার বিষয়ে কখনো সন্দেহ পোষণ করেন নি। তাঁর কাছে সমস্ত রকম পরীক্ষাই ছিল ঈশ্বরের করুণার অভিব্যক্তি। কাজেই তিনি মনে করতেন, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে একান্ত আত্মসমর্পণই হওয়া উচিত প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির চরম আদর্শ। এটা যাঁর নেই তেমন নারী বা পুরুষকে তিনি ধার্মিক বলে স্বীকার করতেন না, এবং তেমন লোক যে প্রকৃত সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হতে পারেন তাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। এই গুণ না থাকলে কেউই গভীরতর অর্থে তাঁর ব্রত পালন করতে পারেন না।

ঈশ্বরের করুণাই হল সার কথা। এবং এই গুণ কেবল ব্যক্তিগত প্রয়াসের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব নয়। নিজের কর্মের দ্বারা যেসব ব্যক্তিগত কৃতিত্ব অর্জন করা যায়, ঐশী করুণা তার মধ্যে পড়ে না। ঈশ্বর যে সব 'পরম আদেশ' ব্যক্ত করেছেন, সেগুলি কঠোরভাবে পালন করলেও এ জিনিস পুরস্কার হিসাবে পাওয়া যায় না। কাজেই এঞ্জেলিক প্রিয় বলে যা কিছু মনে করতেন তার চরম বিনাশও তিনি ধীর চিত্তেই গ্রহণ করতেন। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বরের পরম বিধানের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহভাব জাগ্রত হয় না। তেমনি জনমত অথবা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তির জন্যে সেই বিধানকে হাল্কা-ভাবে এড়িয়েও যাওয়া যায় না। বিদ্রোহ মানেই ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যের অভাব। মোলিনা একদা স্বাধীন ইচ্ছার মতবাদ আমদানী করেছিলেন। তাতে ঈশ্বরের করুণাকে মানুষের কৃতকর্মের নিচে স্থান দেওয়া হ'য়েছিল। কিন্তু পোর্ট-রয়াল এক্ষেত্রে অগাস্টিন প্রবর্তিত প্রাচীনতার সত্য, যা মোলিনার বিরুদ্ধ মত এবং যাকে খাঁটি বলে স্বীকার করেছিল, তাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করেছিল।

এঞ্জেলিক কিন্তু নিছক ধর্মসংস্কারক ছাড়া আরো বেশী কিছু ছিলেন। তিনি তাঁর নিরুৎসাহজনক মতবাদ সত্ত্বেও মঠবাসিনী সরলমনা সন্ন্যাসিনী ছাড়াও আরো অনেক ব্যাপকতর গণ্ডীর স্ত্রীপুরুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। এটা ঘটেছিল তাঁর নিজের জীবনের দৃষ্টান্তেই। তিনি কেবল অন্যকেই চরম আত্ম-ত্যাগ ও আত্মবিশ্লেষণের কথা বলতেন না, নিজেও কঠোরভাবে আত্মসংযম পালন করতেন।

কিন্তু তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পোর্ট-রয়ালের ধর্ম-সংস্কার এবং এঞ্জেলিকের নিজের ধর্মজীবনের সূচনাও ঘটেছিল একটি মিথ্যার ভিত্তিতেই। কারণ তাঁর আটবৎসর বয়সের সময় দীক্ষা দিতে গিয়ে পোপের অনুমতি চাওয়ার সময় এঞ্জেলিকের বয়স আরো আট বৎসর বাড়িয়ে ষোল বৎসর করা হ'য়েছিল। ম'সিয়ে আণ্টইন আর্ণল্ড্ যখন বালিকা কন্যাটিকে নিয়ে মবুইসন আবে-তে শিক্ষার্থিণী হিসাবে ভর্তি করাতে গিয়েছিলেন তখন তিনি ভাবতেও পারেননি যে পোর্ট-রয়ালের দরজা তাঁর কাছে চিরতরে বন্ধ হ'য়ে যাবে, এবং সেণ্ট বার্ণার্ড-এর অনুশাসন এঞ্জেলিকের পরিবার-পরিজন সকলের উপরই দৃঢ়ভাবে প্রযুক্ত হবে।

এর ছ'বছর পরে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে এঞ্জেলিক যখন পোর্ট-রয়ালের অধ্যক্ষা হন, তখন তিনি একজন দুশ্চরিত্র ক্যাপুচিন সন্ন্যাসীর ধর্মোপদেশ শুনেছিলেন। তখনই হঠাৎ তিনি স্থির করলেন যে তিনি তাঁর মঠে সংস্কারকর্ম শুরু করবেন। তারপর তিনি সংকল্প অনুসারে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। এতে তাঁর আত্মীয়েরা যেমন আতঙ্কিত হ'য়ে হৈচৈ শুরু করে দিয়েছিলেন, তাঁর পূর্বতম সহযোগীরাও তেমনি প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে বিরোধিতা করেছিলেন। তারপর সেই বিখ্যাত জার্ণিত্র ডু গুইচেট্ ঘটনাটি ঘটল। এটা ছিল এঞ্জেলিকের নাটকীয় জীবনের সব থেকে নাটকীয় ঘটনা। এরপর থেকে পোর্ট-রয়াল প্রায় কার্মেলাইট এবং সেণ্ট ফ্রান্সয়েজ ডি সেল-এর অর্ডার অব দি ভিজিটেশানের মতোই সুবিখ্যাত হয়ে উঠল।

ঐ জার্ণিত্র ডু গুইচেট ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে। সেইদিন আর্ণল্ড্ পরিবারের লোকেরা পোর্ট-রয়াল দর্শন করতে এসেছিলেন। তাঁরা ঐ স্থানের সর্বময় কর্তা বলে মনে করতেন নিজেদের। একজন অসন্তুষ্ট ধর্মযাজককে ধর্মাবাসের বিধিবিধানের প্রতি সম্মান দেখাতে আদেশ করা থেকেই ধর্মজীবনের বিষয়ে এঞ্জেলিকের কঠোর মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সন্ন্যাসজীবনের ব্রতকে সচেতনভাবে মেনে চলা হোক এই তিনি চাইতেন।

তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাসিনী হ'তে হ'য়েছিল। এটা বোঝা যায়, বহু বৎসর আগে তাঁর পিতামহের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে। তখন তিনি তাঁর পিতামহ মঁসিয়ে ম্যারিয়নকে বলেছিলেন, দ্বিতীয়া কন্যা হ'য়ে জন্মেছেন এটা তাঁর দুর্ভাগ্য, কেননা প্রথমা কন্যা হ'য়ে জন্মালে তাঁর বিবাহ হতে পারত। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন তিনি, এবং সেই পিতামাতারই দ্বারা যাঁরা এখন তাঁর সংকল্পের বিরুদ্ধতা করতে সচেষ্ট হলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সন্ন্যাস-জীবনকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসিনীরাও ঐ ধর্মজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি কৃত্যকে নিঃশর্ত আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়ে পালন করুক এও তিনি চাইতেন। তাঁর কাছে ধর্মের সমস্ত ব্রতের একান্ত উদ্‌যাপন ছাড়া ধর্মজীবন নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য এবং কপটাচারী হ'তে বাধ্য। আর তিনি মনে করতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে কপটাচার হল সব থেকে ঘৃণ্য পাপগুলির অন্যতম।

এই অল্পবয়স্কা এবং অনভিজ্ঞা মঠাধ্যক্ষার কাছে সহজ এবং স্বচ্ছন্দে জীবনের আকর্ষণ বেশী হবে এইটেই ছিল স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও তিনি যে পোর্ট-রয়ালকে আদি বিধিবিধানের শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন সেটা খুবই আশ্চর্য ব্যাপার। এটা ঈশ্বরেরই হাত বলে মনে হয়। কেননা তাঁর চারিদিকে সেকালে ছিল কেবল ক্ষয়িষ্ণুতা এবং নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা। এই সংস্কারকর্মে এঞ্জেলিক তাঁর তরুণী হৃদয়ের সমস্ত উৎসাহ ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি কোনো মধ্যপন্থা জানতেন না, এবং চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পোঁছানো পর্যন্ত তিনি ক্ষান্তিও মানতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই আতিশয্যের ফলেই বহু ধার্মিক ব্যক্তি তাঁর কর্মের দিকে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। এবং তাঁদের মনে আত্মোৎসর্গ, কঠোর সন্ন্যাস ও চরম বৈরাগ্যের ভাব মজ্জাগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

এঞ্জেলিকের মৃত্যুর বহুকাল পরে ভল্‌টেয়ারের মতো একজন অবিশ্বাসী ব্যক্তিও পোর্ট-রয়ালে এঞ্জেলিক যে সংস্কার ব্রত পালন করেছিলেন তার আন্তরিকতা ও ধর্মবিশ্বাসে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পোর্ট-রয়ালের মুষ্টিমেয় সন্ন্যাসিনী ও বিদুষী তাপসী যেভাবে তাঁদের গভীরতম বিশ্বাসকে বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা নিজেরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাওয়াকে কামনীয় মনে করেছিলেন, তাঁদের সেই বিশ্বাস, যাকে তাঁরা পরম সত্য বলে মনে করতেন এবং যাকে বর্জন করাকে মনে করতেন তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা ব'লে,—সেটা সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার।

এঞ্জেলিকের প্রথম প্রয়াস ছিল সিস্টার্সিয়ান সম্প্রদায়ের মতে সন্ন্যাস-আশ্রমের যে সতীত্ব, দারিদ্র্য, বিনয়, আনুগত্য এবং নির্জনবাস আচরণীয় ছিল সেই নীতি-

গুলিকেই কঠোরভাবে পুনঃ প্রবর্তন করা। তাঁর মতে যাঁরা মুখে একটা পুঁথিগত আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে নিজেদের আরাম-আহ্লাদ না খুঁজে আন্তরিক-ভাবে ধর্মজীবন যাপন করতে চান, তাঁদের সমস্ত রকম ব্যক্তিগত বন্ধন ও সম্পর্ক এবং সর্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেদের বিমুক্ত ক'রে নেওয়া সঙ্গত। তখন তাঁদের সব কিছুই ত্যাগ করতে হবে এবং নিঃশর্তভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের নিবেদন ক'রে দিতে হবে। তাঁদের নীরব ও উপাসনারত থাকতে হবে। কেননা যাঁরা খাঁটি সন্ন্যাসী এবং খাঁটি সন্ন্যাসিনী তাঁরা হবেন পরম পবিত্রতার জীবন্ত মন্দির। এমন কি ধর্মজীবনে যেসব আবেগগত পরিতৃপ্তি—যেমন তার মাধুর্য, ভাবাবেশ এবং দৈব-দর্শন, যেগুলির দিকে নারীরা সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং যেগুলি তাঁদের কাছে ইন্দ্রিয়জ ভোগের সামিল হ'য়ে দাঁড়ায়—সেগুলিরও কোনো স্থান ছিল না তাঁর পরিকল্পনায়। সন্ন্যাসাশ্রমের যেসব বেশভূষা স্বচ্ছন্দে ধারণ করে ভণ্ড ধার্মিকেরা তাঁদের সংসারাসক্তিকে চাপা দিতে চায় তার প্রতিও তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। যা কিছু বাইরের ব্যাপার, যা নাকি ধর্মজীবনের খোলস তার প্রতি কোনো আসক্তি ছিল না। তিনি চাইতেন, ধর্মজীবনের প্রধান অনু-শাসন ও বিধিবিধানকে সর্বান্তঃকরণে এবং সানন্দচিত্তে পালন করা হোক।

এঞ্জেলিকের জীবনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, মবুইসনে সেণ্ট ফ্রাঁন্সয়েজ ডি সেল্‌স-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এঞ্জেলিককে সেখানে পাঠানো হ'য়েছিল সেখানকার মঠাধ্যক্ষা 'এঞ্জেলিক ডি এস্‌ট্রিয়েস'-কে অপসারিত ক'রে মঠটির ব্যবস্থাপনায় সংস্কার-সাধন করার জন্য। ঐ মঠাধ্যক্ষার নিন্দনীয় আচরণ প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজা চতুর্থ হেনরী তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে রক্ষা করতেন ব'লে তাঁকে কিছু বলা যায়নি। এখন চতুর্থ হেনরীর মৃত্যুর পর এদিকে মনোযোগ দেওয়া হ'য়েছিল। মেরে এঞ্জেলিক এই মঠে পাঁচ বৎসর কাল রইলেন। এইখানেই তিনি একদা শিক্ষার্থিনী হিসাবে যোগ দিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই এখানে আবার অধ্যক্ষা হ'য়ে ফিরে এসে তাঁকে অনেক নাটকীয় উত্থান-পতন ও বিপদের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। এই সময়টা তাঁকে অত্যন্ত সাহস এবং অধিনায়িকাসুলভ বীরত্বের সঙ্গে চলতে হত।

মবুইসনেই আমরা দেখলাম যে এঞ্জেলিকের চরিত্রবল কী রকম দৃঢ়; বিপদ ও নৈরাশ্যকে তুচ্ছ ক'রে কর্তব্যকর্মে তিনি কী নিঃশঙ্ক চিত্তে আত্মনিয়োগ করতে পারেন; আয়াসী স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি তাঁর ঘৃণা কতো তীব্র; ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং করণীয় কাজে তাঁর আত্মদান কত গভীর। এই গুণগুলিই তাঁকে মহীয়সী করেছে। কিন্তু কখনো কখনো মনে হয়, তিনি যেন একটু অমানবিক, একটু বেশী

কঠোর, এবং নিজের উপর তিনি এতো বেশী চাপ দিচ্ছেন যে তিনি যেন তাঁর প্রকৃত ভারসাম্য এবং শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।

সেণ্ট ফ্রান্সয়েজ ডি সেল্স্ ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখ মবুইসনে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এঞ্জেলিকের একজন নতুন শিক্ষার্থিণীকে দীক্ষা দেওয়া। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে এঞ্জেলিকের নিজেরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তাছাড়া তিনি জিন ডি শানটালের অধীনে ভিজিটেশান-সম্প্রদায়ে যোগ দিতেও উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেজন্যে সেণ্ট ফ্রান্সয়েজ ডি সেল্সের এই আগমনে তিনি খুবই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলেন। কয়েকবার তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটল। তারপর পোর্ট-রয়ালে গিয়ে এঞ্জেলিকের ভগ্নী এগ্‌নেস-এর সঙ্গেও দেখা করলেন সেণ্ট ফ্রান্সয়েজ ডি সেল্স্। কিন্তু তিনি এঞ্জেলিককে জিন ডি শান্টালের অধীনে নগণ্য একজন শিক্ষার্থিণী হ'য়ে ভিজিটেশান সম্প্রদায়ে যোগ দিতে বাধা দিলেন। কেননা তিনি জানতেন যে, এতে এঞ্জেলিককে পোর্ট-রয়ালের কাজ থেকে অবসর নিতে হবে। সে কাজ যদিও সুখকর ছিল না, এবং তাতে অনেক বাধাবিপত্তিও ছিল, তবু সেটা ছিল দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

তাঁদের মধ্যে শেষ দেখা হয় ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। তারপর আর তাঁদের চাক্ষুষ দেখা সাক্ষাৎ ঘটেনি, যদিও সেণ্ট ফ্রান্সয়েজ ডি সেল্স্ প্রায়ই উদ্দীপনাপূর্ণ চিঠি লিখে এঞ্জেলিককে সস্নেহে অনেক উপদেশ দিতেন। পরবর্তী কালে এই চিঠি পত্রের যাঁরা সংগ্রাহক হ'য়েছিলেন তাঁরা খুবই হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। কারণ তাতে তাঁরা যা চান, অর্থাৎ পোর্ট-রয়াল বা আর্ণল্ড্ পরিবার এবং তাঁদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে কোন ধিক্কার বা সমালোচনা কিছুই ছিল না। এই চিঠিগুলিতে সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্স্ এবং মেরে এঞ্জেলিকের মধ্যে এমন একটা সম্পর্কের নিশানা দেয় যা সাংসারিক মানুষের বুদ্ধির অগম্য। এ সম্পর্ক এতো গভীর এবং এতো পবিত্র যে কেবল অধ্যাত্ম-চেতনাসম্পন্ন মানুষই তার প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে এবং তার দ্বারা লাভবান হয়। ঠিক এই রকমই ধর্মসাধিকা সেণ্ট ক্লেয়ারকে সেণ্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি ছাড়া ভাবা যায় না; অ্যাভিলার ধর্মসাধিকা টেরেসাকে সেণ্ট জন অব দি ক্রস ছাড়া কল্পনা করা যায় না এবং সেণ্ট জিন ডি শানটালকে ভাবা যায় না সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্স্ ছাড়া। ঠিক সেই ভাবেই মেরে এঞ্জেলিকের ক্ষেত্রে সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্সের প্রভাব তাঁর চরিত্রবিকাশে সাহায্য করেছিল, এবং তাঁর কঠোরতার আতিশয্য, ও একদেশদর্শিতা স্বাভাবিক পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। তাছাড়া প্রকৃত ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর যে কঠিন, অধৈর্যময় গোঁড়া মতবাদ ছিল এবং নিজের ও অন্যের

ভুলভ্রান্তির বিষয়ে তাঁর যে রকম কড়া ধরনের বিচার ব্যবস্থা ছিল তাও ক্রমে সহনীয় হ'য়ে উঠেছিল।

তিন বৎসর পরে সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্‌সের দেহাবসান ঘটল। তাঁর সুন্দর চিঠিগুলিতে তিনি এঞ্জেলিককে বারবার করে নিজের আবেগপ্রবণ স্বভাবের বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে নিজের উপর এবং অধীনস্থ অন্যদের উপর বেশী চাপ দিতে বারণ করেছেন। ধর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব এঞ্জেলিকের ধারণার থেকে বহু দিক দিয়েই পৃথক ছিল। তাঁদের মেজাজও ছিল তেমনি আলাদা। কেননা সেণ্ট ফ্রানসয়েজ ডি সেল্‌সের ধারণায় ঈশ্বর এমন কোনো সত্তা নন যিনি দুঃসহ রকম ভয়ংকর এবং একান্ত অত্যাচারী; এবং তাঁকে যে কেবল ভয় পেয়ে কম্পিত হৃদয়ে ভজনা করতে হবে এও তিনি বিশ্বাস করতেন না।

তিনি কামনা করতেন যে, জিন ডি শানটাল ও তাঁর ভিজিটেশান-সম্প্রদায় এবং পোর্ট-রয়লে ও মেরে এঞ্জেলিকের সঙ্গে এক যোগে কাজ করুক। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর জিন ডি শানটাল ও এঞ্জেলিক পরবর্তী কুড়ি বৎসর পরস্পরের সঙ্গে পরম বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলেছিলেন। ম'লিন থেকে জিন ডি শানটাল এঞ্জেলিককে তাঁর শেষ চিঠি লিখেছিলেন ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে—নিজের মৃত্যুর কিছুকাল আগে। এই চিঠিতেও তিনি আরো একবার ভিজিটেশানের সঙ্গে পোর্ট-রয়ালের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছিলেন। এই সব কারণেই এটা আরো আশ্চর্য এবং নিয়তির পরিহাসের মতো লাগে যখন দেখা যায় যে সেণ্ট ফ্রান্‌সয়েজ ডি সেল্‌স্‌ এবং জিন ডি শানটালের অধ্যাত্ম-কন্যারা পরবর্তীকালে যেসুইটদের প্ররোচনায় এত ধর্মদ্বেষী এবং অন্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন যাতে নির্দয় নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাসিনীদের কয়েদে পুরতেও তাঁদের আটকায় নি।

১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে এঞ্জেলিক পোর্ট-রয়াল ছেড়ে প্যারিসে ফবার্গ সেণ্ট জাক্‌সে চলে এলেন। এর কিছুটা কারণ ছিল, পোর্ট-রয়ালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এবং অন্য কারণ ছিল এই যে, তিনি নিজেকে এবং তাঁর সম্প্রদায়কে নিকটস্থ কর্তৃপক্ষের আওতা থেকে মুক্ত করে প্যারিসের আর্চবিশপের অধীনে নিতে চেয়েছিলেন। কেননা পোর্ট-রয়ালের ঐ নিকট-কর্তৃপক্ষ ছিলেন সিটোর সন্ন্যাসীরা। তাঁরা ছিলেন যেমন অজ্ঞ তেমনি অত্যন্ত সাংসারিক মনোভাবাপন্ন।

প্যারিসে এসে এঞ্জেলিক ল্যাংগ্রেসের বিশপ সিবাস্টাইন জামেট-এর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। সে সময়ে ঐ বিশপ এঞ্জেলিকের সংস্কার-কর্মের জন্যে তাঁর

প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশপ শাশ্বত ভক্তির ভিত্তিতে ব্লেসেড স্যাক্রামেণ্ট মেনে নতুন একটি ধর্মসঙ্ঘ স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। এঞ্জেলিক এই প্রথা আগেই পোর্ট-রয়ালে প্রচলিত করেছিলেন বলে তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন হ'য়েছিল খুবই গভীর। সিবাস্টাইন জামেটকে এতো উৎসাহী এবং এতো সুউচ্চ আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বলে মনে হ'য়েছিল, যে এঞ্জেলিক তাঁর আগ্রহ দেখে একেবারে মুগ্ধ এবং আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়লেন। বিশপের মজ্জাগত অগভীরতা, তাঁর সংকীর্ণতা এবং অস্থির-মতিত্বের কথা তিনি অনুমানও করতে পারলেন না।

১৬৩০ খৃষ্টাব্দে এঞ্জেলিকের পদত্যাগের বাসনা সম্পূর্ণ হল। রাজা পোর্ট-রয়ালকে ত্রিবার্ষিক ভিত্তিতে নতুন অধ্যক্ষা নির্বাচনের অধিকার দিলেন। দুর্ভাগ্য-বশত নতুন অধ্যক্ষা হলেন জেনেভাইয়েভ লে টার্ডিফ। তিনি ছিলেন এঞ্জেলিকের মবুইসনে থাকাকালীন শিষ্যা, কিন্তু এখন তিনি সম্পূর্ণভাবে জামেটের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়লেন। সরলমনা এঞ্জেলিক এখন দেখতে লাগলেন, কেমন ক'রে এই অধ্যক্ষা পূর্বতন বহুপ্রয়াসলব্ধ সংস্কারগুলিকে একে একে পদদলিত করতে শুরু করলেন। জেনেভাইয়েভ ভেবেছিলেন যে দারিদ্র্য, ত্যাগ এবং বিনা-প্রশ্নে আনুগত্যে অভ্যস্ত বলে সন্ন্যাসিনীরা একেবারে অপদার্থ হ'য়ে পড়েছেন, সেইজন্যে তিনি তাঁদের লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। তাছাড়া তিনি চাঞ্চল্যকর সব প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা করলেন। এই সব কঠোর ব্যবস্থা এঞ্জেলিক অনৈতিকতা এবং স্বচ্ছন্দ জীবনের মতোই ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে অনাচরণীয় বলে মনে করতেন। তিনি জানতেন যে এই ধরণের ব্যবস্থার ফলে প্রবল ইন্দ্রিয়জ আবেগ-অনুভূতি দেখা দেয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম আবেগ-সম্পন্ন সাধিকাদের মধ্যে আত্মমহিমা প্রচারের ঝোঁক দেখা দিতে থাকে।

এদিকে ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন ভক্তির ভিত্তিতে ব্লেসেড স্যাক্রামেন্টের এক নতুন সম্প্রদায় স্থাপিত হল, তখন জামেটের আর এঞ্জেলিককে প্রধানা কর্মাধ্যক্ষা নিযুক্ত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু প্যারিসের আর্চ-বিশপ এঞ্জেলিককে নিয়োগ করার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এর মধ্যে ঐ নতুন সম্প্রদায়টি লোপ পেয়ে গেল। ফলে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে এঞ্জেলিক তার অনুবর্তিনী সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে আবার পোর্ট-রয়ালে ফিরে গেলেন।

অথচ এই জামেটই মঠাধ্যক্ষ সেণ্ট সাইরাণ, অর্থাৎ জিন ডু ভার্জিয়ার ডি হরেন-কে পোর্ট-রয়ালে পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনাটি সমস্ত সম্প্রদায়ের পক্ষেই অত্যন্ত বিষময় এবং মারাত্মক হ'য়ে উঠেছিল। কেননা সেণ্ট-সাইরাণের সঙ্গে

এই যোগাযোগের ফলেই পোর্ট-রয়াল বিশেষভাবে প্রচার লাভ করেছিল এবং তারই ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস ঘটে। সেণ্ট-সাইরাণ ছিলেন বেরুলের কার্ডিনাল জানসেনের এবং সেণ্ট ভিনসেণ্ট ডি পলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী রিচেলুও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং নিজের কাজে তাঁর সাহায্যে চেয়েছিলেন। কিন্তু রিচেলু আবার সেণ্ট-সাইরাণের অতিরিক্ত স্বাধীনতাপ্রিয়তায় বিরক্তও হ'য়েছিলেন; এবং হয়তো তিনি সেণ্ট-সাইরাণকে নিজের পদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক'রে ভয়ও করতেন। সেণ্ট-সাইরাণ কথায় ও কাজে ছিলেন ভীতিমূলক ধর্মকৃত্যের সমর্থক। এ মত এঞ্জেলিকের মতেরই অনুরূপ। কেননা, একজন খাঁটি অগাস্টিয়ানের মতো সেণ্ট-সাইরাণও বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের করুণা ব্যক্তির কর্মের উপর নির্ভর করে না। এটা ঈশ্বর সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় দান করেন। এর জন্যে কেউ ঈশ্বরের উপর দাবী করতে পারে না—এমনকি সব থেকে ভক্তিমান ঈশ্বরানুরাগীও নয়। এঞ্জেলিক ভাবলেন তিনি নতুন একজন সেণ্ট ফ্রান্সেয়েজ ডি সেল্স্ খুঁজে পেলেন। পোর্ট-রয়ালের সমস্ত অধিবাসীরাই অচিরে এই নতুন কর্মাধ্যক্ষের প্রতি এত গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠল যে সেবাস্টাইন জামেট ঈর্ষান্বিত হ'য়ে পোর্ট-রয়ালের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের শত্রুদের পক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। এদিকে গ্যাস্টন ডি অর্লিয়ানের বিবাহবন্ধন নাকচ করতে অস্বীকার করায় সেণ্ট-সাইরাণ প্রধান মন্ত্রী রিচেলুর কাছে অপদস্থ হ'য়ে ভিনসেনেস-এ কারারুদ্ধ হলেন। অবশ্য তার অন্যতম কারণ ছিল প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তির বিষয়ে কার্ডিনালের বিরোধী মত পোষণ করা, এটাও উল্লেখ করা দরকার।

কারাগারে থেকেই সেণ্ট-সাইরাণ পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাসিনীদের উপদেশ দিয়ে পরিচালিত করতেন। তারপর রিচেলুর মৃত্যুর পর মুক্তিলাভ ক'রে প্রথমে তিনি এসেছিলেন এই পোর্ট-রয়ালেই। তার কিছুকাল পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ধর্মশিক্ষক ছিলেন তিনিই। পোর্ট-রয়ালের তিনি ছিলেন পিতৃস্থানীয়। মেরে এঞ্জেলিক এবং তাঁর মধ্যে মেজাজ ও মতবাদের দিক থেকে যতো সাদৃশ্য ছিল ততো সাদৃশ্য অন্য কোনো নারী-পুরুষের মধ্যে বিরল। তাঁরা দুজনেই ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী; তাঁদের দুজনেরই ব্যক্তিত্ব এতো প্রখর ছিল যে অন্যরা তার কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেতেন; কী করে সহগামী মানুষদের নিজের আদর্শে বিশ্বাসী ক'রে অনুগামী করা যায় তাও তাঁরা দুজনেই ভালোভাবে জানতেন; যা তাঁরা সত্য বলে জানতেন সে বিষয়ে তাঁরা দুজনেই ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

১৬৪২ থেকে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এঞ্জেলিক চারবার পোর্ট-রয়ালের অধ্যক্ষা নির্বাচিত হন। এই সময়টা মোটামুটি শান্তিতেই কেটেছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাইশ বছর প্রবাস জীবনের পর তিনি কয়েকজন সন্ন্যাসিনীকে সঙ্গে নিয়ে পোর্ট-রয়াল ডেস ক্যাম্পসে ফিরে আসেন। সেখানে নির্জনবাসী সন্ন্যাসীরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

খ্রন্ডে-র যুদ্ধের সময় এঞ্জেলিক মঠের দরজা উন্মুক্ত ক'রে যাঁরা শরণাগত তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর কখনো তাঁকে এতোদূর আত্মোৎসর্গ করতে, দুঃখীর জন্যে এতো সহানুভূতি প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। মঠে যা কিছু ছিল সবই তিনি নিরাশ্রয় ও বিপন্ন মানুষের সেবার জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এতোখানি বাস্তববোধ ও স্থৈর্য এবং এরকম অসাধারণ সংগঠনশক্তিও আগে কখনো তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি।

যুদ্ধের নৃশংসতার মধ্যে এই যে তিনি সাহস দেখিয়েছিলেন সেইরকম অনড় সংকল্প নিয়েই তিনি এবার ধর্মীয় উৎপীড়নের সম্মুখীন হলেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এবং তাঁর অধীনস্থ সন্ন্যাসিনীদের বলা হল, তাঁদের 'অগাস্টিনাস' গ্রন্থে উল্লিখিত পঞ্চ-প্রস্তাবকে অস্বীকার ক'রে একটি বিবৃতিতে সই দিতে হবে। সই তাঁরা দিলেন, কিন্তু তাতেও শান্তি পাওয়া গেল না।

কিছুকালের জন্যে অবশ্য উৎপীড়ন এবং নিন্দাবাদ থেমে রইল। কিন্তু সেটা ঘটল এমন একটা ঘটনার জন্যে যাকে পোর্ট-রয়ালের বাসিন্দারা এবং বাইরের লোকেরা দৈব-ঘটনা বলেই মেনে নিলেন। মেরে এঞ্জেলিকের এক পুরোহিত আত্মীয় একটা কাঁটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, সেটা মনে করা হল খ্রীষ্টের কণ্টক-মুকুট থেকেই খসে পড়েছিল। তিনি সেটাকে পোর্ট-রয়ালে পাঠিয়ে দিলেন। এই সময়ে মঠে দশবৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ছিল, যাঁর একটি দুরারোগ্য স্ফোটক হ'য়েছিল। কিন্তু শিশুটির ভারপ্রাপ্তা সন্ন্যাসিনী ঐ স্ফোটকে কণ্টক-রক্ষিত স্ফটিকের বাক্সটি ছোঁয়াতেই সেটা তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল এবং কোনো চিহ্ন পর্যন্ত রইল না। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানালেন যে যেভাবে স্ফোটকটি মিলিয়ে গেছে তা করা সাধারণ কোনো ঔষধের পক্ষে সম্ভবই নয়। তখন প্যারিসের আর্চ-বিশপ একে 'দৈব-ঘটনা' বলে ঘোষণা করলেন। এ ঘটনার কথা ব্লেজ পাস্কালও তাঁর সুবিখ্যাত চিঠিগুলির একটিতে সপ্রশংসভাবে উল্লেখ ক'রে গেছেন। এদিকে রাজ-দরবারে অনেকের কাছে এটা অবিশ্বাস্য মনে হল যে ঈশ্বর তাঁর এই অসাধারণ করুণা প্রকাশ করেছেন এমন একদল ধর্মবিরোধীর কাছে যাঁরা বিপজ্জনক এবং ধর্মদ্বেষী রীতিনীতি প্রচার করেন? কিন্তু তাঁরা চুপ-

চাপই রইলেন। তা সত্ত্বেও শান্তিপর্ব খুব বেশীদিন স্থায়ী হল না। কিছুকাল পরেই অন্য একটি স্বীকৃতিপত্র মুসাবিদা করা হল এবং সেটাতে বিনা বাক্যব্যয়ে সকলকে সই দিতে বলা হল। কেননা পোপ ইতিমধ্যে সুস্পষ্টভাবেই রায় দিয়েছিলেন যে, যে 'পঞ্চপ্রস্তাব' জানসেনের বইতে আছে তা আপত্তিকর।

পোর্ট-রয়ালের সন্ন্যাসিনীরা অবশ্য ঐ স্বীকৃতিপত্রে একটি ভূমিকা না জুড়ে তাতে সই করতে রাজি হলেন না। কারণ ওতে সই করা মানেই হল সেন্ট-সাইরাণ এবং জানসেনকে ধিক্কার দেওয়া। কয়েকজন আবার ভূমিকা জুড়েও সই করতে রাজি ছিলেন না। ব্লেজ পাস্কালের ভগ্নী জাকেলিন পাস্কাল, যিনি বহু বৎসর আগে পোর্ট-রয়ালে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি তো আশাভঙ্গের প্রাবল্যে মারাই গেলেন।

নির্জনবাসী হিসাবে সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অন্যত্র চলে গেলেন, বিদ্যালয়-গুলি বন্ধ হ'য়ে গেল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল প্যারিসের সন্ন্যাসিনী-দের আদেশ দেওয়া হল তাঁরা যেন তাঁদের বৃত্তিভোগীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। লা মেরে এঞ্জেলিক তাড়াতাড়ি প্যারিসে গিয়ে সেখানকার সন্ন্যাসিনীদের সমর্থন করতে চেষ্টা করলেন। তখন তাঁর বয়স সত্তর বৎসর। তাঁর ভ্রাতা ডি' অ্যান্ডিলির সঙ্গে বিদায় কালে তিনি যে শেষ কথা বলেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করা হ'য়েছিল। মঠের সদর দরজার বাইরে গাড়ীতে ওঠার আগে এঞ্জেলিক তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে এইভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন।

এঞ্জেলিকঃ "বিদায় ভাই। যাই ঘটুক, সাহস হারিও না।"

ভ্রাতাঃ "আমার জন্যে ভয় পেও না বোন। আমার যথেষ্ট সাহস আছে।"

এঞ্জেলিকঃ "না ভাই,—ভাই আমার, বিনয়ী হওয়াই ভালো। আমাদের মনে রাখা উচিত, চরিত্রের দৃঢ়তা ছাড়া বিনয় যেমন কাপুরুষতা, তেমনি বিনয় ছাড়া সাহসও মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে।"

৪ঠা মে তারিখে সন্ন্যাসিনীদের আদেশ দেওয়া হল তারা যেন শিক্ষার্থিণীদের অন্যত্র পাঠিয়ে দেন, এবং নতুন কাউকে ভর্তি না করেন। এঞ্জেলিকের আত্মত্যাগ এবং অধ্যাত্ম-সাধনাময় জীবনের এটা হল একেবারে উপসংহার, তাঁর সংস্কার-কর্মেরও যবনিকা পতন ঘটল এখানেই। যা কিছুর জন্যে তিনি বেঁচে ছিলেন এবং তিনি যতো কিছু স্বপ্ন দেখেছিলেন, সবই ধ্বংস করে কাদার মধ্যে পদদলিত করা হল, এবং কাজটা ঘটল সেই গির্জা প্রতিষ্ঠানেরই দ্বারা যাকে তিনি এতো শ্রদ্ধা, এতো ভক্তি করতেন। কিন্তু এঞ্জেলিক মনে করলেন, অত্যাচার বা ঈর্ষার দ্বারা যে এটা ঘটেছে তা নয়, এটা ঈশ্বরেরই লীলা। তিনি প্রতিনিয়ত এই বলে

সাহস দিতে লাগলেন, "ভগিনীগণ, এতে বিস্মিত হয়ো না, বা হতাশ হ'য়ো না। বিনয় আনো হৃদয়ে, বিনয়।" তিনি আরো বলতেন, "ঈশ্বর যা করেন তা পরম প্রজ্ঞা এবং একান্ত করুণার বশেই করেন, এটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি। আমাদের বিনয়ী হওয়ার জন্যে যা কিছু ঘটেছে তা ঘটার দরকার ছিল। এতো আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে আর বেশীদিন থাকা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে উঠত। ফ্রান্সে আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ও এতো অধ্যাত্ম-সৌভাগ্য লাভ করেনি। সকলেই আমাদের কথা বলাবলি করে। সত্যি আমাকে বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের হাত থেকে আমাদের বিনয়-শিক্ষার বড় দরকার হ'য়ে পড়েছিল। তিনি যদি আমাদের নত না করতেন, তবে হয়তো আমাদের পতন ঘটত। মানুষ তার কর্মের কারণ দেখতে পায় না। কিন্তু ঈশ্বর উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই কর্ম করে, সেজন্যে তিনি সবই স্পষ্ট দেখতে পান।"

১৬৬১ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর লোকান্তর ঘটে। মৃত্যুকাল পর্যন্তও তিনি নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। মৃত্যুকে তিনি চিরকালই ভয় পেতেন। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় তিনি তাঁর বন্ধু জিন ডি শানটালের চেয়ে বেশী শান্তভাব প্রকাশ করেছিলেন। মৃত্যুকে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের চরম সময়'— কিন্তু তাঁর স্থির বিশ্বাস দেখা দিয়েছিল যে, "ঈশ্বরের চরম সময়" বেশী দূরে নেই।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আসল পোর্ট-রয়ালের মৃত্যু ঘটেছিল। কারণ একথা ভোলা অসম্ভব নয় যে, আসল পোর্ট-রয়ালের প্রাণই ছিলেন মেরে এঞ্জেলিক। সেকালের ফরাসী দেশের সর্বব্যাপী চারিত্রিক স্খলন এবং স্ফূর্তির আবহাওয়ার মধ্যে বাস করেও সত্যকার মানুষ যাঁরা ছিলেন, যাঁরা জীবনের মহত্তর সার্থকতার অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করার জন্যে পোর্ট-রয়ালে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন, কেবল এঞ্জেলিকেরই উৎসাহ, বিশ্বাস ও আন্তরিকতার মহৎ দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে। সেখানে যতো সন্ন্যাসিনী ও নির্জনবাসিনী ছিলেন সকলের মধ্যে এঞ্জেলিকেরই অসীম সাহস ও প্রবল ব্যক্তিত্ব কাজ করে যেতো। কাজেই কেবল প্রতীচ্যের নয় সারা বিশ্বের মহীয়সী ধর্মসংস্কারিকার সঙ্গেই তিনি একাসনে স্থান পাবেন, যদিও গির্জা-প্রতিষ্ঠান তাঁকে স্বীকার করে নেয়নি। অথচ এই গির্জা-প্রতিষ্ঠানের জন্যেই তিনি সারা দেশ যাতে শুচিতা ফিরে পায় সেজন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন।

আমাদের কালে তাঁর কঠোরতা, অনমনীয়তা এবং ঈশ্বরের ধারণায় উগ্রতার মনোভাব হয়তো সকলে মেনে নিতে না পারেন। তবু বহুদিক থেকে তাঁকে এখনও জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো অনুসরণ করা যায়।

বাহিরের দিক থেকে তাঁর পোর্ট-রয়াল তাঁর সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করেছে ঠিকই, কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, তা এখনো বেঁচে আছে এবং বেঁচেই থাকবে—যতোদিন আন্তরিকতা, সৎসাহস এবং সত্যানুরাগকে বরণীয় বলে মনে করবে মানুষ। তাঁর মতো নারীর জীবন পরম পুণ্যের মধ্যে আত্ম-সমাহিত,—এবং যাঁরাই তাঁদের সংস্পর্শে আসেন সেই পুণ্যের আলোকে ধন্য হ'য়ে যান।

মাদার ক্যাব্রিনি

রোম নগরীতে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুন একটি মন্দির "মাদার অব দি এমিগ্রান্টস্"-এর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই 'মাদার' সেণ্ট ফ্রন্সেস স্যাভিয়ার ক্যাব্রিনি নামে পরিচিতা ছিলেন। মন্দিরটি অবস্থিত ছিল 'হোলি রিডীমার' গির্জার প্রাঙ্গণে। এই গির্জা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, মাদার ক্যাব্রিনির দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। মাদার ক্যাব্রিনি সব কিছুই করতেন ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারে। গির্জাটি স্থাপন করেন তিনি পরম পিতারই নির্দেশে। তাঁর জীবন ও কর্মের মূলমন্ত্র ছিল আনুগত্য, উপাসনা ও কর্মযোগ। আর এইজন্যেই শিশুকাল থেকেই যদিও তাঁর বাসনা ছিল যে তিনি চীনদেশে ধর্মযাজিকার কাজ নিয়ে যাবেন, তবু ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানেও তিনি বহু সৎকাজের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন।

ইটালীর সাণ্ট এঞ্জেলো ডি লোডি (লম্বার্ডি) নামক স্থানে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মারিয়া ফ্রান্সেসকা ক্যাব্রিনি। তাঁর তেরজন ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠা। তাঁর পিতামাতা ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মায়ের বয়স হ'য়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রোজের দ্বারা পালিত হন। এই ভদ্রমহিলার একটি ছোট বিদ্যালয় ছিল; আর প্রকৃতই তিনি ছিলেন শুষ্ক, কঠোরভাষী, আধিপত্যপরায়ণা শিক্ষিকা। এভাবে কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় প্রতিপালিত হ'য়ে ভবিষ্যৎ সন্ন্যাসিনী হিসাবে ফ্রান্সেসকার প্রস্তুতি বেশ ভালোই হ'য়েছিল বলতে হবে। কেননা এর দ্বারাই ক্যাব্রিনি পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ ধরনের কঠোর শৃঙ্খলায় কাজ কখনো ভালো করে উদ্‌যাপিত হয় না। আর সেজন্যেই তিনি তাঁর সদয় ব্যবহারের জন্যে সুপরিচিতা হ'য়ে উঠেছিলেন।

শৈশবে ফ্রান্সেসকা রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য বালিকা ছিলেন। তারপর সারাজীবনই তাঁকে স্বাস্থ্যহীনতার ভার ব'য়ে বেড়াতে হয়। অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ধর্ম-জীবনের দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পেতে থাকে। তাঁর পুতুলগুলিকে সন্ন্যাসিনীর সাজে সাজিয়ে তিনি তাদের অধ্যক্ষার আসন গ্রহণ করতেন। এই সময়েই তিনি তাঁর ভগ্নী রোজকে ভবিষ্যতে তিনি ধর্মযাজিকা হবেন এ বাসনার কথা প্রকাশ করেন। তাঁর কাকা ছিলেন নিকটবর্তী এক শহরের সামান্য

পুরোহিত। তাঁর কাছে যখন যেতেন তখনও ফ্রান্সেসকা এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করতেন। এখানে শহরের মধ্যস্থ একটি নালার জলে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে খেলা করতেন তিনি। নৌকোর মধ্যে ভায়লেট ফুল রেখে তিনি সেগুলিকে ধর্মযাজিকা মনে করে কল্পনা করতেন, যেন তাদের তিনি সারা পৃথিবীতে ধর্ম-প্রচারের জন্যে পাঠাচ্ছেন। সাত বছরের বালিকার পক্ষে এ ধরনের খেলা একটু অস্বাভাবিক বইকি? তবে অচিরেই তিনি এমন সব অভিজ্ঞতা অর্জন করে-ছিলেন যাকে বলা যায়, একেবারে অসাধারণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রথম ধর্মকৃত্যের সময় তিনি ভাবাবেশের অবস্থায় ঈশ্বর-মিলন উপলব্ধি করেন। এ উপলব্ধি ছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে এক মহীয়সী ধর্মসাধিকা হওয়ারই যোগ্য ভূমিকা। বহু বৎসর পরে মাদার ক্যাব্রিনি এ বিষয়ে বলেছেন, "যে মুহূর্তে পুণ্যজল আমার শরীরে নিষিক্ত হল তখনি আমার মনে এমন একটা ভাবের উদয় হল যা আমি কখনোই ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।......আমার মনে হল, আমি যেন আর পৃথিবীতে নেই। আমার হৃদয় এক অতি পবিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। কী আমি অনুভব করেছিলাম তা আমি বলতে পারব না, কিন্তু আমার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমার হৃদয়ে ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত হ'য়েছেন।"

এই প্রথম অবস্থাতেই তাঁর আত্মসংযম ও ঈশ্বর ভক্তির এমন মনঃসংযোগ দেখা দিল যে একবার এক ভূমিকম্পের সময়েও তিনি স্থিরভাবে বসে ধ্যান করে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর পিতামাতা ভীতভাবে এখানে ওখানে খুঁজে তবে তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। এটা নিশ্চয়ই তাঁর নিয়মিত ধ্যানসাধনার ফলেই সম্ভব হ'য়েছিল। এই অধ্যাত্ম-সাধনার সঙ্গে অন্য একটি কারণও যুক্ত হ'য়েছিল। এগারো বৎসর বয়সে ফ্রান্সেসকার প্রথম গুরু গ্রামের পুরোহিত তাঁকে সতীত্বের ব্রত গ্রহণে অনুমতি দেন। কিন্তু, গির্জা-প্রতিষ্ঠান থেকে বিধিমতো অনুমতি পেয়ে এই ব্রতকে আজীবনব্যাপী গ্রহণের সুযোগ পান তিনি উনিশ বৎসর বয়সে। বহু বৎসর পরে সেই গ্রাম্য পুরোহিত তাঁকে লিখেছিলেন যে তিনি প্রথম থেকেই ফ্রান্সেসকাকে একজন মহীয়সী ধর্মসাধিকা বলে চিনতে পেরেছিলেন। ফ্রান্সেসকার দ্বিতীয় গুরু ছিলেন স্থানীয় গির্জার একজন ধর্মযাজক। পনের বৎসর বয়সে তিনি ঐ ধর্মযাজকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ ঘটনাকে অত্যন্তই সৌভাগ্যজনক বলতে হবে। কারণ ঐ ধর্মযাজকের সারগর্ভ উপদেশের ফলেই ফ্রান্সেসকা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হতে পেরেছিলেন। সেই কিশোরবয়সে যখনি তিনি ধর্মযাজককে কোনো সমস্যার কথা জানাতেন তখনি

তিনি এই উত্তর পেতেন, "যাও, যীশুকে এই কথা জানাও।" এর ফলে তাঁর সঙ্গে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। তাঁর মতো একজন সাধিকা যিনি নিয়মিত কোনো অধ্যাত্ম-উপদেশ পাননি, তাঁর পক্ষে এই রকম আত্ম-বিকাশের ধারা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

তের বৎসর বয়সে ফ্রান্সেসকাকে অর্লুনো নামে এক নিকটবর্তী শহরে 'ডটার্স অব দি সেক্রেড হার্ট' পরিচালিত বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দেওয়া হল। তিনি সেখানে পাঁচ বৎসর পড়াশোনা করে আঠারো বৎসর বয়সে শিক্ষকতার উপাধিলাভ করলেন। তাঁর ছাত্রীজীবন শেষ হল লোডি নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে। সেখানকার পরীক্ষাতে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এই সময়ে তিনি দুবার কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তা হ'তে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বাড়ীতে ফিরে ফ্রান্সেসকা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, এবং গ্রামের পুরোহিতের অনুরোধে তিনি অবহেলিত ছেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সান্ট এঞ্জেলোতে বসন্ত রোগের মহামারী দেখা দিল। তাঁর ভগ্নী রোজের সঙ্গে ফ্রান্সেসকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর ফলে তিনি নিজেও রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়লেন। তারপর রোগমুক্ত হওয়ার পর ভিডার্ডো নামে এক পার্শ্ববর্তী শহরে শিক্ষিকার কাজে যোগ দিলেন। এই সময়ে বহু রাত্রি তিনি জেগে জেগে ঈশ্বরোপাসনায় কাটিয়ে দিতেন। এর সঙ্গে তিনি তপশ্চর্যার অন্যান্য আনুষঙ্গিক কৃত্যও পালন করতে শুরু করলেন। এমনিতেও তাঁর স্বাস্থ্য কখনো ভালো ছিল না। এই অতিরিক্ত কষ্টভোগের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। পরবর্তীকালে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে এটা তাঁর ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর পরিণত বয়সের সিদ্ধান্তের ফলে তিনি এমন একটি বক্তব্য রূপায়িত করেছিলেন, যেটা তাঁর নিজের জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। একটি ধর্মসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ধর্মের অনুশাসনগুলি কায়মনে মেনে চললেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্টভাবে হতে পারে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর অনুবর্তিনী সন্ন্যাসিনীদের লিখেছিলেন, "অনুগত হও, তাহলেই তোমরা ধর্ম-সাধিকা হ'তে পারবে। অনুশাসন মেনে চলার একটি উদাহরণ সারা বছর স্বেচ্ছায় উপবাস পালন করার চেয়ে বেশী মূল্যবান।"

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সেসকা কোডোগ্নো নামে এক ছোট শহরে একটি অনাথ বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষার পদ গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে

'হাউস অব প্রভিডেন্স' হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। এর ব্যয় নির্বাহ হত একজন খামখেয়ালী ধনী মহিলার অর্থে এবং তিনি নিজেই হয়েছিলেন এর প্রধানা শিক্ষিকা। লোডির বিশপের অনুরোধে এই মহিলা সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল অ্যান্টনিয়া টোনডিনি। বিশপ মনে করেছিলেন এই সন্ন্যাস-গ্রহণের ফলে অ্যান্টনিয়ার চরিত্রে পরিবর্তন আসবে এবং তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় উন্নতি ঘটাতে পারবেন। কিন্তু সেদিকে বিশেষ কিছুই সুফল দেখা গেল না। এইরকম অপ্রকৃতিস্থ-প্রকৃতির একজন প্রধানা শিক্ষিকার খামখেয়ালীপনায় বিশৃংখল একটি বিদ্যালয়ে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন ফ্রান্সেসকা। এখানে তিনি ছ'বৎসর ছিলেন, আর এখানেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। যদিও অব্যবস্থিতচিত্ত প্রধানা শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের প্রকৃত উন্নতিতে বারেবারেই বাধা দিতে লাগলেন, তবু অনাথা ছাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলল। কয়েকজন তরুণী নারী সন্ন্যাস গ্রহণের জন্যে শিক্ষার্থিনীও হলেন। এই তরুণীরা ফ্রান্সেসকা ক্যাব্রিনির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। ফ্রান্সেসকা তাঁদের মধ্যে অধ্যাত্মভাব জাগ্রত ক'রে ধর্মযাজিকার কাজে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললেন। এইভাবে ফ্রান্সেসকার ভবিষ্যৎ জীবন প্রায় তৈরী হয়েই উঠছিল, অচিরেই একটি ঘটনায় এই প্রক্রিয়ায় আরো বেশী গতি-সঞ্চার হল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে অ্যান্টনিয়া টোনডিনিকে নিয়ে এতো অসুবিধা হ'তে লাগল যে বিশপ শেষ পর্যন্ত 'হাউস অব প্রভিডেন্স' প্রতিষ্ঠানটি তুলে দিতে বাধ্য হলেন। এর ফলে ফ্রান্সেসকা এবং তাঁর অনুবর্তিনীরা নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়লেন। বিশপ জানতেন যে, ভিতরকার এই ছোট গোষ্ঠীর জন্যেই 'হাউস অব প্রভিডেন্স' চলছিল, আর তিনি এও জানতেন যে ফ্রান্সেসকার আদর্শ ছিল ধর্মপ্রচারিকা হওয়া। এজন্যে অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তিনি ফ্রান্সেসকাকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি ধর্মপ্রচারিকা সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠান করেন। এইভাবে ফ্রান্সেসকার আসল কাজ শুরু হল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর ফ্রান্সেসকা ক্যাব্রিনি তাঁর অনুবর্তিনীদের নিয়ে কোডেগ্নো শহরেই ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীদের এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে উঠে এলেন। এইদিন থেকে তাঁর স্থাপিত সেই প্রতিষ্ঠানটির সূত্রপাত ঘটল যা কাল-ক্রমে 'মিশনারী সিস্টার্স অব দি সেক্রেড হার্ট' নামে পরিচিত হয়েছিল। 'সেক্রেড হার্টে'র একটি প্রস্তরমূর্তি বাড়ীটির মাথার উপর রাখা হল, মাঙ্গলিক প্রার্থনা উচ্চারিত হল, এবং মাদার ক্যাব্রিনি তাঁর কাজকর্ম শুরু করলেন। এর প্রভাব পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

একটি ধর্মপ্রচারিকা-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী হওয়ার পর মাদার ক্যাব্রিনি 'জাভিয়ার' শব্দের ইটালীয় প্রতিরূপ 'সাভেরিও' নামটি তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি কখনো নিজেকে "মাদার ফ্রাউণ্ড্রেস" বলে ডাকতে দিতেন না, তিনি ডাকতে বলতেন শুধু 'মাদার ক্যাব্রিনি' বলে। এর কারণ হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, "আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী হলেন করুণাময়ী 'জননী', আমাদের প্রভু হলেন যীশুর হৃদয়, সেণ্ট ফান্সয়েজ ডি সেল্স্ হলেন আমাদের ব্যবস্থাপক, এবং সেণ্ট ফ্রান্সিস জাভিয়ার হলেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক।"

এই সময়ে প্রতিদিন বহুক্ষণ ধরে অধ্যাত্ম চিন্তায় মগ্ন থেকে মাদার ক্যাব্রিনি নিজেকে উন্নততর আদর্শে গড়ে তুলছিলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের সদস্যাদের দেখা-শোনার কাজে অবহেলা করতেন না। তাঁদের তিনি ভবিষ্যৎ কর্মের জন্যে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তুলছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন আজন্ম শিক্ষাব্রতী। দৃঢ়চেতা অথচ স্নেহপ্রবণ এই মহীয়সী নারী ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা এবং ধর্মমূলক সমাবেশের ভিতর দিয়ে তাঁর নবীনা সন্ন্যাসিনীদের এই শিক্ষা দিতেন যে তাঁরা যেন নিজেদের শক্তির চেয়ে বৃহত্তর এক শক্তির উপর ভরসা রাখেন। মাদার ক্যাব্রিনির আদর্শগ্রন্থ ছিল সেণ্ট ইগ্নাসিয়াসের 'স্পিরিচুয়াল এক্সারসাইজেস্' নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বর্ণিত অধ্যাত্ম-সাধনা তিনি নিজেও অনুসরণ করতেন, তাঁর অনুবর্তিনীদেরও তেমনি অনুসরণ করতে বলতেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর মাদার ক্যাব্রিনি চারজন শিক্ষার্থিনী এবং পঁচিশ বৎসর বয়স্কা একজন শিক্ষিকাকে নিয়ে ক্রেমোনার কাছে গ্রুমেলো বলে এক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রন্ধন, সূচীকর্ম এবং ধর্মশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এইভাবে শুরু হয় এমন এক সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টা যা তিনটি মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে বহু প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মিলান, বোরোনেট্টো, লিভাগ্রা, রোম এবং অন্যান্য স্থানে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন মাদার ক্যাব্রিনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইটালীয়গণ বহুল সংখ্যায় বসবাসের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে থাকে। ক্রমে খবর পাওয়া গেল যে দরিদ্র ইটালীয়গণ নিউইয়র্ক, শিকাগো, এবং অন্যান্য মার্কিনী শহরে অত্যন্ত জঘন্য ভাবে বাস করছে। কিন্তু এই মর্মান্তিক অবস্থার প্রতিকারের জন্যে বিশেষ কিছুই করা হল না। পোপ ত্রয়োদশ লিও মনে করলেন একটি ইটালীয় সন্ন্যাসিনী-

সংঘ যদি আমেরিকায় যান তবে সেখানে দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্থ আশ্রয়-প্রার্থীদের মধ্যে তারা ভালভাবে সেবাকার্য চালাতে পারবেন। এই রকম একটা সময়ে নিউইয়র্কের আর্চবিশপ করিগান মাদার ক্যাব্রিনিকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন এই উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক শহরে এসে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। নিভৃত প্রার্থনায় ঈশ্বরকে মাদার ক্যাব্রিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন কি না। ঈশ্বর সম্মতিসূচক প্রত্যাদেশ দিলেন। তখন পোপের আশীর্বাদ নিয়ে মাদার ক্যাব্রিনি কাজে নেমে পড়লেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ মাদার ক্যাব্রিনি একদল সন্ন্যাসিনী নিয়ে নিউইয়র্কে পেঁছালেন। এখানে এসে তাঁর একটি অনাথাশ্রম এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্যে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে কী যে একটা ভুল ঘটে গেল, আর্চবিশপ করিগান তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। আর কেবল তাই নয় তিনি তাঁকে কোনো কাজ দিতেও চাইলেন না। কিন্তু এরপর যখন তিনি জানালেন যে মাদার ক্যাব্রিনির ইটালীতে ফেরাই উচিত, তখন মাদার ক্যাব্রিনি উত্তর দিলেন, "পরম পিতা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, এবং আমি এখানেই থাকব।"

মাদার ক্যাব্রিনি ছিলেন অকুতোভয়, সাহসী এবং অধ্যাত্ম-আদর্শে উদ্দীপিত। ফলে তিনি আর্চবিশপের প্রতিকূলতা কাটিয়ে একটা অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু অর্থের অভাব তবু থেকেই গেল। সেজন্যে চাঁদা তুলে এবং ইটালীয় পল্লীতে ভিক্ষা করে অর্থের ব্যবস্থা করতে হল। প্রয়োজনটা এতো গুরুতর ছিল যে খাদ্যদ্রব্যের ভিক্ষাও সযত্নে গ্রহণ করা হত। অনাথাশ্রমের কর্মীরা মস্ত বড় ঝুড়ি নিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে খাদ্যদ্রব্য পেলে তাও সাগ্রহে গ্রহণ করতেন। গৃহহারা ছেলে-মেয়েদের যত্ন নেওয়া, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং খাদ্য জোগানোর ব্যবস্থা করতে হত। সেই সঙ্গে তাদের ধর্মগত ঐতিহ্যও রক্ষা করা হত। তাছাড়া ইটালীয় পল্লীতে অন্য যে সব ছেলেমেয়ে বাস করত তাদেরও ধর্ম শিক্ষার দায়িত্বকে এড়িয়ে যাওয়া হত না। এই কর্তব্যগুলো পালন করার জন্যে নিউইয়র্ক শহরের "খুদে ইটালী" অঞ্চলে সেন্ট জোয়াকিস গির্জায় অনাথাশ্রম থেকে সন্ন্যাসিনী পাঠানো হত। এখানে তাঁরা 'সম্মিলিত প্রার্থনা' বা 'ম্যামে'র সময় শিশুদের দেখা-শোনা করতেন, বিকেলে তাদের ধর্মশিক্ষা দিতেন। এর কিছুকাল পরেই খ্রীষ্টীয় ধর্মনীতির বিষয়ে অল্প বয়স্কা নারী এবং একটু বড় বয়সের বালিকাদের জন্যে একটি বিদ্যালয় খোলা হয়। এইভাবে সেন্ট জোয়াকিস গির্জা-অঞ্চল ক্রমে ইটালীয় কেন্দ্রে পরিণত হল।

মাদার ক্যাব্রিনির স্বাস্থ্য যদিও বরাবরই খুব খারাপ চলছিল, তবু তিনি ছিলেন অদম্য উৎসাহী কর্মী। বলা যায়, তাঁর একমাত্র বিশ্রামের অবসর ছিল, যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে আটলাণ্টিকের পথে মাঝে মাঝে অন্য দেশে পাড়ি দিতেন, সেই সময়ে। সে সময়টা তিনি অযথা নষ্ট করতেন না. অন্য কাজে নামার প্রস্তুতিকাল হিসাবে ব্যবহার করতেন। এইভাবে তিনি সাঁইত্রিশ বার সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে ছিলেন। এই সময়ে তিনি সন্ন্যাসিনীদেরও কর্মস্থল পরিবর্তন করতেন। মার্কিনী কর্মীদের তিনি কোডগ্‌নোয় এবং ইটালীয় কর্মীদের তিনি আমেরিকায় নিয়ে আসতেন সঙ্গে করে। তিনি তাঁর কর্মী-সন্ন্যাসিনীদের প্রায়ই বলতেন, "আমরা কিছুই করতে পারি না কিন্তু ঈশ্বরের আশ্রয় নিলে সব কিছুই করতে পারি। এ পৃথিবীতে বিশ্রামের খোঁজ করো না. জীবনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যীশুর সঙ্গে একত্র মৃত্যুবরণ করার জন্যে প্রস্তুত থেকো।......সংগ্রাম যতো বেশী করবে, পুরস্কারও হবে ততো বড়—শাশ্বত কালের সে মুকুট কেউই তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।" মাদার ক্যাব্রিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে তাঁরই আদেশ পালন করে নিজের কাজ করে যেতেন সর্বত্র। এইভাবে একবার অ্যাণ্ডিস্ পর্বতমালা পার হতে গিয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী গিয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক অশান্তির জন্যে আরেকবার তিনি নিকরাগুয়া থেকে বহিষ্কৃত হ'য়েছিলেন। নিউ অর্লিয়ন্স শহরে একটা তথাকথিত হত্যাকাণ্ডের জন্যে তেরজন ইটালীয়কে অশেষ উৎপীড়ন ক'রে বধ করা হ'য়েছিল। সেখানেও তিনি দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতা এবং মুনাফালোভীদের মধ্যে থেকে কাজ করতে সাহসী হ'য়েছিলেন। তিনি তাঁর কর্মী সন্ন্যাসিনীদের বলতেন, "কিছুতেই দমে যেও না। তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে, নিজের মতে নয়, ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে। আমি নিজে এটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছি যে, যখনই কোনো কাজে আমি ব্যর্থ হ'য়েছি তখন সেটা ঘটেছে নিজের শক্তির উপর খুব বেশী আস্থা রেখেছি বলেই। আমরা কেউই ব্যর্থ হব না, যদি সব কাজের ভার ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিতে পারি। তাঁর কাছে সম্ভব আর অসম্ভবের কোনো মানে নেই।" আরেকবার তিনি কর্মীদের বলেছিলেন, "পূর্ণতা পাওয়ার জন্যে কেবল মাত্র এইটুকু করতে হবে যে পূর্ণভাবে ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলতে হবে। যখন তোমরা ব্যক্তিগত আসক্তি ত্যাগ করতে পারবে তখন এমন একটা তপস্যার পথে যেতে থাকবে তোমরা, যার উপর রয়েছে স্বয়ং খ্রীষ্টের ক্রুশ-চিহ্ন আঁকা।"

মাদার ক্যাব্রিনির পরহিতব্রতী সন্ন্যাসিনীরা তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অধ্যাত্ম চেতনায়

এতো বেশী আস্থা রাখতেন যে কোনো বিপদেই তাঁরা পিছিয়ে আসতেন না। তাঁরা মাদার ক্যাব্রিনির এই কথাটায় খুবই প্রেরণা পেতেন—“বিপদ-আপদ হল ছোট ছেলের খেলনা। অযথা কল্পনা করে তাদের বড় করে দেখা হয়।” এরই ফলে নিউ অর্লিয়েনের প্রতিষ্ঠানটি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেই দশ বছর ধরে চালিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের কলম্বাস হাসপাতালটি বছরের পর বছর শতশত রোগীর পরিচর্যা করেছে, কিন্তু সেটা স্থাপিত হয়েছিল মাত্র আড়াই শো ডলার হাতে নিয়ে। কলরাডোর ডেনভার শহরে পৌছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যে সেবাব্রতী সন্ন্যাসিনীরা একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পেরেছিলেন; আর সেখানকার বিদ্যালয়টির দ্বারোদ্‌ঘাটনের দিনই দুশোজন বালক-বালিকা উপস্থিত হল ভর্তি হওয়ার জন্যে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এইসব বালক-বালিকার পিতাদেরও বাদ দেওয়া হল না। মাদার ক্যাব্রিনি তাঁর সেবাব্রতী কর্মীদের নিয়ে দিনের পর দিন গভীর খনির মধ্যে নেমে গিয়ে ঐসব হতভাগ্য কর্মীদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন। শিকাগো ও ফিলাডেলফিয়ায় হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। সিয়াটেল-এ একটি অনাথাশ্রম এবং ছোট একটি প্রার্থনালয় স্থাপিত হল। লস এঞ্জেলেসে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হল। দরিদ্র-আবাসের বাসিন্দা এবং কারাগারে বন্দী ইটালীয়দের নিয়মিত দেখাশোনা করা হতে লাগল। এইভাবে একের পর এক কাজের মালা ঘুরে ঘুরে চলতে লাগল। ১৯১৭ খৃীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যুর আগে মাদার ক্যাব্রিনি সাতষট্টিটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পেরেছিলেন। ১৯৩১ খৃীষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা হল আশিটি। তার দুটি স্থাপিত হয়েছিল চীন দেশে, যেখানে মাদার ক্যাব্রিনি কাজ করবেন বলে বরাবর ইচ্ছা প্রকাশ করে এসেছিলেন। ১৯৫৪ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে সারা পৃথিবীতে একশটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। মাদার ক্যাব্রিনির জীবনে তিনটি অলোক-সামান্য গুণের সমাবেশ ঘটেছিল—সারল্য, দীনতাবোধ এবং ঈশ্বরানুগত্য। তাঁর অন্তহীন কর্মের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও তিনি সর্বদা স্থির ও শান্তভাবে থেকে মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা বলে যেতেন বলে শোনা যায়। এই যে সহস্র রকম সাংসারিক দুশ্চিন্তার মধ্যেও সর্বদা আত্মসমাহিতভাবে থাকা, এটা তাঁর “নিরন্তর ঈশ্বরাশ্রিত থাকারই” বহিঃপ্রকাশ। এবং যে-কেউই এটা তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারত। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে তার অধ্যাত্ম সম্পর্কের বিষয়ে এতো কম জানা যায় যে এটা তাঁর মতো ক্যাথলিক ধর্ম-স্বাধিকার ক্ষেত্রে একটা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলেই পরিগণিত হয়। একখানি দিনলিপির কিছুটা অংশ এবং কয়েকখানি চিঠি ছাড়া তিনি এ-

ব্যাপারে অন্য কিছুই লিখে যান নি। তাঁর পাঠাগারে ছিল কেবল "দি ইমিটেশান অব ক্রাইস্ট", সেণ্ট ইগনাসিয়াস রচিত 'এক্সারসাইজেস', এবং ফাদার পিনামণ্ট, আলফনসাস রড্রিগুয়েজ নামে জনৈক যেসুইট লেখক ও সেণ্ট আলফনসাস লিগুয়রির রচিত গ্রন্থাবলী। তিনি নিজে কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। দুরূহ ধর্মতত্ত্বের অবতারণা করে তিনি তাঁর কর্মী-সন্ন্যাসিনীদের ধাঁধায় ফেলতেও চাইতেন না। সেজন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠানে তিনি সরল উপাসনা পদ্ধতিই প্রচলিত করেছিলেন। সেখানে ব্যক্তিগত ধ্যান-সাধনা ছাড়াও অনেক সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। এই সেবাব্রতী সন্ন্যাসিনীরা বাহিরের জগতে কঠিন কর্মসাধনার জন্যে সুপরিচিতা হলেও, প্রতিষ্ঠান-গত জীবনে তাঁদের অন্তত ছটি ঘণ্টা উপাসনা ও ধ্যান-সাধনায় ব্যয় করতে হত। মাদার ক্যাব্রিনির মত ছিল এই যে, বাহিরের কাজকর্ম কখনোই যেন আত্মার পরমাকাঙ্ক্ষার পথে বিঘ্ন না ঘটায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সব কিছুই আত্মবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হ'য়েছিলেন বলে মাদার ক্যাব্রিনির ভিতর একটা স্থিরতা ও শান্তির ভাব বিরাজ করত। এবং তারই ফলে তিনি ঈশ্বরে সমাহিত থাকতে পারতেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান কাজের চাপের মধ্যে এভাবে থাকা বিস্ময়ের ব্যাপার সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে তিনি নির্জন বাসে যেতেন। কিন্তু অচিরেই পূর্ণ উদ্যম সংগ্রহ করে তিনি আবার তাঁর বহুধা পরিব্যাপ্ত কর্মের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ফিরে আসতেন। ক্রমেই অবশ্য তাঁর এমন বাসনা হচ্ছিল যে তিনি স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণ ক'রে পূর্ণ সময়ের জন্যে উপাসনা ও ধ্যানসাধনায় আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু এই বাসনা তাঁর কোনো দিনও পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর একজন কর্মীর সঙ্গে কথোপকথনের সময়ে তিনি বলেছিলেন, "আমি যদি আমার মনের বাসনা মতো কাজ করতে পারতাম তাহলে আমি ওয়েস্ট পার্কে[১] চলে যেতাম। সেখানে সমস্ত রকম ঝামেলার বাইরে থেকে 'প্রতিষ্ঠানে'র জন্যে অনেক কিছু ভালো কাজ করতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমি দেখেছি যে, আপাতত ঈশ্বর আমার কাছে এ কাজ চান না, আমি তাই নির্জনের ডাক ভুলে থাকি এবং 'প্রতিষ্ঠানে'র কাজ কর্মে আত্মনিয়োগ করি। এইভাবেই আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় পালন করি। পথ চলতে, ট্রেনে যেতে, জাহাজে উঠে, সব জায়গাতেই আমার মনে হয় যেন আমি আমার নির্জন-বাসের মধ্যেই ধ্যানে ডুবে আছি।" মাদার ক্যাব্রিনির একটা মাত্র লক্ষ্য ছিল যে, তিনি সমস্ত

---

১ আপার নিউইয়র্ক স্টেটে "সেক্রেড হার্ট" সম্প্রদায়ভুক্ত সেবাব্রতী সন্ন্যাসিনীদের প্রতিষ্ঠিত এক মঠ।

মানুষকে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেম ও সেবার বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন। এই কাজেই সারা জীবন কেটে গিয়েছিল তাঁর। তিনি সর্বদা কী চিন্তা করতেন তা দিন-লিপির ধাঁচে লেখা এই চিঠি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়—"আমাদের সর্বসময়ের অস্ত্র হল প্রার্থনা, আত্ম-বিশ্বাস এবং ঈশ্বর নির্ভরতা। আমরা একেবারেই অকেজো।......কিন্তু তাঁকে আশ্রয় ক'রে তাঁরই শক্তিতে আমি সব কিছুই করতে পারি।"

প্রথম বয়স থেকে মাদার ক্যাব্রিনি তাঁর অন্তর্জীবনকে অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে রেখে-ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধির কথা তিনি একেবারে ঢেকে রাখতে পারেন নি। প্রার্থনার সময় কখনো কখনো কর্মীরা লক্ষ্য করেছেন তিনি এমন একটা ভাবাবেশের অবস্থায় চলে যেতেন যা ইন্দ্রিয়-চেতনার অতীত। তাঁর সহকর্মিনীরা তাঁর বিষয়ে অন্যান্য কয়েকটি অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং দৈব-ঘটনার কথাও বিবৃত করেছেন। লণ্ডনে উপস্থিত হ'য়ে মাদার ক্যাব্রিনি এক দৈব-দর্শনে কুমারী মেরীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। এই উপলব্ধির বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমি তখন পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিতা পবিত্র জননীকে দেখতে পেলাম। তাঁর কোলের উপর বসেছিলেন শিশু যীশু। যীশুর হাত আমাদের বরাভয় দেওয়ার মতো করে সামনে প্রসারিত ছিল।" অনবরত দেশ ভ্রমণ করতেন বলে মাদার ক্যাব্রিনি একজন কোনো ব্যক্তিকে অধ্যাত্ম গুরু বলে অনু-সরণ করতে পারেন নি। ফলে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনুধ্যান ক'রে তাঁরই উপর সব কিছুর ভার সমর্পণ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "আত্মা একথা অনুভব করতে পারে যে তার সত্তার বাইরে পরম দয়িতকে অন্যত্র অনুসন্ধান করার কোনো দরকার নেই, তাঁকে আত্মার নিজের ভিতরেই পাওয়া সম্ভব, আর তখন আত্মাই হ'য়ে ওঠে তাঁর সিংহাসন ও মন্দির।" মাদার ক্যাব্রিনি ছিলেন এমন একজন অধ্যাত্ম-যোগী, যিনি ভক্তি ও কর্মযোগকেই করেছিলেন তাঁর মুক্তির উপায় স্বরূপ। অধ্যাত্মবাদ বস্তুটি ছিল তাঁর কাছে এমন একটি ব্যাপার যা "স্বাস্থ্যবান, বলশালী, দৃঢ় এবং পৌরুষ-মণ্ডিত" হ'তে বাধ্য। এই কথাগুলি তাঁর নিজের জীবনে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য সন্ন্যাসিনীদের জীবনে সত্য হ'য়ে উঠেছিল। ভণ্ড ধার্মিকতা, অভিযোগপ্রবণতা ও নৈরাশ্যকে এড়িয়ে চলতে হবে। জপের মালা যখন প্রকৃত কাজে ব্যবহৃত না হয়, তখন তাকে সরিয়ে রাখাই ভালো।

মাদার ক্যাব্রিনি তাঁর অন্তর্জীবনের ফলেই এতো প্রবল কর্মশক্তি লাভ করে-ছিলেন। মতামত সম্বলিত একটি ছোট নোট বইয়ে তিনি লিখেছিলেন, "যতো

ভালো আর যতো পুণ্যময়ই হোক, নিছক বাহিরের কাজে যদি আমি আত্ম-নিয়োগ করতাম তাহলে আমি দুর্বল এবং আশাহীন হ'য়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতাম। আর তেমনি ফল হত, যদি আমি আমার প্রিয়তম যীশুর অন্তরের মধ্যে না ঘুমাতাম এবং প্রার্থনা না করতাম হে যীশু, আমাকে এই অতীন্দ্রিয় নিদ্রার প্লাবনের মধ্যে আবৃত করে রাখো," মানুষ হিসাবে তিনি যা করেছিলেন তা যদিও অসাধ্যসাধনের পর্যায়ে পড়ে, তবু তিনি সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছিলেন—কারণ তাঁর মন পড়ে ছিল অন্যত্র। তিনি লিখেছেন, "যীশুর পবিত্র আবেগ আমাকে এতো প্রবলভাবে অনুসরণ ক'রে যে আমি তাকে ঠেকাতে পারি না।.....যাই ঘটুক না কেন, আমি চোখ বুজে থাকব এবং যীশুর হৃদয় থেকে মাথা তুলব না।" একটি চিঠিতে তিনি তাঁর কর্মী-সন্ন্যাসিনীদের লিখেছিলেন, "ক্রুশ কাঠই হবে আমার ধর্মগ্রন্থ। এইটিকে আমি সর্বদা চোখের সামনে রেখে শিখব, কী ক'রে ভালোবাসতে হয় এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। যে সেবাব্রতী সন্ন্যাসিনী যন্ত্রণা সহ্য করতে চান না, তিনি এ কাজ থেকে সরে গেলেই ভালো হবে। যে কেউ "সেক্রেড হার্টে"র নাম নিয়ে কাজ করবে, তাকেই যীশুর হৃদয়ের চারিদিকে কণ্টকের প্রবলতা লক্ষ্য ক'রে যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। কতো সুন্দর এই কাজ—যীশুর জন্যে কষ্ট পাওয়া, যীশুর সঙ্গে কষ্ট পাওয়া, এবং যীশুর জন্যে কষ্ট পেয়ে পবিত্র প্রেমের আগুনে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলা।" এই মহীয়সী নারী যিনি দেশে দেশে সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতির বিষয়ে অজস্র প্রতিষ্ঠানের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, অন্তরের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের এক সরলপ্রাণা ভক্ত এবং সেবাদাসী। তাঁর নোট বইয়ে তিনি সরাসরি যীশুকে লিখেছেন, "যে মুহূর্ত থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হল, তখনই তোমার সৌন্দর্যে আমি এতো মুগ্ধ হ'য়ে পড়লাম যে তোমাকেই অনুসরণ করতে লাগলাম। যতোই আমি তোমাকে ভালোবাসি, ততোই যেন আমার মনে হতে থাকে তোমাকে যেন আমি কম ভালোবাসছি—কারণ তোমাকে আরো বেশী করে ভালোবাসতে চাই আমি। এ আমি আর সইতে পারছি না। উন্মুক্ত করো আমার হৃদয়কে, আরো উন্মুক্ত করো তুমি।.....যীশু, হে আমার প্রেমময় যীশু, তোমার এই অসহায় বেচারী নারীকে, তোমার এই ছোট্ট বধূকে সাহায্য করো, তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চল।.....আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমাকে অত্যন্ত, অত্যন্তই ভালোবাসি।"

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর ফ্রান্সেস জাভিয়ার ক্যাব্রিনি শিকাগো শহরে তাঁরই একদা প্রতিষ্ঠিত কলম্বাস হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর

মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর সম্বন্ধে ধর্মমূলক অনুসন্ধান শুরু হয়। দু বছর পরে শুরু হল রোমের গির্জার নির্দেশে "ঈশ্বরের সেবিকার" পুণ্য মাহাত্ম্যের বিষয়ে আইনসঙ্গত অনুসন্ধান। পোপের আগ্রহে তাঁর দ্বারাই আরম্ভ হল এই অনুসন্ধান। পূর্ববর্তী একটা বিধানে লিপিবদ্ধ ছিল যে পুণ্যাত্মা ব্যক্তির পর পঞ্চাশ বছর না অতিবাহিত হলে অনুসন্ধান কর্ম শুরু করা যাবে না। পোপ এই বিধান বর্তমান ক্ষেত্রে শিথিল করার আদেশ দিলেন। বর্তমান কালের ইতিহাসে এটা এমন একটা অসাধারণ ঘটনা যে এর দ্বিতীয় আর কোনো নজির নেই। অত্যন্ত বিশদভাবে তদন্ত ক'রে দেখা হল। তাতে সরকারীভাবে দুটি প্রকৃত দৈব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সংবাদও সমর্থিত হল। ফলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর মাদার ক্যাব্রিনিকে "পুণ্যাত্মা" বলে ঘোষণা করা হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তিনিই প্রথম পোপের দ্বারা স্বর্গরাজ্যের "পুণ্যাত্মা" অধিবাসী বলে স্বীকৃত হলেন। আট বছর পরে স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা তাঁকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-পাত্রী বলে স্বীকার ক'রে নেওয়া হল।

উপাধি-অলংকরণের উৎসবে রোমের ভ্যাটিকানে ধর্মযাজকের মহা প্রার্থনা সঙ্গীত গাইলেন কার্ডিনাল মুণ্ডেলাইন। একুশ বৎসর আগে ইনিই শিকাগো শহরে মাদার ক্যাব্রিনির শেষকৃত্যের সময় প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়েছিলেন। গির্জা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এমন ঘটনা অদ্বিতীয় যে, একই কার্ডিনাল কারো শেষ-কৃত্য এবং উপাধি অলঙ্করণের উৎসব পরিচালনা করেছেন। অলংকরণ-উৎসবে এক বেতার ভাষণে কার্ডিনাল বলেছিলেন, "আমরা যখন চিন্তা করি এই ক্ষীণকায়া নারী সামান্য কুড়ি বৎসরের মধ্যে "সেক্রেড হার্ট অব যেসাসের" পতাকাতলে চার হাজার নারীর একটি বাহিনী তৈরী করেছিলেন, যখন চিন্তা করি যে তিনি প্রাচীনকালের ক্রুসেড্-যোদ্ধাদের উদ্দীপনা হৃদয়ে নিয়ে দারিদ্র্য ও আত্মোৎসর্গের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন, যখন চিন্তা করি, তাঁর সেই সর্বমানবের প্রতি জ্বলন্ত প্রেমের জন্যে তিনি বারবার সমুদ্র পার হ'য়ে কতো অজানা দেশে গিয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সকলকে কথায় ও দৃষ্টান্তে সৎ ও শান্তিপ্রিয় খ্রীষ্টান হ'তে উৎসাহিত করেছিলেন, যখন আমরা চিন্তা করি, কীভাবে তিনি গরীবের বন্ধু হতেন, অজ্ঞব্যক্তিদের পরামর্শ দিতেন, রোগীর পরিচর্যা করতেন—আর সমস্ত কিছুই করতেন ইহজগতে কোনো পুরস্কার বা ক্ষতিপূরণের আশা না রেখেই, তখন বলুন—এসব কি 'ক্যাথলিক কর্মবাদে'র উচ্চ আদর্শকে সম্পূর্ণরূপেই পালন করে না, আর এ কর্ম যিনি সম্পাদন করেছেন তাঁকে কি আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজিকা বলে গ্রহণ করা উচিত নয় ?"

ধর্মসাধিকা ফ্রান্সেস জাভিয়ার ক্যাব্রিনি তাঁর জীবনে এমন এক শক্তির অধি-কারিণী হ'য়েছিলেন, যা তাঁর সমস্ত কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করত। এই শক্তির দ্বারা তাঁর কর্মে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদেরও জীবদ্দশায় সৎপথে টেনে নিতে পেরেছেন —প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যায় মানুষ এই শক্তির প্রভাবেই সৎপথে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করে। মানবতার কাছে তাঁর একমাত্র বাণী হল একটি প্রার্থনার সুর, যা তাঁর ঈশ্বরাশ্রিত দৈনন্দিন কর্মজীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠেছিল।

চতুর্থ খণ্ড

ইহুদী ও সূফীধর্মের ধর্মসাধিকাগণ

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌

হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌ ছিলেন প্যালেস্টাইনের হাসপাতাল ও সমাজসেবা সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সংগঠিকা। ইয়ুথ আলিয়া নামে যে প্রতিষ্ঠান নাৎসী বর্বরতা থেকে বহু অনাথ শিশুকে উদ্ধার করেছিল, তিনি ছিলেন তারও সংগঠিকা ও পরিচালিকা। তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের দ্বারা তিনি ইহুদী ধারণা-মতো ধর্মসাধিকার পক্ষে যা যা করণীয়, সবই উদ্‌যাপিত করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর এবং তাঁর স্বজাতিকে তিনি নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। মানুষের সেবার জন্যেই তিনি তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মেরিল্যান্ড অঞ্চলের বাল্‌টিমোর নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তাঁর পিতার নাম ছিল বেন্‌-জামিন জোল্‌ড্‌। বাল্‌টিমোর শহরের ইহুদী সম্প্রদায়ের পুরোহিত ছিলেন তিনি। হেনরিয়াটার মাতার নাম ছিল সোফিয়া। পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন হেনরিয়াটা। তাঁদের কাছ থেকেই তিনি ঈশ্বরপ্রেম ও মানবসেবার প্রেরণা পেয়েছিলেন, আর এই দুই গুণই হয়েছিল তাঁর সারা জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান অবলম্বন। বেনজামিন জোল্‌ড্‌ ছিলেন হাঙ্গেরী দেশের অধিবাসী। হেনরিয়াটার জন্মের এক বছর আগে তিনি তাঁর তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে আমেরিকায় চলে আসেন। তাঁদের কোনো পুত্র ছিল না বলে পুরোহিত জোল্‌ড্‌ সেকালে পরিবারের পুত্রকে যেমনভাবে শিক্ষিত করে তোলা হত সেইভাবেই তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে শিক্ষিত করে তোলেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় হেনরিয়াটা কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারপর তিনি শিক্ষিকা এবং লেখিকার বৃত্তি গ্রহণ করেন, কারণ পুরোহিত পিতা তাঁর সামান্য দক্ষিণা দিয়ে পাঁচটি কন্যার ভরণ-পোষণ চালিয়ে উঠতে পারতেন না। এইভাবে হেনরিয়াটা চৌদ্দ বৎসর ধরে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ করেন। সে সময়ে তিনি একই সঙ্গে আরো অনেক রকমই কাজ করেছিলেন।

যখন তাঁর কুড়ি বছর পূর্ণ হয়নি সেই সময়েই তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে একবার ইউরোপ ভ্রমণে এসেছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁর মনে গভীরভাবে ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। প্রাগ শহরে ইহুদীদের মহান ও করুণ পূর্ব ইতিহাস এবং জার্মানদের একটি অবরোধ স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখে তিনি অত্যন্তই বিচলিত

হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে জাগ্রত হল "নিজের লোকে'র সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। এই ভ্রমণের ফলে বাল্টিমোর শহরে নিজের সম্প্রদায়ের লোকেদের দোষগুলির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে তিনি কিছুটা অস্থিরতা বোধ করেছিলেন। তাদের অধার্মিকতা এবং প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের রীতিনীতি অনুকরণের আগ্রহ খুবই নিন্দার্হ বলে মনে হল হেনরিয়াটার।

তিনি আমেরিকায় ফিরে আসার পর দলে দলে ইহুদী সম্প্রদায়ের লোক আমেরিকায় আশ্রয়প্রার্থী হ'য়ে আসতে লাগলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে "মে আইন"-এর ফলে হাজার হাজার ইহুদী রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। অনেকে মিত্রভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শরণ গ্রহণ করলেন, কেউ কেউ আমেরিকায় পাড়ি জমাতে শুরু করলেন। এ'দের মধ্যে যাঁরা বালটিমোরে এলেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়; এবং এ'দের অপরিচিত রীতিনীতি ও ভাষার ফলে এ'রা যে খুব সাদর অভ্যর্থনা পেলেন এমন নয়। পুরোহিত প্রবর এবং তাঁর কন্যা হেনরিয়াটা প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থীর অসুবিধার কথা সহানুভূতির সঙ্গে শুনতেন; নতুন সমাজ এবং নতুন পরিবেশে যাতে তারা স্থিতি লাভ করতে পারেন সেজন্যেও যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন। হেনরিয়াটা প্রথমে মন দিলেন যাতে তাঁরা "মার্কিনী" হতে পারেন। তিনি একটি দোকানের উপর একখানি ঘর নিয়ে সেখানে নৈশ বিদ্যালয় খুললেন। চার বছর পরে যখন বালটিমোরের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ হেনরিয়াটার এই "রুশ-বিদ্যালয়ে"র ভার গ্রহণ করলেন তখন তার ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল এসে পাঁচ হাজারে।

এইসব ধিক্কৃত রুশ-শরণার্থীর বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে হেনরিয়াটা ইহুদীদের ইতিহাসকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হলেন। কেবল যে জারের সরকারই ইহুদীদের অধঃপতিত করতে চেয়েছিলেন তা নয়, অত্যাচার এবং অসহিষ্ণুতা কমবেশী সর্বত্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। শুধু যদি তাঁদের একটি মাতৃভূমি থাকত, তবে তাঁদের প্রাচীন গরিমা ফিরে আসত। এইভাবে ডাক্তার থিয়োডোর হার্জের আগেই হেনরিয়াটা ইস্রায়েলদের নিজেদের স্বভূমিতে ফেরার জন্যে পথ প্রস্তুত করছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন, "আমি জিওন-বাদ গ্রহণ করলাম তখনই, যে মুহূর্তে আমি উপলব্ধি করলাম যে, কেবলমাত্র এর দ্বারাই আমার আহত, ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত জাতি, আমার উদ্‌ভ্রান্ত জাতি একটি আদর্শ ফিরে পাবে—সে আদর্শ অন্যদেরই চাপিয়ে দেওয়া—আর সে হল এমন একটি আদর্শ যা অন্যান্য ইহুদী-সমস্যার বিষয়ে কী মনোভাব তার কথা বাদ দিয়ে সকলে মেনে নিতে পারে।"

তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করে "য়ুইশ পাব্লিকেশান সোসাইটি অব আমেরিকা"র ফিলাডেলফিয়া-স্থিত কর্মকেন্দ্রে সাহিত্য-সচিব পদে যোগদান করলেন। এই পদে তিনি তেইশ বৎসরকাল কাজ করেছিলেন। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের পক্ষে যোগ্য হ'য়ে ওঠার জন্যে তিনি "য়ুইশ থিওলজিক্যাল সেমিনারী অব আমেরিকা"-তে পড়াশোনা করতেন। এই প্রতিষ্ঠান এর আগে কখনো কোনো নারীকে প্রবেশাধিকার দেয়নি। "একজন মহিলা 'টালামুড' পাঠ করেছেন" এটা ছিল একেবারেই আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু সেখানকার বহু ছাত্র হেনরিয়াটার মধ্যে খুঁজে পেলেন একজন সহানুভূতিশীল শ্রোতা এবং সৎপরামর্শদাতা। তিনি "য়ুইশ এন্সাইক্লোপিডিয়া" এবং অন্যান্য বিদগ্ধ পত্র-পত্রিকার জন্যে প্রবন্ধাদি লিখতে লাগলেন। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তাঁকে দুটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে সাগ্রহে আমন্ত্রণ জানানো হ'য়েছিল।

দৈনিক তিনি চৌদ্দ ঘণ্টা থেকে ষোল ঘণ্টা ক'রে কাজ করতেন। এইভাবে কাজ ক'রে তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন, এবং তখন তাঁকে বিশ্রাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু সেরে উঠতে তাঁর খুবই দেরি হতে লাগল। তখন ঐ "পাব্লিকেশান সোসাইটি" তাঁর কাজের গুণগ্রাহিতা প্রদর্শন ক'রে একটি সমুদ্রযাত্রার ব্যয় বহন করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে হেনরিয়াটা বহু মাস ধরে ইউরোপ ও প্যালেস্টাইনে ভ্রমণ করেছিলেন। বহুকাল ধ'রেই তাঁর মনে তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রাচীন মাতৃভূমি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এতোদিনে সেটা সফল হল, তিনি সত্যিই এলেন সেই দেশের মাটিতে। তখন তিনি কল্পনাও করেন নি, এইখানেই তাঁর জীবনের মহত্তম কর্ম সম্পাদিত হবে এবং ইস্রায়েলের ক্রম অভ্যুদয় এবং পুনর্জন্মের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় লিখিত হবে।

হেনরিয়াটা যখন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনে এসেছিলেন তখন সে দেশ ছিল সভ্যজগতের কাছে একেবারে 'পাণ্ডববর্জিত' অবস্থায়। দেশটি ছিল তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অধীন, এবং একজন স্বৈরাচারী সুলতান ছিলেন এর প্রভু। তাঁর রাজকর্মচারীরা ছিলেন যেমন দুর্নীতিপরায়ণ, তেমনি উদাসীন। তাঁরা বিপুল করভার এবং উৎকোচ গ্রহণ করে রাজভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলতেন। দেশের মাটি ছিল নিষ্ফলা ও বন্ধ্যা। এর অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, কোনো আশা-ভরসাই আর তাদের জন্যে অবশিষ্ট ছিল না। যেসব ইহুদী পরিবার প্রথম সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়েছিল তাদের যে কেবল নির্মম নিষ্ঠুর মাটির সঙ্গেই লড়তে হ'য়েছিল তা নয়, প্লেগ এবং অন্যান্য মহামারীর সঙ্গেও যুঝতে

হ'য়েছিল। বিশেষ করে শিশুদের যে দুর্দশা ছিল তা দেখে হেনরিয়াটার হৃদয়-তন্ত্রী যেন মুচড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিল। টাইবেরিয়াস শহর একদা ছিল রোমান প্রদেশপালদের আবাসস্থল। একদিন এই শহরের বালিঢাকা পথে চলতে চলতে হেনরিয়াটা এবং তাঁর মাতা প্রথম দেখতে পেলেন সেই নোংরা অস্থিসার শিশুদের, যাদের শূন্য কালো চোখে ছিল ব্যাধির সংকেত। জন্মগত অন্ধতা এবং উপদংশ-জনিত অন্ধতার প্রাবল্য ছিল অত্যন্তই বেশী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ছিল শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। শিশু মৃত্যুর হার ছিল অত্যন্তই বেশী।

হেনরিয়াটার বয়স তখন উনপঞ্চাশ বছর। তিনি স্থির করলেন, সারা প্যালেস্টাইনের ইহুদী আরব নির্বিশেষে সকলের জন্যে তিনি স্বাস্থ্য ও সমাজ-মঙ্গলের সেবাকর্মের জন্যে একটি আন্দোলন শুরু করবেন। তিনি বললেন, "এটা যদি একটা বিদ্যালয়েও চালু করা যায়, তবে সব জায়গাতেই করা যাবে।"

তিনি জানতেন, কাজটা খুব সহজ ছিল না। নিউ ইয়র্কে ফিরে আসার পর তাঁর স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হয়ে উঠল। তখন তিনি তাঁর নতুন কর্মে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আর, বাকী জীবনে তিনি এই কাজেই আত্মদান করেছিলেন।

এই সময়ে নিউ ইয়র্ক শহরে একদল জিওন-বাদী নারী ছিলেন, যাঁরা "কুইন এস্‌থার" নামে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ হ'য়েছিলেন। জিওন-বাদী কর্ম-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য, যদিও এঁদের প্রধান কাজ ছিল মোটামুটি একটা সাহিত্যসংঘের অনুরূপ। এই দলের কাছেই হেনরিয়াটা তাঁর সেবাব্রতী উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি নিজে কী স্বচক্ষে দেখেছেন তার বিবরণ এতো হৃদয়স্পর্শী হ'য়েছিল যে তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাঁকে সমর্থন জানাতে স্বীকৃত হলেন। অন্যান্য দলও ক্রমে এই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন তার নাম হল 'হাডাসা'। এটা হল হিব্রুভাষায় 'মার্টল' নামে এক চিরহরিৎ লতার প্রতিশব্দ। বাইবেলে 'এসথার' বলতে একেই বোঝানো হ'য়েছে। তারপর শুরু হল হেনরিয়াটার অর্থ-সংগ্রহের কাজ। পঞ্চাশ-বৎসর বয়স্কা একজন মহিলার পক্ষে সেটা খুব সহজ কাজ ছিল না। এর জন্যে তাঁকে আমেরিকার সমস্ত অঞ্চলেই যাতায়াত করতে হ'য়েছিল। তাঁর জনসমাবেশগুলিতে সামান্য বা বেশী যাই লোক আসত সেখানেই তিনি ভাষণ দিতেন। তাঁর বক্তৃতার ধরন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং বিষয়ানুগ—ঠিক কলেজের অধ্যাপকের মতো। তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন না, কিন্তু যা তিনি বলতেন তাতে মনে প্রভাব বিস্তার করত। এবং তাঁর আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবি দেখিয়ে সমস্ত বিষয়টা অত্যন্ত জীবন্ত করে তুলতেন।

প্যালেস্টাইন থেকে তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে অজস্র আবেদন আসতে লাগল। অবশেষে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কয়েকজন শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্সকে সেখানে পাঠাতে সক্ষম হলেন। শ্রীমতী জোল্‌ড্‌ অবশ্য অর্থসংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজকে সুসংগঠিত করার জন্যে আমেরিকাতেই থেকে গেলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁর মাতা পরলোকগমন করলেন। অসুখের সময় হেনরিয়াটা মাতাকে সেবাশুশ্রূষা করতেন এবং শেষ-সময় পর্যন্তও তিনি তাঁর কাছে থেকে স্তোত্র পাঠ করেছিলেন। তখন হেনরিয়াটার নিজের বয়সও হ'য়েছিল প্রায় ষাট বৎসর। বয়ঃবৃদ্ধির ফলে তিনি নিজেও অশক্ত হ'য়ে উঠছিলেন। তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁকে কম পরিশ্রমের জীবন যাপন করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু মুখে যদিও হেনরিয়াটা তাঁদের কথা মেনে চলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন, কার্যকালে তিনি নিজের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের রূপায়ণেই কৃতসংকল্প রইলেন। সেই বৎসরই তিনি প্যালেস্টাইন যাত্রা করলেন। কয়েক-জন তাঁকে বিদায় দিতে এসে তাঁর সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হ'তে বাধ্য হলেন যে, তিনি একজন তরুণী নারীর উৎসাহ নিয়েই তাঁর বিস্ময়কর জীবনের তৃতীয় পর্বে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে মাত্র দু বৎসর থাকবেন বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু থাকলেন তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত, সাতাশ বৎসর ধরে! এই সুদীর্ঘ বৎসরগুলিতে দুটি বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে গেল। তিনি প্যালেস্টাইনে থেকে সেখানকার সামাজিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সেবাব্রতী আন্দোলন শুরু করে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে তুললেন। তিনি বিভিন্ন অত্যাচারী দেশ থেকে হাজার হাজার দরিদ্র, পরিত্যক্ত এবং অনাথ বালক-বালিকাকে এনে তাদের পুনর্বসতি এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হ'য়েছিল প্যালেস্টাইন অধিবাসীরা। এই সংকটকালেই হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌ প্যালেস্টাইনে এসেছিলেন। তাঁর সর্বপ্রথম কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল দারিদ্র্য ও ব্যাধির কবলে যারা পড়েছিল তাদের জন্যে খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। ইতিপূর্বে তিনি যে চিকিৎসক-দল গড়ে তুলেছিলেন তার ফলে যুদ্ধের সময়ে প্যালেস্টাইন এক মহামারীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তাঁরা বহু শিশু ও জননীকেও সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখন যে রকম প্রবল দাবী উঠতে লাগল তার প্রয়োজনমতো সাড়া দেওয়া প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠল।

আমেরিকা থেকে সাহায্যের স্রোত খুবই ক্ষীণগতি হ'য়ে এল। নতুন নতুন দাবি পূরণ করার দিক থেকে এই অর্থ অত্যন্তই সামান্য। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ

নাগাদ তাঁর অধীনে কাজ করছিলেন প্রায় চারশ চিকিৎসক ও নার্স। সঙ্গে ছিল বিরাট এক ঘাটতির অঙ্ক। যেসব প্যালেস্টাইনবাসিনী তরুণীদের হেনরিয়াটা নার্সের কাজে গ্রহণ করেছিলেন, তারা নার্সের পেশাগত নীতিবোধে মার্কিণী নার্সদের মতো অভ্যস্ত ছিল না; এবং কাজের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে তারা রোগীদের একলা ফেলে রেখে একযোগে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেত। হেনরিয়াটা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন তাদের সঙ্গে, এবং ক্রমে তাদের একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে রূপান্তরিত করলেন। তাঁর কাজটা অবশ্য খুব সহজ ছিল না, কারণ হিব্রু ভাষাতে নার্সিং শিক্ষার জন্যে কোনো পাঠ্য-পুস্তকই ছিল না।

ইতিমধ্যে জাফা-তে প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিনশ' করে শরণার্থী আসতে লাগল। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তারা অনেকে ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত হ'য়ে পড়ল। শ্রীমতী জোল্ড্ জানতেন যে, একটা সুনিশ্চিত আয়ের পথ থাকলে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা এবং প্রতিষেধনের ব্যবস্থা করে ব্যাধির প্রকোপটাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যেত, তবু নিজের মনে তাঁর যাই থাকুক কাজের মধ্যে তিনি হতাশার ছায়া পড়তে দিলেন না। তিনি সারা দেশটিতে পরিদর্শন-কাজ শুরু করে দিলেন। যাতায়াতের জন্যে অবশ্য তেমন রাস্তাঘাট ছিল না; কখনো কাঠের গাড়ী, কখনো বা গাধার পিঠে যাতায়াত করতে হত। তাঁর একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "এই কর্মীদল হল যুদ্ধের আওতায় বেড়ে-ওঠা এক নতুন পুরুষের মানুষ। তারা প্রায় এক আদিম অবস্থায় বাস ক'রে জীবনের প্রাথমিক এবং মৌলিক সমস্যা-গুলিকে আয়ত্তে আনার সাধনা করছে। আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে তাদের সঙ্গে কাজে যোগদান করি। অবশ্য তারা যেমন পাথর ভাঙতে পারে আমি তা পারি না। কিন্তু আমি হয়তো তাদের এমনভাবে সংগঠিত করতে পারি যাতে তাদের জীবনযাত্রা অনেকখানি সুস্থ হয়।" সংগঠন করা এবং অবস্থার উন্নতি ঘটানোই ছিল তাঁর চরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতা। যেখানেই তিনি গেছেন, সেখানেই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে প্রয়াসী হ'য়েছেন তিনি। দেশের অগ্রপথিক কর্মীদল, যারা তাদের প্রাচীন মাতৃভূমিকে পুনর্গঠিত করে তুলছিল, তাদের প্রতি হেনরিয়াটার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলেছেন, "আমার আশা 'চালুটজিনে'র মতোই চিরপ্রবাহিণী থাকবে। সেটা এমন এক স্রোতোধারা যা তার প্রবল গতি-বেগে ক্ষয়ক্ষতির সমস্ত জঞ্জালকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

শ্রীমতী জোল্ডের কর্মীসঙ্ঘের তহবিল তখনও প্রায় শূন্য অবস্থায় ছিল এবং যথেষ্ট ঋণ হ'য়ে গিয়েছিল। জিনিসপত্র কেনার দাম বা কর্মচারীদের মাইনে

দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠল। কিন্তু তবু তিনি কাজ চালিয়ে যাবেন বলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রইলেন। এই সময়ে নাথান স্ট্রাউসের কাছ থেকে কুড়ি হাজার ডলার পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি; তবে প্রয়োজনীয় টাকার তুলনায় এই টাকা বিশেষ কিছু নয়। তাঁর চিকিৎসক এবং নার্সগণ এ বিপদে তাঁকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এলেন। তাঁরা বেতনের জন্যে কোনোরকম চাপ দিলেন না। ফলে ঐ টাকা দিয়ে দোকানের ধার শোধ করে আবার ঔষধপত্র কিনতে পারলেন শ্রীমতী জোল্‌ড্‌।

ক্রমে এই দিকে কাজকর্ম অনেকটা স্থায়ী চেহারা নিল, কাজের চাপও কিছুটা কম হল। তখন হেনরিয়াটা আধুনিক প্যালেস্টাইনের গঠনকর্মের অন্যান্য দিকে নজর দেওয়ার সময় পেলেন। তিনি কয়েকবার প্যালেস্টাইন ও আমেরিকার মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলেন। তার ফলে হাসপাতালের কাজকর্মের অনেক উন্নতি হল। শিক্ষার দিকেও তিনি যত্ন নিতে লাগলেন। কেননা, শিক্ষা-ব্যবস্থাও চিকিৎসার মতো অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় ছিল প্যালেস্টাইনে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এসে অনেক অসুবিধা পোহাতে হ'য়েছিল তাঁকে।

তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় ঐক্যসাধন ক'রে, ব্যয়ের দিকে ভারসাম্য এনে বিদ্যালয়-গুলিতে আধুনিক যুগের প্রবর্তন করেন। সকলেই তাঁকে সম্মান করত এবং তাঁর ঐকান্তিকতা এবং নিঃস্বার্থপরতার জন্যে সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিলেন তিনি। বিদ্যালয় থেকে তিনি ছাত্রদের আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করে-ছিলেন। তাতে তারা দিনে অন্তত একবার করে সুখাদ্যের মুখ দেখতে পেত। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেরুজালেমে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলেন, এবং তেল-আবিবে প্রতিষ্ঠা করেন একটি আধুনিক হাসপাতাল। এইভাবে তিনি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা দুদিকেরই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আর দুটি কাজই বেশ ভালো ভাবে সম্পন্ন হতে লাগল।

হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌ দেশটির পুনরুদ্ধারের জন্যেও চেষ্টা করতে লাগলেন। "প্রধানত যদিও তিনি ছিলেন একজন লোকহিতৈষিণী নারী—মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির দিকেই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণ......তবু তিনি একথা ভুলতে পারেন নি যে, প্যালেস্টাইনে যা কাজ সেটা কেবল লোকহিতৈষণার জন্যেই দরকার নয়, দরকার হল দেশটিকে সুগঠিত ক'রে তোলার জন্যে—এই দেশটিকেই ক'রে তুলতে হবে ঈশ্বরের লীলাভূমি।" তিনি ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্যা হ'য়ে তাঁর এই নতুন কাজের জন্যে প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স হ'য়েছিল পঁচাত্তর বৎসর। ঐ বয়সে সাধারণত

লোকে প্রায় কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে। কিন্তু হেনরিয়াটা জোল্ড্ আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন। এই সময়টা ছিল নাৎসী অত্যাচারের যুগ। হিটলার তখন জার্মানীতে ইহুদীর উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেছে, যার ফলে ষাট লক্ষ নারী পুরুষ ও শিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশুদের যাতে প্যালেস্টাইনে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এইরকম পাঁচ হাজার শিশু প্যালে-স্টাইনে এল। হেনরিয়াটা তাদের "মাতার" স্থান গ্রহণ করলেন। তিনি আরো গভীর ভাবে ঘোষণা করলেন, "এরা হবে আমার সন্তান।"

প্রথম দল হাইফাতে এসে পৌঁছাল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। হেনরিয়াটা তাদের মধ্যে গিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। পিতামাতা ও অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছেদের ফলে যে বিয়োগ-ব্যথা ছিল তাদের মনে, তাও তিনি মোচন করার জন্যে সচেষ্ট হলেন। তিনি এমন সব পরিবারে তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন যেখানে গৃহপরিবেশ ছিল তাদের নিজের বাড়ীর অনুরূপ। এইভাবে কাজ এগিয়ে চলতে লাগল এবং ক্রমেই বেশী বেশী ছেলেমেয়ে এসে পৌঁছাতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে নাৎসী অত্যাচারের কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। হেনরিয়াটা যাতে তাঁর এই পরম দয়াধর্মের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সেজন্যে চারিদিক থেকেই সাহায্য আসতে লাগল। ইহুদী সম্প্রদায়ের চরম বিশৃংখলা এবং অত্যন্ত করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি, করুণাময় ঈশ্বর যতো ক্ষমতা তাঁকে দিয়েছেন সব কিছু নিয়োজিত ক'রে যাতে নিষ্পাপ শিশুদের অন্তত রক্ষা করা যায় তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে সারা পৃথিবী থেকে ষাট হাজারের বেশী ছেলেমেয়েকে তিনি নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করলেন। তাদের শিক্ষা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, প্রয়োজনীয় ব্যবসা বা বৃত্তিশিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। অবশ্য একা তাঁর পক্ষে এ বৃহৎ কাজ সমাধা করা ছিল এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে একদল নরনারীকে টেনে এনে এই দুরূহ কর্তব্য পালন করার জন্যে তাঁদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন। "তিনি তাঁদের মনে মানুষ ও ঈশ্বরের বিষয়ে এক নতুন বিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিলেন।"

তাঁর জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত হেনরিয়াটা জোল্ড্ তাঁর এই সন্তানদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতেন, তাদের নতুন গৃহে গিয়ে সদুপদেশ দিতেন। রাত্রি-

বেলা তিনি তাদের খাটের পাশে মায়ের মতোই বসে থাকতেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে তাদের নালিশের কথা শুনতেন, ছড়া শেখাতেন। তিনি ছোটদের জন্যে কতকগুলি গ্রাম স্থাপন ক'রে তাদের পশম রঙ করা, সুতো কাটা এবং তাঁতের কাজ শিক্ষা দিতেন। তিনি ষাট হাজার সন্তানের জননী হ'য়ে প্রায় কিংবদন্তীর মতো হ'য়ে উঠলেন।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাউণ্ট স্কোবানের উপর "হাডাশা ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্টোরে"র দ্বারোদ্‌ঘাটন দেখে কতোই না আনন্দিত হ'য়েছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে এটা হল বৃহত্তম চিকিৎসা ও গবেষণা-কেন্দ্রগুলির অন্যতম। ঐ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয় ৩৫০জন নার্সের শিক্ষার উপযুক্ত "নার্সেস স্কুল"—এই বিদ্যালয়টির নাম রাখা হ'য়েছিল তাঁর নামে। প্রসূতি এবং শিশুমঙ্গলের জন্যে পঞ্চাশটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল এর আগেই। তাঁর জীবদ্দশাতেই তিনি দেখে গেছেন যে, তিনি যেসব নার্সকে বাড়ীর বাইরে এনে ব্যক্তিগত ভাবে সেবা-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়জন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মানুষেরই বর্বর আঘাতে মরণাপন্ন অন্য মানুষদের সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি যাতে মানুষকে সেবা করতে পারেন, সেজন্যে ঈশ্বর তাঁকে কতো সুযোগই না ক'রে দিয়েছিলেন। "আমি সুখী মানুষ।"—এই ছিল হেনরিয়াটার শেষ কথা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "যারা ভালো করতে চায় তারা দরজায় ধাক্কা দেয়, কিন্তু যারা ভালোবাসে তারা দরজাটা খোলাই পায়।"

হেনরিয়াটা জোল্ড্ ভালো করতে অত্যন্তই ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর জীবনের ষাটটি বৎসর উৎসর্গ করেছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা মানুষেরই সেবার জন্যে। তিনি কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অমানুষিকতা, ব্যাধি এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। যে নারী হ'য়ে তিনি জন্মেছিলেন, সেই নারীজাতির বিরুদ্ধে কুসংস্কারের জন্যে তাঁকে কম সংগ্রাম করতে হয়নি। কিন্তু তিনি জয়লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন—

> যারা যায় চিরকাল বেদনার পথের পথিক,—
> যেখানে আতঙ্ক, ভয়, রক্তপাত, মৃত্যুর অধিক।
> মহত্তর সাধনায় তবু তারা লক্ষ্য রাখে ঠিক।
> মানে না পথের বাধা, জীবনের সব অন্ধকার
> পিছে ফেলে বাঁচে তারা—মানুষের উন্নত শিখর।......

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী চুরাশি বৎসর বয়সে তিনি আজীবন

কর্মের ফলে অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অধিকারিণী হ'য়ে পরলোক গমন করেন।

ইহুদী ধর্মে সাধুসন্তের স্থান নেই। যদি তা থাকত, তবে নিশ্চয়ই হেনরিয়াটা জোল্‌ড্‌ একজন 'ইহুদী ধর্মসাধিকা' হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করতেন। মৃত্যু অবশ্যই এসেছিল তাঁর শিয়রে, কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। পরপার থেকেও তাঁর বাণী শোনা যায়। তাঁর স্মৃতি মানুষের কাছে এক পরম আশীর্বাদ ও প্রেরণার উৎসস্থল হয়ে আছে। তাঁর কাজ অবিচ্ছিন্নভাবেই এগিয়ে চলেছে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

রাবি'আ

রাবি'আর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

রাবি'আ ছিলেন 'আদী' উপজাতির কন্যা। সেজন্যে তাঁর পুরো নাম ছিল রাবি'আ অল্-'আদইয়া। তিনি ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বসরায় (ইরাকে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি রাবি'আ অল-বস্‌রিয়া নামেও পরিচিতা ছিলেন। তাঁর পিতামাতা দরিদ্র হলেও অত্যন্ত ধার্মিক স্বভাবের ছিলেন। তাঁদের আরো তিনটি কন্যা ছিলেন, সেজন্য এই কন্যার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন রাবি'আ, অর্থাৎ "চতুর্থ"। অল্প বয়সেই রাবি'আ তাঁর পিতামাতাকে হারান। তারপর অচিরে বসরায় এক দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার ফলে তিনি তাঁর ভগ্নীদের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েন। নিষ্কপর্দক ও অসহায় অবস্থায় একাকী পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর সময় একদিন এক দুর্বৃত্ত ব্যক্তি তাঁকে ধ'রে নিয়ে নামমাত্র মূল্যে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি ক'রে দিল। তাঁর এই নতুন প্রভু ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ। তিনি খুবই খাটাতেন তাঁকে। কিন্তু জন্মাবধি এত দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও রাবি'আর প্রচণ্ড মনোবল এবং গভীর ভগবদ্‌ভক্তি নষ্ট হল না। তিনি স্বভাবেও যেমন ছিলেন অকুতোভয়, তাঁর হৃদয়ও ছিল তেমনি পবিত্র। তাঁর অদম্য উৎসাহ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বভাবের কোনো ব্যত্যয় ঘটল না। দাসত্বের নিষ্ঠুর বন্ধনভারের মধ্যে থেকেও মুহূর্তের জন্যেও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের জন্যে তাঁর আশা কখনো ম্লান হয়নি। ধর্মজীবন, পূর্ণতর জীবন এবং শাশ্বত কালের জন্যে ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভের জন্যে সাধনায় কখনো বিরত হননি তিনি। সেই কারণেই তিনি দৈনন্দিন কাজের ক্লান্তিহীন ঘূর্ণাচক্রের মধ্যে থেকেও সারাদিন উপবাস ক'রে থাকতেন, এবং সমস্ত রাত্রি ধরে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। একদিন রাত্রে যখন তিনি এইভাবে ঈশ্বরচিন্তায় তন্ময় হ'য়ে, অন্যের দাসত্ব করেন ব'লে দিনরাত্রির সর্বসময় তাঁকে ধ্যান করতে পারেন না বলে কাতর ভাবে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছিলেন, সেইসময় তাঁর মনিব ঘুম থেকে উঠে সবিস্ময়ে দেখতে পেলেন, তাঁর মাথার উপর শূন্যে ভাসমান এক দীপশিখা সারা বাড়ীকে আলোকিত ক'রে তুলেছে। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে মনিব অত্যন্ত ভয় পেয়ে রাবি'আকে পরদিনই দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত ক'রেছিলেন। তখন রাবি'আ এক মরুভূমির মধ্যে গিয়ে তাপসীর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

তারপর কিছুকাল গত হলে তিনি আবার বসরায় ফিরে এলেন এবং নিজের জন্যে একটি আশ্রম তৈরী করে সেখানে সন্ন্যাসিনী ভাবে বাস করতে লাগলেন।

কিছুকালের মধ্যেই সুফী সাধিকা হিসাবে রাবি'আর খ্যাতি দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন তিনি সেকালের বহু ধনী এবং খ্যাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে বিবাহের প্রস্তাব পেতে লাগলেন। কিন্তু তিনি সে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে ব্রহ্মচর্যের পুণ্যজীবন গ্রহণ করলেন, এবং একান্তভাবে ঈশ্বরেরই সেবায় ও উপাসনায় আত্মনিবেদন করলেন। বসরার অত্যন্ত ধনশালী শাসক মুহম্মদ সুলেমান যখন রাজোচিত যৌতুকের প্রস্তাব করেছিলেন তখনও রাবি'আ ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরের দিক থেকে আমার মন মুহূর্তের জন্যেও বিচলিত হয় এমন কিছু তোমার করা উচিত নয়। তুমি যা দিতে চাও, ঈশ্বর তা সবই আমাকে দিতে পারেন, এমন কি এর দ্বিগুণও দিতে পারেন।" তিনি আবেদ জায়েদ নামে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মপ্রচারকের প্রস্তাবও সমানই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই ব্যক্তি ছিলেন বসরার অন্যতম সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

এইভাবে সমস্ত সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে রাবি'আ অবিচ্ছিন্ন ধ্যানসাধনা ও ধর্মপ্রচারের জীবন গ্রহণ করলেন। তারপর অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রথম যুগের সুফী ধর্মসাধিকাদের অন্যতম বলে পরিগণিত হলেন। তাঁর অগণিত শিষ্যবৃন্দ তাঁর বাণী শোনার জন্যে, তাঁর ধর্মোপদেশ শোনার জন্যে এবং তাঁর নমাজে যোগ দেওয়ার জন্যে আসা-যাওয়া করতেন। কিংবদন্তীতে শোনা যায় যে সে যুগের বহু যশস্বী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। যদিও এসব কথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা সব সময় সম্ভব নয়, তবু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সেকালের বহু সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তিই তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে লাভবান হ'য়েছিলেন, এবং তিনি নারী হওয়া সত্ত্বেও বিনাদ্বিধায় তাঁকে তাঁরা গুরু বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু রাবি'আ নিজেকে ঈশ্বরের একজন নগণ্য দাসী বলেই মনে করতেন। তাই নিজে তিনি কখনো ধর্মগুরু বা নেত্রীর পদ দাবি করেন নি। বরং অত্যন্ত বিনীত এবং দীন ভাবেই তিনি নিজের সাধ্যমতো অন্যকে মুক্তির পথ দেখাতে সাহায্য করতেন—কখনো নিজেকে তিনি ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সেতু বা মধ্যস্থা হিসাবে খাড়া করেন নি। একবার কোনো ব্যক্তি তাঁকে তাঁর জন্যে প্রার্থনা করতে বলায় রাবি'আ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি কে? ঈশ্বরের কথা শুনে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। প্রার্থনা করে কিছু চাইলে তিনি তা পূরণ করেন।"

নিষ্ঠাবতী সূফী হিসাবে রাবি'আ কেবল যে সন্ন্যাসের উপদেশ দিতেন তা নয়, তিনি নিজেও পরম যত্ন ও অসীম কঠোরতার সঙ্গে তা পালন করতেন। সেই-জন্যেই তাঁর পুণ্য জীবন আজো আমাদের কাছে পরম পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তস্থল হ'য়ে আছে। তিনি যেমন স্বেচ্ছাতেই ব্রহ্মচর্যের জীবন গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি স্বেচ্ছাতেই তিনি দারিদ্র্য ও মিতাচারের জীবন গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে যদিও তিনি নিষ্কপর্দক ক্রীতদাসী ছিলেন, তবু পরবর্তী কালে একজন মহীয়সী ধর্মসাধিকা হিসাবে খ্যাতিলাভ করার পর তাঁর বহু ধনী ও প্রতিপত্তিশালী বন্ধুলাভ ঘটেছিল। তাঁরা তাঁকে পর্যাপ্ত অর্থসাহায্যের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো ভাবেই কোনোরকম সাহায্য গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। বন্ধুরা এজন্যে তাঁর কাছে অনুযোগ করলে তিনি করুণভাবে বলেছিলেন, "সত্যি বলছি, যিনি এই জগতের সব-কিছুরই মালিক তাঁর কাছ থেকেও আমি কিছু সাংসারিক সুবিধা প্রার্থনা করতে লজ্জা বোধ করি। তাহলে কী করে আমি তাঁদের কাছে ওসব জিনিস চাইব, যারা এ দুনিয়ার মালিক নয়?"

রাবি'আ এই মিতাচার ও অনাসক্তির সারমর্ম নিজের জীবনের সাধনা ও অশ্রুর মধ্যে দিয়ে জেনেছেন। তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার অওর তাঁর সম্বন্ধে এই সুন্দর কাহিনীটি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। —"একবার রাবি'আ একটি সপ্তাহ ধ'রে দিবারাত্রি উপবাসী থেকে বিনিদ্রভাবে ঈশ্বরের প্রার্থনায় মগ্ন ছিলেন। তারপর তিনি অত্যন্ত বুভুক্ষু হ'য়ে পড়ায় কেউ একজন তাঁকে একপাত্র খাদ্য এনে দিলেন। কিন্তু একটি বিড়াল সেই পাত্র উলটিয়ে ফেলল। তখন তিনি জলপান করতে চাইলেন। কিন্তু জলের পাত্রও তাঁর হাত থেকে মেজের উপর পড়ে খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল। ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে তখন তিনি ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার জন্যে তাঁর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন একটি দৈববাণী তাঁকে মনে করিয়ে দিল যে, একটি হৃদয়ে একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি আসক্তি এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি আসক্তি থাকতে পারে না। অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে তখন রাবি'আ সাংসারিক ভোগতৃষ্ণার ঊর্ধ্বে ওঠার পথ গ্রহণ করলেন, এবং দেহগত নিচু দিকটাকে এমন করেই বশে আনলেন যে, এমন কি শারীরিক আঘাতের যন্ত্রণাও আর তাঁকে কাতর করত না। একবার তাঁর মাথায় আঘাত লেগে প্রচুর রক্তপাত ঘটল, কিন্তু যন্ত্রণাটা তিনি বোধই করতে পারলেন না। যখন তাঁর বন্ধুরা এতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তিনি সহজভাবে উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর এই বস্তুময় পৃথিবীর ঊর্ধ্বে অন্য কিছুতে আমাকে তন্ময় ক'রে রেখেছেন।"

৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রাবি'আর মৃত্যু হওয়ার পর বসরাতেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়। সারাজীবন তিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁরই উপাসনায় তন্ময় হ'য়ে থাকতেন। তাঁর শেষলগ্নও ছিল তাঁরই উপযুক্ত। শান্ত এবং নির্ভয়ে তিনি তাঁর পরমদয়িতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং ঈশ্বরও তাঁকে সাদরে শাশ্বত জীবনে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার আবেগভরে বলেছেন "তোমার দয়িতের কাছে যাও, তাঁতেই তৃপ্ত হও, তাঁকে তৃপ্ত কর।" এইভাবে, মৃত্যু ছিল তাঁর কাছে, "একটি সেতু যার সাহায্যে প্রেমিকা তাঁর দয়িতের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে।"

এই পুণ্যময়ী মহীয়সী নারীর বিষয়ে এখন আমরা যা অল্পস্বল্প জানতে পারি, তার ভিত্তি হল মোটামুটি জনশ্রুতি। কিন্তু তবু, এই স্বল্প বিবরণ থেকেই আমরা এক অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ পাই। সেই ব্যক্তিত্ব ছিল সুউচ্চ মহিমায় সমুজ্জ্বল, অথচ সরল মাধুর্য ও অনাড়ম্বরতায় তা ছিল একান্ত প্রিয়জনের মতোই আপন। প্রথম জীবনে তিনি মোটেই প্রথামতো বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি, শেষ জীবনেও তিনি কোনো শেখ বা ধর্মগুরুর উপদেশ লাভ করেননি। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর যাঁকে টানেন, তাঁর ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার প্রবল আকর্ষণী শক্তি রোধ করে কার সাধ্য? রাবি'আর ক্ষেত্রেও ঘটেছিল তাই; কেননা তিনি ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধিকা। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাননি, কেউ তাঁকে সাহায্যও করেন নি। তাই তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকেই করুণার আলো পাওয়ার জন্যে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন। তারই ফলে, প্রভুর গৃহে দাসত্বের ক্লান্তিকর দিনগুলিতে, কিংবা নির্জন মরুভূমির দুঃসহ সাধনার সময়ে, অথবা কর্মব্যস্ত শহরের দারিদ্র্য ও উদ্‌ভ্রান্ত জীবনে, ঈশ্বরের মানসকন্যা রাবি'আ নিজের অধ্যাত্ম পথে অবিচলিত ছিলেন, এবং পরিণামে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি লাভ করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। রাবি'আর জীবন হ'ল সাধারণ নারীদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁরাও একান্ত মনে সাধনা করলে অন্যের সাহায্য ছাড়াই অধ্যাত্মজীবনের চূড়ান্তে উপনীত হ'তে পারেন।

রাবি'আর বাণী

হিজরী সনের দ্বিতীয় শতাব্দীতে (অর্থাৎ ৭৬৭—৪১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) ইব্রাহিম ইব্‌ন্ আদাম, তায়ীব আলি, শাকিক দাউদ এবং ফাদায়েল ইয়াদ প্রমুখ সূফী সাধকের মতোই রাবি'আও একজন বিখ্যাত সূফী ধর্মসাধিকা ছিলেন, একথা আগেই বলা হ'য়েছে।

এই প্রথম দিকে সূফী-মতবাদ দার্শনিক বা বৈদান্তিক তত্ত্বজিজ্ঞাসা ছিল না। তখন সূফী-মতবাদ ছিল প্রধানত নীতিমূলক। এ-সময়ে সূফী মতবাদে আমরা ঈশ্বর, আত্মা, মোক্ষ, ঈশ্বর-সাযুজ্য ইত্যাদি বিষয়ে কোনো ঔপনিষদিক তত্ত্বজ্ঞান বা দর্শনালোচনা দেখতে পাই না। এতে তখন শুধু ঈশ্বরোপলব্ধির বিষয়ে কতকগুলি সাধনপদ্ধতির কথা বলা হয়েছিল। এই জন্যেই প্রাথমিক সূফী-মতবাদকে বলা যায় "আচরণ সংহিতা বা জীবনদর্শন।" জয়সুদ এই কথাই তাঁর এক বিখ্যাত সূত্রে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন।—"আমরা সূফীধর্মকে পেয়েছি উপবাস, বৈরাগ্য, সংসারত্যাগ এবং সর্ব-আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা থেকে। তর্ক দ্বারা পাইনি আমরা একে।"

কাজেই প্রাচীন সূফীধর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তপস্যা ও শান্তভাব। তপস্যা কথাটির দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এটা হল একটা নৈতিক পদ্ধতি, যার ফলে কঠোর আত্মশাসন ও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়। প্রথম যুগের তপস্বীরা পাপ সম্পর্কে কোরানের শিক্ষা, শেষ-বিচারের দিন, নরক এবং এক ক্ষমাহীন বিচারক-রূপে ঈশ্বরের কঠোরতার বিষয়ে খুবই প্রাধান্য দিতেন। সেই জন্যে, প্রতিশোধমূলক শাস্তি এবং প্রজ্বলন্ত নরকের ভয়ে তারা এতোই কাতর ছিলেন যে, তাঁরা সমস্ত রকম সাংসারিক বন্ধন ত্যাগ করে চরম মিতাচার ও শারীরিক ক্লেশময় জীবন-যাপন করতেন। তাছাড়া সূফীরা যে কেবল কঠোর সাধক ছিলেন তাই নয়, তার চেয়েও আরো বেশী কিছু ছিলেন। প্রথমত, তাঁদের সাধক জীবন স্বার্থ প্রণোদিত ছিল না। অর্থাৎ তাঁরা স্বর্গলাভ এবং নরকবাস এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই সাধনা করতেন না, সাধনার চরম সিদ্ধি—ঈশ্বরলাভই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, সূফীগণ বাইরের আচরণের চেয়ে অন্তরের আকাঙ্ক্ষার উপরই সর্বদা বেশী জোর দিতেন। অর্থাৎ, তাঁদের কাছে দারিদ্র্য ও মিতাচার কেবল সাংসারিক সম্পদের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিল না, সাংসারিক ভোগবাসনাও তার অন্তর্গত ছিল। একে তাঁরা বলেছেন, "কেবল শূন্য হাতই নয়, হৃদয়ও শূন্য হওয়া চাই।" তৃতীয়ত, সূফীগণ কেবল গোঁড়া সন্ন্যাসীই ছিলেন না, গভীর ভাবের মরমীয়া সাধকও ছিলেন। এখানেই সূফীদের শান্তভাবের কথা আসে। শান্তভাব কথাটির দ্বারাই বোঝা যায়, এটা হল একটা নৈতিক পদ্ধতি যাতে বলা হয় যে, পরম ধীরতা এবং তদ্‌গত ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায়। সেই সঙ্গে সূফীরা আরো বলেন যে, অবিচ্ছিন্ন ঈশ্বরধ্যানই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শনের একমাত্র উপায়। সেই জন্যেই সূফীগণ কেবল তপস্বী (বা জাহিদ) এবং সন্ন্যাসী (বা ফকির) ছিলেন না,

তাঁরা ছিলেন মরমীয়া সাধক। সারাওয়ার্দি সুন্দরভাবেই একথা বুঝিয়ে বলেছেন।—"সুফীধর্ম ফকিরী নয়, জাহিদ-আচারও নয়, তা হল ঐ দুই আচরণের যোগফল এবং তার চেয়েও কিছু বেশী। এই অতিরিক্ত গুণাবলী না থাকলে কেউ হয়তো জাহিদ হবেন বা ফকির হবেন, কিন্তু সুফী হবেন না।"

রাবি'আ ছিলেন প্রাচীন সুফীদের অন্যতম। কাজেই তিনি আত্মা এবং ঈশ্বরের স্বরূপ এবং এ-দুইয়ের সম্পর্কের বিষয়ে তত্ত্বালোচনায় মগ্ন না হয়ে, ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্যে সরল আচরণ-বিধির পথ দেখানোই নিজের কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন অবিসংবাদিত সত্য, তার জন্যে কোনো প্রমাণ আবশ্যক করে না। সেই রকমই অভ্রান্ত সত্য ছিল তাঁর কাছে, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলনের মধ্যে আত্মার পরম চরিতার্থতার বিষয়টি। কাজেই, এইসব নিঃসন্দেহ সত্যের বিষয়ে অসার তত্ত্বালোচনায় রত না হয়ে রাবি'আ নৈতিক আচরণের বিধান দেওয়াই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। এই নৈতিক আচরণের কতকগুলি পর্যায় ছিল। সেই পর্যায়গুলি অনুসরণ করেই কেবল জীবনের চরম লক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করা সম্ভব বলে মনে করতেন তিনি।

এই সাধনমার্গের স্তরগুলি ছিল এই রকম।—অনুতাপ, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আশা, ভয়, স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য, তপস্যা, চরম ঈশ্বর-নির্ভরতা, এবং পরিশেষে প্রেম, অর্থাৎ "দয়িতে'র জন্যে ঐকান্তিক আকূতি, মিলন এবং পরিতৃপ্তি। অন্যান্য সুফী সাধকও মোটামুটি এই রকম পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন।

(ক) অনুতাপকেই সকলে নৈতিক পথের প্রথম পর্যায় বলে গ্রহণ করেছেন। এই পথই মরমীয়া সাধনার পথ, যা অনুসরণ করলে আত্মা পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ করতে পারে। নৈতিক জীবনে অধ্যাত্মশক্তির বিকাশের প্রথম শর্ত হল নিজের পাপ ও ত্রুটির বিষয়ে চেতনা ও স্বীকৃতি, এবং তার জন্যে আন্তরিক অনুতাপ। কেবল সেই উপায়েই উন্নততর, পবিত্রতর এবং পূর্ণতর অস্তিত্বের জন্যে প্রয়াসী হ'য়ে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হওয়া সম্ভব। এই জন্যে সমস্ত সুফী সাধকই নৈতিক জীবনের পক্ষে অনুতাপকে এতো বেশী প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। ধুল নুন-আক-মিছরি ছিলেন একজন বিখ্যাত সুফী সাধক। সুফীধর্মে অনুতাপের যে বিশদ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার প্রধান বক্তব্যগুলির বিষয়ে সংক্ষেপে এইভাবে বলতে পারি আমরা। প্রথমত, সাধারণ মানুষের অনুতাপ, সুফীদের অনুতাপ এবং সাধুপুরুষদের অনুতাপের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। সাধারণ মানুষ কেবল তার কৃতকর্মের জন্যেই

অনুতাপ করে। সূফী অনুতাপ করেন তাঁর পাপকর্মের জন্যে, অর্থাৎ যা তিনি করেছেন, উপরন্তু তিনি অনুতাপ করেন, যে সব সৎকর্ম তিনি করতে পারেননি তার জন্যেও। সাধুব্যক্তি অনুতাপ করেন তার নিজের অপূর্ণতার জন্যে। দ্বিতীয়ত, অনুতাপ আসতে পারে ঈশ্বরকে ভয়ালরূপে কল্পনা ক'রে তার ভয় থেকে; আবার ঈশ্বরকে অসীম সৌন্দর্য ও করুণার উৎস হিসাবে প্রত্যক্ষ করেও অনুতাপ আসতে পারে। প্রথম অবস্থায় মানুষকে সংযত করে মাত্র, দ্বিতীয় অবস্থায় আসে তার ভাবোন্মাদনা। কাজেই, সূফী মত অনুসারে দ্বিতীয় অবস্থাটি অনেক উচ্চতর অবস্থা।

রাবি'আর বাণীতেও এই উন্নততর এবং পবিত্রতর দিকটার উপরেই প্রধান ঝোঁক দেখা যায়। 'তাঁর নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয়ে একাগ্রভাবে সচেতন হ'য়ে যদিও তিনি সর্বদাই ক্রন্দন ও অনুশোচনা করতেন, তবু রাবি'আর কোনো স্বার্থচিন্তা ছিল না। অর্থাৎ তিনি শাস্তির ভয়ে নিজের পাপের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষার কথা মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করতেন না। বরং তিনি মনে করতেন, পাপ যে কেবল পরলোকে নরকের শাস্তি আনে বলেই ক্ষতিকারক ও ঘৃণাজনক তা নয়, পাপকর্ম অন্যায় এই জন্যে যে তাতে আত্মা এবং ঈশ্বরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, রাবি'আর শিক্ষাটাই শুধু নয়, তাঁর জীবন থেকেও এটা বোঝা যায় যে, এই বিচ্ছেদই ভক্তের পক্ষে সব চেয়ে বড় শাস্তি।

রাবি'আ একথাও বলেছেন যে, অনুতাপ করার ক্ষমতাও ঈশ্বরের দান, কারণ নিজের শক্তিতে কারো পক্ষে এ-ধরনের অনুতাপ করা সম্ভব হয় না। সেইজন্যেই তিনি অতি সুন্দরভাবে বলেছেন, "আমি নিজে যদি অনুতাপ খুঁজি, তাহলে আবার আমার অনুতাপের দরকার হবে।" "ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যেও ক্ষমার দরকার।" ইত্যাদি। আল-কোনায়েরি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন একবার রাবি'আকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যদি আমি অনুতাপ করি, ঈশ্বর কি আমার অনুতাপ শুনবেন?" রাবি'আ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন, "না; শুধু তিনি যখন তোমার দিকে ফিরবেন, তখনি তুমি তাঁর দিকে ফিরতে পারবে।"

এইভাবে, ঈশ্বরের মানসকন্যা রাবি'আ প্রত্যেক ব্যাপারে প্রতিমুহূর্তেই তাঁর করুণার উপরে নির্ভর ক'রে চলতেন।

(খ) ধৈর্য—পরবর্তী স্তর হল, ঈশ্বর যা কিছু দয়া ক'রে দিয়েছেন, সেইটুকু বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করা। বিখ্যাত সূফী বায়াজিদ-আল-বিস্তামি ঠিকই বলেছেন, সাধু ব্যক্তি হলেন তিনি "যিনি ঈশ্বরের আদেশ ও নিষেধ মেনে ধৈর্য ধারণ ক'রে থাকেন।" আরেক বিখ্যাত সূফী কল্পবাধ বলেছেন, প্রাথমিক স্তরে ধৈর্যের অর্থ

হল সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করা, তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে সান্ত্বনা পাওয়ার আশা থাকে। কিন্তু উন্নততর স্তরে, সেটুকু আত্মস্বার্থের কথাও মনে আসে না।

রাবি'আ এই উন্নততর স্তরের ধৈর্যের কথাই বারবার করে বলেছেন, এবং নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণিত করেছেন। শৈশব থেকেই রাবি'আ কীভাবে বিনা গুঞ্জনে শোক, রোগ, দাসত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি দুর্ঘটনা সহ্য ক'রে গেছেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। ঈশ্বরের জ্ঞান ও করুণার বিষয়ে সন্দেহ করা তাঁর মতে চরম মূর্খতা ও বিশ্বাসহীনতার সামিল। তিনি পরম ভক্তি ও গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, "আমি যদি এমন কিছু চাই, যা ঈশ্বর চান না, তাহলে আমি বিশ্বাস-হীনতার দোষে অপরাধী হব।"

(গ) কৃতজ্ঞতা—এই গুণটি হল মরমীয়া সাধনার পক্ষে আরো একটু উচ্চস্তরের অবস্থা, এবং এটা ধৈর্যের পরিপূরক। কারণ, ধৈর্য হল নঙর্থক ব্যাপার—ঈশ্বরের ইচ্ছায় শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করাই লক্ষ্য। কিন্তু কৃতজ্ঞতা বস্তুটি অনেক সদর্থক গুণ—অর্থাৎ এর ফলে, ঈশ্বর তাঁর অনন্ত করুণা ও জ্ঞানের বিচারে যা আমাদের দেওয়া উচিত বলে বিবেচনা করেছেন, তাকেই সকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। উচ্চতর স্তরের কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বর যা কিছু সৌভাগ্য দিয়েছেন তার জন্যেই যে কেবল কৃতজ্ঞ বোধ করা হয় তা না, যা কিছু দুর্ভাগ্য দিয়েছেন তাও বাদ যায় না। একজন প্রকৃত সুফী হিসাবে রাবি'আ এই উচ্চতর স্তরের কৃতজ্ঞতার কথাই সর্বদা বলতেন। এর ফলে আনন্দ এবং সৌভাগ্যের সঙ্গে দুঃখ এবং দুর্দশাকেও বিনীতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

এই সাধনমার্গের অন্যান্য স্তরের মতো "কৃতজ্ঞতা"-ও আল কোনায়েরি বলেছেন, "স্বয়ং ঈশ্বরের দান।" বিখ্যাত সুফী হাল্লাজও বলেছেন যে, সাধকের পক্ষে পরম বিনয় ও কৃতজ্ঞতার মনোভাবের চর্চা করা খুবই উচিত, তবু তাঁর জানা উচিত, ঈশ্বর আমাদের জন্যে যা করেছেন তার সমপরিমাণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হল, মানবিক কৃতজ্ঞতা যে নিতান্তই অসার এইটে হৃদয়ঙ্গম করা। হাল্লাজ করুণভাবে বলেছেন, "হে ঈশ্বর! তুমি জানো যে তুমি যতোভাবে আমাকে কৃপা করেছ তার অনুরূপ পরিমাণে ধন্যবাদ জানানো আমার পক্ষে অসম্ভব। সেইজন্যে আমার প্রার্থনা এই যে, তুমি আমার হ'য়ে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাও।"

এই ধরনের পরম কৃতজ্ঞতা বোধই প্রথম থেকে রাবি'আর জীবন এবং বাণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) আশা এবং ভয়—সুফী মতে এই দুটি গুণও মরমীয়া সাধনপথের গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এখানে "আশা" অর্থে ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-মিলনের বিষয়ে চিরন্তন আশার কথাই বলা হচ্ছে। "ভয়" অর্থেও সেই রকম বোঝানো হচ্ছে, ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-বিচ্ছেদের চিরন্তন ভয়। কাজেই "আশা" ও "ভয়" হল দুটি পরিপূরক গুণ, যার ফলে সাধকের হৃদয়ে পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর চির-অম্লান প্রেরণা জাগ্রত থাকে। সুফীরা যে এই দুটি গুণকে ঊর্ধ্বে উড়ন্ত পাখীর দুটি ডানার সঙ্গে তুলনা করেছেন, তা খুবই সঙ্গত হ'য়েছে।

আদি সুফীদের মধ্যে রাবি'আই বোধহয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি নতুন পথে এই দুটি ধরনকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। এইভাবে তিনি তার নিষ্কাম প্রেমের বিষয়ে বিখ্যাত তত্ত্বটির রূপ দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। আশা এবং ভয়ের সঙ্গে স্বার্থচিন্তা জড়িত থাকতে পারে। যেমন, পুরস্কার বা স্বর্গের আশা, কিংবা শাস্তি, অর্থাৎ নরকের ভয়। কিন্তু রাবি'আ আশা এবং ভয়কে এসব স্বার্থ-চিন্তা থেকে মুক্ত ক'রে স্বার্থহীন পবিত্র প্রেম ও ভক্তির স্তরে উন্নত করতে পেরেছিলেন। একজন প্রকৃত সুফীর কাছে বেহেস্ত ইন্দ্রিয়জ সুখ তো নয়ই আধ্যাত্মিক আনন্দেরও স্থান নয়—সেটা হল সেইরকম একটি স্থান যেখানে ঈশ্বর-দর্শন ও ঈশ্বর-মিলন সম্ভব হয়। সেই রকমই জাহান্নমও উৎপীড়ন ও শাস্তির জায়গা নয়—সেটা হল সেই রকম একটি অবস্থা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। এই কারণে, বায়াজিদ-আল-বিস্তামির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে একজন সুফী বলবেন, "যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের কাছে বেহেস্তের কোনো মূল্যই নেই।" সেই জন্যে পণ্ডিত আল-গজালি কর্তৃক সংকলিত রাবি'আর বচন-সংগ্রহের মধ্যে এই কথাটি চিরস্মরণীয় হ'য়ে আছে, "প্রথম হল প্রতিবেশী, তারপর তার বাড়ী।" একথার অর্থ হল এই যে, প্রতিবেশী বা ঈশ্বর, তাঁর বাড়ী বা বেহেস্তের চেয়ে বেশী মূল্যবান।

(ঙ) 'স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য' হল সুফী ধর্মের অন্যতম মূলসূত্র। এর অর্থ হল, হৃদয়কে সমস্ত রকম আত্মসুখের বাসনা থেকে নির্মল ক'রে ঈশ্বরাভিমুখী করা। আমরা আগেই দেখেছি রাবি'আ কেবল অন্যকে উপদেশ দিতেন না, নিজেও এই সুকঠিন দারিদ্র্যের মহান ব্রত পালন করতেন।

(চ) তপস্যাও সুফী ধর্মের একটি প্রধান স্তম্ভ। এটা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংযুক্ত। তপস্যা মানে হল, উচ্চতর অধ্যাত্ম চেতনার দ্বারা নিম্নতর দৈহিক চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বশে রাখা। এ ক্ষেত্রেও রাবি'আর কথা ও কর্ম সুফীধর্মে এক নতুন ও উদ্দীপনাময় অধ্যায় যোজনা করেছে। রাবি'আ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল

ও ঋজুভাবে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, এই ধরনের আত্মসংযমের অর্থ হল, অনন্যমনা হ'য়ে একাগ্রভাবে ঈশ্বর চিন্তায় তন্ময় হওয়া। একজন প্রকৃত তাপসী হিসাবে রাবি'আ ঈশ্বরদ্রষ্টা ধর্মসাধিকার সুনামেও ভয় পেতেন খুবই; পাছে এতে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তিনি চরিতার্থতা বোধ করেন। কাজেই তিনি সব সময় তাঁর জ্ঞান ও বিভূতি-প্রদর্শন থেকে বিরত থাকতেন।

(ছ) 'ঈশ্বর-নির্ভরতা' হল উপরোক্ত সাধন-প্রণালীর ফলশ্রুতি। আত্ম-নিবেদনের চরম স্তরে নিজের সমস্ত জীবন পরমেশ্বরের কাছে উৎসর্গ ক'রে দিতে হয়। মহান সুফী সাধক হালাজের এই সুন্দর প্রার্থনাতে এ-বিষয়ে সুফীদের কী মনোভাব তা-তীব্রভাবেই ব্যক্ত হ'য়েছে।—"হে ঈশ্বর, হে প্রভু, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। হে আমার লক্ষ্য, হে আমার সর্বার্থসাধক, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তুমি আমার সারাৎসার, তুমি আমার কামনার ধন, তুমি আমার বাক্, আমার আকার ও ইঙ্গিত, তুমি আমার সর্বেশ্বর, তুমি আমার শ্রুতি, আমার দৃষ্টি, তুমি আমার পূর্ণ সত্তা, তুমিই আমার অনুপরমাণু।" এ বিষয়ে রাবি'আর শিক্ষাই একই রকম।

(জ) 'প্রেম' হল মরমীয়া সাধনপথের শেষ স্তর—এই পথেই দয়িতের চিদ্‌ঘন উপলব্ধি এবং তাঁর সঙ্গে পরম মিলন সম্ভব। রাবি'আ বলেছেন, প্রেমের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। প্রথমত, এতে তন্ময় ভাব থাকা চাই; আর দ্বিতীয়ত, এটা একান্ত নিঃস্বার্থ হওয়া উচিত। একজন সাধু ব্যক্তির পক্ষে কেবল ঈশ্বরই একান্ত ধ্যানের বিষয় হওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে, ঈশ্বর হলেন সেই ঈর্ষাতুর স্বামীর মতো যিনি দ্বিতীয় কোনো কিছুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করেন না। এই ধরনের সর্বব্যাপী প্রেমের প্রকৃত চরিত্র রাবি'আর বিষয়ে প্রচলিত এই কাহিনীতে সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।—একদিন কোনো ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন?" বিনা দ্বিধায় রাবি'আ উত্তর দিয়েছিলেন; "নিশ্চয়!" সেই ব্যক্তি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি শয়তানকে ঘৃণা করেন?" তেমনি বিনা দ্বিধায় রাবি'আ উত্তর দিলেন, "না। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের ফলে আমার হৃদয়ে শয়তানের প্রতি ঘৃণার জন্যে কোনো স্থান অবশিষ্ট নেই। এই প্রেমে আমার হৃদয় এমনভাবে পূর্ণ হ'য়ে আছে যে ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা বা ঘৃণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

তাঁর প্রেম যে কী পরিমাণ নিঃস্বার্থ ছিল তা আগেই বলা হ'য়েছে।

রাবি'আর রচনাবলী

রাবি'আকে ঐশ্লামিক সাধক ও পন্ডিতগণ কতো শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী, জীবনচরিত বা দার্শনিক গ্রন্থে রাবি'আর রচনাবলীর উদ্ধৃতির পরিমাণ থেকেই বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে, শ্রেষ্ঠ সূফী গ্রন্থকারগণ সকলেই দিকপাল গ্রন্থকারদের মধ্যে আবু নাসের অল-সরাজ, আবু তালিব, কলাবাধি, আবু অল-কোশায়েরী, অল-খর্জালি, অল-সারাওয়ার্দি এবং হুজুইরির নাম উল্লেখযোগ্য। রাবি'আর স্বতন্ত্র কোনো রচনার বিষয়ে আমরা জানি না বটে, তবু এই অজস্র উদ্ধৃতি থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তাঁর রচনা-ভঙ্গি ছিল অত্যন্তই সরল ও আন্তরিক। নমুনা হিসাবে আবু তালিব কর্তৃক উদ্ধৃত দুই প্রকারের প্রেমের বিষয়ে রাবি'আর বিখ্যাত কবিতাটিকে উপস্থিত করা যায়ঃ

দুই প্রেমে আমি ভালোবেসেছি তোমাকে—
একটি স্বার্থপর প্রেম, অন্যটি প্রকৃত প্রেম।
যে প্রেম স্বার্থপর তাতে আমি
তোমারই ধ্যানে নিবিষ্ট থাকি,
অন্য কারো কথা ভাবি না।

আর যে প্রেম তোমার উপযুক্ত, তাতে তুমি
ওড়নার ঢাকা তুলে ধর যাতে আমি
দেখতে পাই তোমাকে।
তবু কোনো দিকেই আমার নিজের কোনো সুকৃতি নেই।
মহিমা সব তোমারই,
এই প্রেমে বা ঐ প্রেমে।

তাঁর গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবে তাঁর বিখ্যাত জীবনীকার আত্তার কর্তৃক উদ্ধৃত এই সুন্দর প্রার্থনাটি উপস্থিত করা যায়।—"হে প্রভু, আমি যদি নরকের ভয়ে তোমাকে ভজনা করি, তবে নরকাগ্নিতেই তুমি আমাকে দগ্ধ করো। আমি যদি স্বর্গের আশায় তোমাকে ভজনা করি, স্বর্গ থেকে তবে আমাকে বিদায় দিও। কিন্তু যদি আমি কেবল তোমারই জন্যে তোমার ভজনা করি, তবে তোমার শাশ্বত সৌন্দর্য থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না।"

কবিতা-গদ্য নির্বিশেষে তাঁর সমস্ত রচনাই এই একই মহিমা, ভাবের গভীরতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির পরিচায়ক। মনে হয় তাঁর দয়িত ঈশ্বরই যেন তাঁর মুখ দিয়ে

কথা বলাচ্ছেন। আর সেই জন্যেই তাঁর সমস্ত কথাই আমাদের হৃদয়ে ঘা দিয়ে সত্তার গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত আলোড়িত ক'রে তোলে।

তাঁর কার্যাবলীর পর্যালোচনা

সমসাময়িক এবং পরবর্তী চিন্তাধারার উপর রাবি'আর প্রভাব পড়েছিল অসামান্য। প্রথমদিকে সূফী মতবাদের ক্রমবিকাশে যে লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছিল, রাবি'আর মতবাদও সেই অনুযায়ী বাস্তব ঘেঁষা ছিল। কিন্তু তপশ্চর্যা ও শান্তভাব ছাড়াও রাবি'আর মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক গভীর ভাবাবেশের অবস্থা, এবং সেই সঙ্গেই তত্ত্বালোচনা ও ভক্তির সংমিশ্রণ। সূফী মতবাদের ইতিহাসে এটা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। তাঁর রচনাবলীতে কেবল যে একটি গভীর ভক্তিময় হৃদয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাই নয়, একটি গভীর চিন্তাশীল মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এরই ফলে, পরম সত্যের অবিসংবাদিত্বের বিষয়ে তাঁর অবিচল আস্থা থাকা সত্ত্বেও কখনো কখনো তিনি অন্তরের সত্যকে বাহিরের প্রমাণ দিয়ে উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় মনে করতেন। চিন্তা এবং ভাব, মত এবং তার প্রয়োগের এই পদ্ধতিই সমগ্র সূফী ধর্মে রাবি'আর অবিস্মরণীয় অবদান।

কিন্তু নিজের কাল, এবং ভাবীকালের জন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হল তাঁর অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা, মধুর সারল্য, মহান নিঃস্বার্থপরতা এবং গভীর ভক্তিভাবের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। তাঁর চরিত্রের সব থেকে উজ্জ্বল দিক ছিল এই যে, তিনি নিজেই ছিলেন তাঁর উপদেশাবলীর ভাস্বর দৃষ্টান্তস্থল।

তাঁর জীবনীকার কারিদুদ্দিল আত্তারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে এইভাবে শ্রদ্ধানিবেদন করে আমরা বিদায় নিতে পারি—"যিনি মহান ধর্মভাবের প্রেরণায় নির্জনবাস বরণ করেছিলেন; যে নারী ধর্মাচরণের আন্তরিকতায় অবগুণ্ঠিতা; যিনি দিব্য প্রেম ও কামনায় উদগ্র; যিনি তাঁর দয়িতের অভিসারে গিয়ে তাঁরই মহিমায় আত্মবিলোপ করার জন্যে অধীর; যে নারী ঈশ্বর-মিলনে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছেন, যিনি সর্বলোকে দ্বিতীয় মেরীর মতো নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা বলে শ্রদ্ধা পেয়েছেন;—সেই রাবি'আ অল-অদইয়ার উপরে ঈশ্বর যেন নিয়ত তাঁর করুণা বর্ষণ করেন।"